এইসব
দিনরাত্রি

এইসব দিনরাত্রি

হুমায়ূন আহমেদ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ☆ কলিকাতা-৭৩

একশ টাকা

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন - গৌতম রায়

মুদ্রণ - চয়নিকা প্রেস

অক্ষর বিন্যাস - বদ্বীপ

EISHOB DINRATRI

A novel by Humayun Ahmed
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd,
10 Shyama Charan De Street, Calcutta - 700073

Rs. 100.00

ISBN 81-7293-295-2

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ হইতে এস এন রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬ হইতে শ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

মুস্তাফিজুর রহ্মান
রুহুল আমিন শেখ
প্রিয়জনেষু

Shamim

এইসব দিনরাত্রি

প্রথম পর্ব

সন্ধ্যার পর থেকে নীলুর কেমন যেন লাগতে লাগল। কেমন এক ধরণের অস্বস্তি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলে যে রকম লাগে সে রকম। সমস্ত শরীর ঝিম ধরে আছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। কল্যাণপুরের দিকে শহর তেমন বাড়তে শুরু করেনি। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিলের মত খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে। গত শীতের আগের শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস নেমেছিল। কি অদ্ভুত দৃশ্য। এ বৎসর নামবে কি না কে জানে। বোধ হয় না। শহর এগিয়ে আসছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না।

ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বেশ শীত পড়েছে এবার। আজ কালের মধ্যেই লেপ নামাতে হবে। নীলু শাড়ির আঁচলে মাথা ঢেকে দূরে ঝিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

বসার ঘরে তার ননদ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। "কখগ ও চছজ দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ। ইহাদের কখ ও চছ বাহু দুইটি সমান। প্রমাণ কর যে...।" মিষ্টি গলা শাহানার। পড়াটা শুনতেও গানের মত লাগছে। আজ কি ওর প্রাইভেট মাষ্টারের আসার তারিখ? আজ বুধবার না মঙ্গলবার? নীলু মনে করতে পারল না। ভদ্রলোক বুধবারে আসেন। নীলু মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যেন আজ বুধবার না হয়।

বুধবার হলেই ভদ্রলোক আসবেন। এবং নীলুকে সারাক্ষণ তাদের আশেপাশে বসে থাকতে হবে। নজর রাখতে হবে। কারণ শাহানা গত সপ্তাহে চোখ মুখ লাল করে তাকে বলেছে, ভাবী, এই স্যারের কাছে আমি পড়ব না।

নীলু অবাক হয়ে বলেছে, কেন?

ঃ স্যারটা ভাল না ভাবী। চেয়ারের নীচে পা দিয়ে সারাক্ষণ আমার পা ছুঁতে চায়।

ঃ কি যে বল। হঠাৎ হয়ত লেগে গেছে।

ঃ না ভাবী, হঠাৎ না। আমি যতই পা সরিয়ে নেই সে ততই নিজের পা এগিয়ে দেয়।

নীলু আর কিছু বলেনি। কিন্তু বললেই তো আর মাষ্টার বদলানো যায় না। এত কম টাকায় পাওয়াও যাবে না কাউকে। মাষ্টার ছাড়া চলবেও না। প্রিটেস্টে শাহানা অংকে পেয়েছে এগারো। তাদের বড় আপা গম্ভীর হয়ে জানিয়ে দিয়েছেন শাহানাকে যেন ইলেকটিভ অংকে কোচ করানো হয়। প্রাইভেট মাষ্টার জোগাড় করতে হয়েছে বহু ঝামেলা করে। কিন্তু বুড়োমত এই ভদ্রলোকের একি কাণ্ড। অথচ ভাল মানুষের মত চেহারা। পড়ায়ও ভাল। কত ধরণের মানুষ থাকে সংসারে!

নীলু ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। আবার ভেতরে যেতেও ইচ্ছা করছে না। কেন জানি ইচ্ছা হচ্ছে চেঁচিয়ে কাঁদতে। এ রকম তার কখনো হয় না। নীলুর একটু ভয় ভয় করতে লাগল।

বাড়িতে সে এবং শাহানা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সবাই খিলগাঁয়ে এক বিয়ের দাওয়াতে গেছে। রাত এগারোটার আগে ফিরবে না। কিংবা কে জানে হয়ত আরো রাত হবে। বারোটা একটা বাজবে।

শাহানা ভেতর থেকে ডাকল, ভাবী, একটু শুনে যাও তো।

নীলু ভেতরে ঢুকল।

ঃ জানালায় কে যেন খট খট করছে ভাবী। আমার ভয় ভয় লাগছে। তুমি এখানে বসে থাক।

নীলু বসল তার পাশে। শাহানা বলল, তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন ভাবী?

ঃ কি রকম দেখাচ্ছে?

ঃ মুখটা কি রকম কালো কালো লাগছে।

ঃ কালো মানুষ, কালো কালো তো লাগবেই।

শাহানা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভাবীর দিকে। ভাবী কালো ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা আছে। আর এত সুন্দর ভাবীর চোখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

ঃ এ রকম তাকিয়ে আছ কেন শাহানা?

শাহানা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। নীলু বলল, আজ কি বার, মঙ্গলবার না বুধবার?

ঃ মঙ্গলবার।

ঃ তোমার স্যার আজ আসবে না তো?

ঃ না।

শাহানা ইতস্ততঃ করে বলল, স্যারের কথাটা তুমি কাউকে বলনি তো ভাবী?

ঃ না।

ঃ কাউকে বলবে না। বড় লজ্জার ব্যাপার। তুমি ভাবী ভদ্রলোককে নিষেধ করে দাও। প্রাইভেট মাষ্টার আমার লাগবে না।

নীলু কিছু বলল না। আড়চোখে দেখল, শাহানার ফর্সা গাল লাল হয়ে আছে। এই মেয়েটা বড় সহজেই লজ্জা পায়। তার এ জন্যে লজ্জা পাবার কি আছে?

নীলু উঠে দাঁড়াল। শাহানা বলল, যাচ্ছ কোথায় ভাবী?

ঃ যাচ্ছি না। সোফায় একটু শোব। শরীরটা ভাল লাগছে না শাহানা।

ঃ কি হয়েছে?

ঃ বুঝতে পারছি না।

শাহানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারও কেমন ভয় ভয় করতে লাগল—সে সব কিছু না তো? তিন বছর আগে একদিন বিকেল বেলা ভাবী তার চুল বেণী করে দিচ্ছিল। হঠাৎ ক্লান্ত স্বরে বলল, শাহানা, মাকে একটু ডাক তো, শরীরটা কেমন যেন করছে।

দেখতে দেখতে নেতিয়ে পড়ল সে। কি কাণ্ড কি ছুটাছুটি। পেটে তিনমাসের বাচ্চা। ডাক্তার এসে বললেন, এবোরশান হয়ে গেছে। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। পনেরো দিন হাসপাতালে থেকে কাঠির মত হয়ে সে ফিরে এল।

ডাক্তার ভয় ধরিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, খুব সাবধানে থাকতে হবে। এবোরশান হবার একটা স্বাভাবিক টেন্ডেন্সি তার আছে। কিছু কিছু মেয়ের থাকে এ রকম।

শাহানা লক্ষ্য করল, নীলু খুব ঘামছে। সে রকম কিছু না তো? সে ভয়ে ভয়ে ডাকল, ভাবী।

নীলু তাকাল, কিছু বলল না।

ঃ ভাবী, সে রকম কিছু না তো?

ঃ না বোধ হয়। ডাক্তার বলেছিল সাত মাস পার হলে ভয় নাই।

ঃ তোমার এখন কতদিন? আট মাস না?

ঃ হুঁ।

ঃ পানি খাবে ভাবী?

ঃ না।

ঃ ভাবী, বাড়িওয়ালাদের বাসায় গিয়ে কাউকে ডেকে আনব?

ঃ না। কাউকে ডাকতে হবে না।

শাহানা একটা বালিশ এবং চাদর এনে দিল। মৃদুস্বরে বলল, সোফার উপরই শুয়ে থাক। চুল টেনে দিব?

ঃ কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি পড়তে বস তো। আমার শরীর এখন ভালই।

ঃ সত্যি বলছ?

ঃ হুঁ। শুধু শুধু মিথ্যা বলব কেন?

শাহানার পড়ায় আর মন বসছে না। ভাবী কেমন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। এমন মায়া লাগছে দেখতে। শাহানার মনে হল এই পরিবারে এসে ভাবী ঠিক সুখী হয়নি। বিয়ের পর সব মেয়েরাই নিজের একটা আলাদা সংসার চায়। ভাবীও নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু এখানে ভাবীর কোন আলাদা সংসার নেই।

মাসের এক তারিখে সংসারের পুরো টাকাটা মা'র হাতে তুলে দেয়। সব কেনা কাটা হয় মা'র হাতে। ডাল রান্না হবে না আলুভাজা হবে এই সামান্য জিনিসটাও মাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। মা'র মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই ভাবী সব কিছু করে তবু মাঝে মাঝে মা এমন খারাপ ব্যবহার করেন যে শাহানার নিজেরই লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে।

একবার ভাবী তার নিজের মা'র অসুখের খবর শুনে একশটা টাকা পাঠাল মানিঅর্ডার করে। তার রসিদ এসে পড়লো মা'র হাতে। তিনি এমন হৈ চৈ শুরু করলেন, সব টাকা পয়সা পাচার হয়ে যাচ্ছে গোপনে, নিজেদের যেখানে চলে না....ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবী লজ্জায় অপমানে নীল হয়ে গেল। কিন্তু একটি কথাও বলল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগল। ভাবী না হয়ে অন্য কোন মেয়ে হলে কি যে কাণ্ড হত কে জানে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিত নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাবী খুব স্বাভাবিক। যেন তেমন কিছু হয়নি। বিকেলে ঠিকই রান্না করল। রাতে সবাইকে খাইয়ে নিজে শাশুড়ীর সঙ্গে খেতে বসল।

মা তখন আবার টাকার প্রসঙ্গ তুললেন, বৌমা শোন, কিছু কিছু মেয়ে আছে স্বামীর বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করতে পারে না। সুযোগ পেলেই বাপের বাড়িতে যা পারে পাচার করতে চেষ্টা করে। মনে করে সেটাই আসল জায়গা। এটা ঠিক নয়। বিয়ের পর বাড়ি একটাই—স্বামীর বাড়ি।

ভাবী শান্ত স্বরে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না মা। আমি আর পাঠাব না। আর যেটা পাঠিয়েছি সেটা সংসারের টাকা না। আমার নিজের টাকা।

ঃ তোমার আবার টাকা এল কোত্থেকে?

ঃ ও আমাকে মাঝে মাঝে কিছু হাতখরচ দেয়। সেটা আমি খরচ করি না।

ঃ তোমার আবার আলাদা হাতখরচের দরকারটা কি? তুমি তো আর স্কুল কলেজে যাও না যে রিকশা ভাড়া বাস ভাড়া লাগবে? আর হাতখরচের সেই টাকাও তো সংসারের টাকা। ঠিক না?

জানালায় আবার খট খট শব্দ হচ্ছে। শাহানা ভয়ে ভয়ে ডাকল, ভাবী। ও ভাবী। নীলু উঠে বসল।

ঃ কি?

ঃ জানালায় কিসের যেন শব্দ হচ্ছে।

ঃ বাতাসের শব্দ। তুমি দেখ তো শাহানা ক'টা বাজে?

ঃ আটটা।

ঃ মাত্র আটটা?

ঃ কি হয়েছে ভাবী?

নীলু জবাব দিল না। হঠাৎ তলপেটে একটা তীব্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বোধ করল। অন্য কোন শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এর জাত আলাদা। নীলুর চোখ ভিজে গেল। সোফা আঁকড়ে ধরে সে ব্যথার ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করল।

ঃ এ রকম করছ কেন ভাবী?

নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল--মরে যাচ্ছি শাহানা।

শাহানা কি করবে ভেবে পেল না। তার গা কাঁপতে লাগল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাড়িওয়ালার এক ভাগ্নে চিলকোঠার ঘরটায় থাকে। সে নাকি? শাহানা গলা ফাটিয়ে ডাকল, আনিস ভাই, আনিস ভাই! কেউ জবাব দিল না।

শাহানা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায় বাতি নেই। সে ছুটে গেল ডানদিকের একতলা বাড়িতে। বাড়িওয়ালা রশীদ সাহেব তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে থাকেন। সে বাড়ি তালা বন্ধ। দোতলার বাড়িতেও কোন পুরুষমানুষ নেই। রোগা একজন মহিলা (যাকে শাহানা আগে কোনদিন দেখেনি) বিরক্ত স্বরে বলল, ছুটাছুটি করে তো লাভ হবে না--টেলিফোন কর হাসপাতালে।

ঃ কোথায় আছে টেলিফোন?

ঃ রাস্তার ওপাশে হলুদ রঙ্গের বাড়িটাতে যাও। বাড়ির সামনে কাঁঠাল গাছ আছে। চিনতে পারছ?

শাহানা চিনতে পারল না--তবু ছুটে গেল। হলুদ বাড়ি। সামনে কাঁঠাল গাছ। রাস্তার দুপাশেই ঘন অন্ধকার। শীতের জন্যে দরজা জানালা বন্ধ করে রেখেছে সবাই। কেমন ভূতুড়ে লাগছে চারদিক। পান বিড়ির একটি দোকানে কয়েকজন ছোকরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে শাহানাকে। একজন বুড়ো রিকশাওয়ালা গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে।

ঃ এই শাহানা, কি ব্যাপার?

শাহানা কয়েক মুহূর্ত আনিসকে চিনতেই পারল না।

ঃ খালি পায়ে কোথায় যাচ্ছ?

ঃ বড় বিপদ আনিস ভাই। ভাবী যেন কেমন করছে।

ঃ বাসায় কেউ নাই?

ঃ না।

ঃ তুমি বাসায় যাও, আমি বেবী টেক্সি নিয়ে আসি।

আনিস দৌড়ে গেল বড় রাস্তার মোড়ের দিকে। সেখানে মাঝে মাঝে বেবী টেক্সি পাওয়া যায়।

নীলুকে পিজিতে নেয়া হল রাত ন'টায়। মরণাপন্ন রুগীকে ডাক্তাররা নিতান্ত অবহেলায় ইমার্জেন্সিতে ফেলে রাখেন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেটা বোধ হয় ঠিক না।

দু'জন ডাক্তার নীলুকে তৎক্ষণাৎ অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেলেন। একজন আনিসকে বললেন, রুগীর অবস্থা খুবই খারাপ, প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে। রক্ত লাগবে। রক্তের ব্যবস্থা করুন।

শাহানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। আনিস কোন কারণ ছাড়াই একবার তিনতলায় উঠছে একবার নীচে নেমে যাচ্ছে। রক্তের ব্যবস্থা কিভাবে করতে হয় সে কিছুই জানে না।

রাত ন'টা একচল্লিশ মিনিটে একজন ডাক্তার এসে শাহানাকে বললেন, খুকী, কান্না থামাও। মেয়ে হয়েছে একটি। রুগী ভালই আছে।

ঃ বাচ্চাটি? বাচ্চাটি?

ঃ খুব ভাল না, তবে ঠিক হয়ে যাবে।

দাড়িগোঁফওয়ালা ডাক্তারটি হাসলেন। শাহানার ইচ্ছা হল সে প্রচণ্ড চিৎকার করে ঢাকা শহরের সবাইকে জানিয়ে দেয়, তোমরা শোন, আমাদের ভাবীর একটি মেয়ে হয়েছে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, সে বড় ভয় পেয়েছে।

ট্যাঁ ট্যাঁ করে একটি বাচ্চা কাঁদছে। এটি কি তার বাচ্চা? একজন নার্স কি যেন বলছে, কিছুই কানে যাচ্ছে না। নীলু চোখ মেলতে চেষ্টা করল, চোখ পাথরের মত ভারী। কিছুতেই মেলে রাখা যাচ্ছে না। রাজ্যের ঘুম চোখে। চারপাশে কারা যেন হাঁটাহাঁটি করছে। মুখের ঠিক উপরে হলুদ আলো। চোখ বন্ধ তবুও সে আলো কেমন করে যে চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

কাঁদছে একটা ছোট্ট শিশু, কেমন অদ্ভুত শব্দে কাঁদছে। বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। নীলু ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে পরিষ্কার শুনল, শাহানা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলছে—ভাবী, তাকিয়ে দেখ তোমার বাবুকে।

নীলু ঘুমের মধ্যেই হাসতে চেষ্টা করল। নতুন শিশুটি কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পৃথিবীর কোন কিছুই এখন আর তার ভাল লাগছে না। পৃথিবীর আশা, আনন্দ, সুখ একদিন হয়ত তাকে স্পর্শ করবে কিন্তু আজ করছে না। সে তার ছোট ছোট হাত মুঠি পাকিয়ে ক্রমাগত কাঁদছে।

বাবু হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমের মধ্যেই কি কারণে যেন তার নিচের ঠোঁট বেঁকে গেল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল নীলু। কি অপূর্ব দৃশ্য! এমন মায়া লাগে! চোখে পানি এসে যায়, বুকের কাছটায় ব্যথা ব্যথা করে। নীলু মৃদু স্বরে ডাকল, "এই বাবু, এই।" বাবুর বাঁকা ঠোঁট আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আহ্, কেন এত মায়া লাগে? নীলু নীচু হয়ে তার কপালে চুমু খেল। কেমন বাসি শিউলী ফুলের গন্ধ বাবুর গায়ে। কি অদ্ভুত সেই গন্ধ!

ঃ ভাবী।

নীলু চমকে সরে গেল। কারো সামনে বাবুকে আদর করতে তাব বড় লজ্জা লাগে। শাহানা হাসি মুখে দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঃ বাবু জেগেছে ভাবী?

ঃ নাহ্।

ঃ জাগলেই আমাকে খবর দেবে। আমি কোলে নেব।

ঃ ঠিক আছে, দেব।

ঃ এ তো দেখি রাতদিনই ঘুমায়। এত ঘুমায় কেন?

ঃ কি জানি।

শাহানা এসে বসল বাবুর পাশে।

ঃ কি ছোট ছোট কান দেখেছ? ইঁদুরের কানেব মত। তাই না ভাবী?

ঃ হুঁ।

ঃ ছোট কান যাদের তাদের রাগ খুব বেশী হয়। ওর খুব রাগ হবে, মা'র চেয়েও ও বেশী রাগী হবে।

নীলু কিছু বলল না। শাহানা বাবুর হাত ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ইতস্ততঃ করে বলল, ওকে কোলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে একটু বসব ভাবী?

ঃ ঘুম ভাঙ্গার আগেই?

ঃ হুঁ।

ঃ ঠিক আছে নিয়ে যাও। এসো আমি কোলে তুলে দেই।

শাহানা হাত পেতে বসল। নীলু ছোট একটা নিঃশ্বাস গোপন কবল।

বাবুকে সে খুব কম সময়ের জন্যেই কাছে পায়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই তার শাশুড়ী মনোয়ারা এসে বাবুকে নিয়ে যান।

রোদ উঠলেই বাচ্চাকে তেল মাখাতে বসেন। তেল মাখানো এত প্রবল বেগে চলে যে নীলুর ভয় ভয় লাগে। সট করে একটা নরম হাড় হয়ত ভেঙ্গে যাবে। তেল মাখানোতেই শেষ নয়। তিনি নাক ঠিক করতে বসেন, দীর্ঘ সময় ধরে নাক টিপে টিপে ধরেন। যাতে ভবিষ্যতে বাচ্চার খাড়া নাক হয়। তাবপর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে থুতনিতে অল্প

অল্প চাপ দেন দীর্ঘ সময় ধরে। এরকম করলে বাচ্চার মুখ পরবর্তী সময়ে ফজলি আমের মত হবে না।

বেলা এগারোটার দিকে বাবুর গোসল হয়। নীলুর খুব ইচ্ছা গোসলটি সে নিজে করায় কিন্তু এখন পর্যন্ত সে সুযোগ পায়নি। একদিন ভয়ে ভয়ে বলেছিল, আমার কাছে দেন মা আমি করিয়ে দেই।

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—তুমি এসব পারবে না। কানে পানি ঢুকবে। কান পচবে। তোমাকে যেটা করতে বলছি সেটা কর। গরম পানি মিশিয়ে গোসলের পানিটাকে কুসুম গরম কর।

পানি কুসুম গরম করাও একটা দীর্ঘ ঝামেলার কাজ। লাল প্লাস্টিকের গামলায় নীলু কেতলি থেকে গরম পানি ঢালে। মনোয়ারা হাত ডুবিয়ে চেঁচিয়ে উঠেন, একি কাণ্ড বৌমা! এ তো আগুন গরম পানি। যাও ঠাণ্ডা পানি এনে মেশাও। ঠাণ্ডা পানি মেশানোর পর তিনি আবার চেঁচিয়ে উঠেন, এ তো দেখি বরফের মত ঠাণ্ডা করে ফেললে। কোন একটা কাজও কি ঠিক মত পার না?

গোসলের পর পরই বাচ্চার ক্ষিধে পায়। সেই দুধ খাওয়ানোর পর্বেও মনোয়ারা পাশে বসে থাকেন। নীলুর বড় লজ্জা লাগে। কিন্তু কোন উপায় নেই।

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটা ঠিকমত হচ্ছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখেন।

ঃ একি বৌমা, বুকের সঙ্গে এভাবে চেপে ধরে আছ কেন? দম বন্ধ করে মারতে চাও নাকি? মাথাটা আরেকটু উঁচু করে ধর। আহ্, আঁচল ধরে এত টানাটানি করছ কেন? এখানে পুরুষমানুষ কি কেউ আছে যে লজ্জায় মরে যাচ্ছ?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মনোয়ারা খানিকক্ষণের জন্যে ঘুমুতে যান। তখন আসেন নীলুর শ্বশুর হোসেন সাহেব। তিনি মাস ছয়েক হল রিটায়ার করেছেন। ঘরে বসে থাকার নতুন জীবনযাত্রায় এখনো নিজেকে পুরোপুরি অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন নি। নানা ধরনের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছেন। কোনটিতেই সফল হননি। ইদানীং হোমিওপ্যাথির বই-টই খুব পড়ছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে, হোমিওপ্যাথির পরে চিকিৎসা শাস্ত্রে এখনো কিছু তৈরী হয়নি। ঠিকমত লক্ষণ বিচারটাই হচ্ছে আসল কথা।

নীলু তার শ্বশুরকে খুবই পছন্দ করে। সব সময় চেষ্টা করে তাঁর জন্যে বাড়তি কিছু করতে। সেটা কখনো সম্ভব হয় না। বাঁধা আয়ের বড় সংসারে কারো জন্যে বাড়তি কিছু করা যায় না।

দুপুরে মনোয়ারা ঘুমিয়ে পড়লে হোসেন সাহেব আসেন। দরজার বাইরে থেকে চাপা গলায় বলেন—টুনী কি ঘুমাচ্ছে বৌমা?

ঃ জি বাবা। আসুন।

তিনি এসে হাসি মুখে বিছানার পাশে বসেন। নীচু স্বরে ডাকেন—টুনী, টুনী। টুনটুনী, ঝুনঝুনী, খুনখুনী, শুনশুনী।

বাবুর এখনো নাম ঠিক হয় নি। যখন যার যা ইচ্ছা তাই ডাকে। একমাত্র হোসেন সাহেব প্রথম দিন থেকে টুনী ডেকে আসছেন।

এই নাম মনোয়ারার মোটেই পছন্দ নয়। প্রথম দিনেই তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন—কি টুনী টুনী করছ? টুনী একটা নাম নাকি?

ঃ টুনী নামটা খারাপ কি?

ঃ টুনী নামের ছেলেপুলেরা বড় হয় না। টুনটুনী পাখির মত ছোট থাকে।

ঃ মানুষের বাচ্চা বড় হয়ে মানুষের মতই হবে। কারো নাম হাতী রাখলেই সে হাতীর মত হবে নাকি?

ঃ বাজে তর্ক করবে না।

ঃ বাজে তর্ক কি করলাম?

ঃ আমার সামনে তুমি টুনী ডাকবে না, ব্যাস। যদি ডাকতে ইচ্ছা হয় আড়ালে ডাকবে।

হোসেন সাহেব প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্ত্রী কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেন। এই একটি ক্ষেত্রে করেন নি। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার তিনি বেশ উঁচুস্বরেই ডাকবেন—টুনী, টুনী। ব্যাপারটা উদ্দেশ্যমূলক। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে একটা চাল চালছেন। নিজের পছন্দের নামটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তাঁর সাধনা যে পুরোপুরি বিফলে যাচ্ছে সেটা বলা ঠিক হবে না। তিনি ছাড়াও এ বাড়ির লোকজনও এক-আধবার মনের ভুলে টুনী বলে ফেলছে। মনোয়ারা নিজেই একদিন বলেছেন।

হোসেন সাহেবের ধারণা এ রকম ভুল এরা করতেই থাকবে এবং এক সময় টুনী নামটিই স্থায়ী হবে।

হোসেন সাহেব নীচু গলায় বললেন—দেখতে কার মত হয়েছে বৌমা?

ঃ বুঝতে পারছি না তো। সবাই বলছে ওর বাবার মতই হয়েছে।

ঃ সফিকের মত হয়েছে? আরে না। সফিকের সাথে কোন মিল নাই। তোমার সাথে কিছু মিল আছে। গায়ের রঙটা পেয়েছে তোমার শাশুড়ীর। এক্কেবারে গোলাপের মত রঙ।

নীলু হাসি গোপন করবার জন্যে মুখ অন্যদিকে ফেরাল। সে বুড়ো মানুষটির এই দুর্বলতাটা খুব ভাল জানে, ফাঁক পেলেই তিনি স্ত্রীর প্রসঙ্গে একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। এখন যেমন হয়েছেন। নীলু বলল—চা খাবেন বাবা? এক কাপ চা করে দেই?

ঃ দাও। চিনি দিও না। চিনিটা শরীরের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর।

ঃ তাই নাকি বাবা?

ঃ হুঁ। চিনি যেমন ক্ষতি করে লবণও সে রকম ক্ষতি করে। এই জন্যে প্রেসার হলে লবণ খাওয়া কমাতে বলে ডাক্তারেরা। সাদা রঙের সব খাদ্যদ্রব্যই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

নীলু হেসে বলল—দুধ? দুধও তো সাদা!

হোসেন সাহেব অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বসে রইলেন। নীলুর নিজের কাছেই খারাপ লাগতে লাগল। দুধের প্রসঙ্গটা না তুললেও হত।

ঃ আপনার চায়ে দুধ দেব বাবা?

নীলু তার শ্বশুরকে খুব ভালমতই চেনে। লিকার চা একচুমুক খেয়েই তিনি বলবেন—একচামচ চিনি দাও তো মা। চিনি দেবার পর বলবেন—আধচামচ দুধও দাও, কেমন কষা কষা লাগছে চা-টা। জ্বাল বোধ হয় বেশী হয়েছে।

নীলু চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকে দেখল হোসেন সাহেব বাবুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। তিনি নীলুকে দেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন—হাত পা নাড়ানাড়ি করছিল। ভাবলাম উঠে পড়ে কি না। কোলে নিতেই শান্ত।

ঃ চা নিন বাবা।

চায়ে চুমুক দিয়ে হোসেন সাহেব তৃপ্তির স্বরে বললেন— আহ্, ফাস ক্লাশ চা হয়েছে মা, একটু বোধ হয় চিনি দিয়েছ?

ঃ এক চামচ দিয়েছি।

ঃ ভাল করেছ। বিনা চিনির চা বিষের মত লাগে।

নীলু বলল—সিগারেট খাবেন? দিব?

ঃ দেখি দাও। তোমার শাশুড়ী উঠে না পড়লে হয়।

ঃ উনার উঠতে দেরী আছে।

নীলু ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। হোসেন সাহেব এবং নীলুর মধ্যে এই গোপন ব্যাপার আছে। মনোয়ারা যখন ঘুমিয়ে থাকেন কিংবা বাইরে কোথাও যান তখন হোসেন সাহেব ইতস্ততঃ করে বলেন—বৌমা, দেখ তো সফিক তার সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে কিনা। ফেলে গেলে দাও একটা।

সফিক সিগারেটের প্যাকেট ফেলে যাবার লোক না। নীলু তার শ্বশুরের জন্যে সিগারেট আনিয়ে আলাদা লুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে সফিকের ছোট ভাই রফিক সেখানে ভাগ বসায়।

ঃ ভাবী, গোপন জায়গা থেকে একটা সিগারেট ছাড় তো।

নীলু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে—আমার কাছে নেই।

ঃ দাও না ভাবী, প্লীজ। এ রকম কর কেন?

উপায় নেই দিতে হয়। রফিক আয়েস করি সিগারেটে টান দিয়ে বলে—তোমার চেহারা এত মায়া মায়া কিন্তু আচার-আচরণ এত কঠিন কেন?

ঃ কঠিন কোথায়। দিলাম তো একটা।

ঃ তুমি বলেই একটা দিলে। পৃথিবীর অন্য সব ভাবীরা গোটা একটা প্যাকেট আনিয়ে দিত।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ। এখন শোন ভাবী, তুমি তোমার মেয়েলী বুদ্ধি দিয়ে একটা সমস্যার সমাধান কর। একটা কঠিন সমস্যা।

রফিক আজগুবী একটা সমস্যা হাজির করবে। সেই সমস্যার কোন আগা নেই মাথা নেই। যেমন গত সপ্তাহেই সে গম্ভীর মুখে বলল—আচ্ছা ভাবী, ধর একটা ছেলের একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। খুবই পছন্দ। রীতিমত 'লভ' যাকে বলে। এখন ছেলেটা মেয়েটাকে সেই কথাটা বলতে চায়। বা নিজের অনুভূতির ব্যাপারটা মেয়েটাকে বুঝতে দিতে চায়। কি ভাবে সেটা করা উচিত?

নীলু হাসি মুখে বলল— মেয়েটা কে?

ঃ মেয়ে যেই হোক, তুমি সমস্যাটার সমাধান কর।

ঃ ছেলেটা একটা চিঠি লিখবে কিংবা বলবে মুখে।

ঃ তুমি একেবারে পাগল-ছাগলের মত কথা বলছ ভাবী। আমি চাচ্ছি একটা ইউনিক কিছু। যেখানে হাই ড্রামা থাকবে। সাসপেন্স থাকবে।

ঃ তাহলে এক কাজ কর, মেয়েটার সামনে হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়। তারপর গড়াগড়ি খেতে থাক। যখন চারদিকে লোকজন জমে যাবে এবং মেয়েটিও এসে পাশে দাঁড়াবে তখন ফিস ফিস করে বল....।

ঃ একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছ থেকে এরকম ঠাট্টা-তামাশা আশা করিনি। মোস্ট আনফরচুনেট।

ঃ খুব সিরিয়াস নাকি?

রফিক জবাব না দিয়ে উঠে পড়ে।

ভাইয়ে ভাইয়ে এমন অমিল হয় কি করে নীলু প্রায়ই ভাবে। সফিকের সঙ্গে রফিকের কোন মিল নেই। সফিক উত্তর মেরু হলে রফিক দক্ষিণ মেরু।

সফিকের চরিত্রে হাল্কা কোন ব্যাপারই নেই। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠবে। কনকনে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল সারবে। নাশতা খেয়ে অফিসের জন্যে তৈরী হবে। এক ফাঁকে শুধু বলবে—নীলু দেখ তো, পত্রিকা এসেছে নাকি। সকাল বেলা কথাবার্তা এই পর্যন্তই। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ হুঁ ছাড়া অন্য কোন জবাব দেবে না।

পারিবারিক সমস্যার ব্যাপারগুলি সে শুনবে খুব মন দিয়ে। কখনোই কোন প্রশ্ন করবে না। সমস্যার সমাধান করবে এক লাইনে। নীলু প্রথম দিকে বলত—কথা কম বল কেন? কথা বলতে কি তোমার কষ্ট হয়?

সফিক বলত—না, কষ্ট হয় না।

ঃ তাহলে? দিনরাত মুখ বন্ধ করে থাক কিভাবে?

ঃ অন্যের কথা শুনতেই আমার বেশী ভাল লাগে।

এটাও সত্যি নয়। সবাই মিলে হয়ত কথাবার্তা বলছে, হঠাৎ দেখা যাবে সফিক নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে। যেন কোথাও তার কোন ভূমিকা নেই।

ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে এই নিয়েও তার তেমন কোন উৎসাহ নেই। শাহানা একবার বলল—ভাইয়া, তুমি তো কখনো বাবুকে কোলে নাও না।

সে হেসে বলেছে--ছোট বাচ্চা, ঘাড় শক্ত হয়নি, এই জন্যেই নেই না। একটু বড় হোক। বড়সড় হলে দেখবি কোল থেকে আর নামাব না।

নীলুর প্রায়ই মনে হয় সফিকের ভেতর মায়া-মমতাটা বোধ হয় একটু কম। একটু না, হয়ত অনেকটাই কম। নীলুর যখন এবোরশন হল, কি ভয়াবহ অবস্থা-- হাসপাতালেই কাটাতে হল পনেরো দিনের মত। এই পনেরো দিনে সফিক তাকে দেখতে গেল মাত্র তিন দিন। যেন বাইরের কোন অল্প-পরিচিত আত্মীয় তাকে দেখতে গিয়েছে। চার-পাঁচ মিনিট বসেই উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে—যাই নীলু?

নীলুর চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। সে কিছু বলল না। চোখের জল গোপন করবার জন্যে অন্যদিকে তাকাল। শাহানা অবাক হয়ে বলল--এখনই যাবে কি ভাইয়া, এইমাত্র তো এলে।

ঃ বসে থেকে করব কি?

ঃ ভাবীর সঙ্গে গল্প কর।

সফিক অবাক হয়ে বলেছে—কি গল্প করব?

মানুষ এমন অদ্ভুত হয় কেন? প্রায় পাঁচ বছর হয়েছে তাদের বিয়ের। এই দীর্ঘদিনে একবারও সে বলেনি--নীলু এই নাও, তোমার জন্যে একটা শাড়ি কিনলাম।

এই যে সংসারে নতুন একটি বাবু এসেছে, সবার মধ্যে কত আনন্দ কত উত্তেজনা অথচ সফিক নির্বিকার। রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে ঘণ্টা খানিক বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকবে, তারপর অত্যন্ত সহজভাবে ঘুমুতে যাবে। নীলু মাঝে মাঝে কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করে।

ঃ বাবুর জন্যে কোন নাম টাম ভেবেছ?

ঃ তোমরাই ঠিক কর একটা।

ঃ বাবা টুনী রাখতে চান। টুনী কেমন লাগে তোমার?

ঃ ভালই তো। টুনীই রাখ।

ঃ মা'র টুনী নাম একেবারেই পছন্দ না। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর লেগে যাচ্ছে।

সফিক হাই তুলে বলে--সামান্য একটা নাম নিয়ে এত ঝামেলা কেন?

ঃ নামটাকে এত সামান্য ভাবছ কেন? সারাজীবন এটা থাকবে। এক জীবনে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে এই নামে ডাকবে। নামটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ঠিক না?

ঃ হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। তুমি মাঝে মাঝে খুব গুছিয়ে কথা বল।

নীলুর আরো কত কথা বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সফিকের নিঃশ্বাস অল্প সময়ের মধ্যেই ভারী হয়ে উঠে।

সে ইদানীং খুব পরিশ্রম করছে। জয়দেবপুরে তাদের নাকি কি কনসট্রাকশন হচ্ছে। রোজ তিনটার সময় মতিঝিল থেকে চলে যেতে হয় জয়দেবপুরে। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত নটা দশটা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিছানায় যেতে না যেতেই ঘুম।

নীলুর ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকে। ঘরে একটা জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে সারা রাত। নামেই জিরো পাওয়ার আসলে বেশ আলো। স্পষ্ট সবকিছু দেখা যায়। সে প্রায়ই চুপচাপ বসে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত ভাল লাগে তাকিয়ে থাকতে। লাল কম্বলের ফাঁকে টুকটুকে ফর্সা একটা মুখ, ভাগ্যিস মেয়েটি তার মত কালো হয়নি। ওর চাচার রং পেয়েছে। নীলুর মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে সারারাত বাবুকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে। সে তার মেয়ের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথাবার্তাও বলে--কি হয়েছে সোনামনি। ওমা ওমা, ঠোঁট বাঁকা করছে কেন আবার, স্বপ্ন দেখছ মা? ভয়ের স্বপ্ন? দূর বোকা মেয়ে, এই তো আমি পাশে। এই তো তোমার হাত ধরে বসে আছি।

উষ্ণ একটি শয্যা। একপাশে মা অন্যপাশে বাবা, তবুও ছোট বাবু মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বা অন্য কারণে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। সে কান্না সহজে থামে না।

মনোয়ারা উঠে দরজায় ধাক্কা দেন--কি হয়েছে এই বৌমা?

ঃ কিছু না মা, এম্নি কাঁদছে।

ঃ আহ্, দরজাটা খোল না। দেখি কি ব্যাপার।

সফিক ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে দেয়। মনোয়ারা বিরক্ত স্বরে বলেন, নিশ্চয়ই পিপড়া কামড়েছে। কতবার বলি শোবার সময় বিছানার চাদর ভাল করে ঝাড়বে। কোন একটা কাজও ঠিকমত করতে পার না কেন?

পিপড়া খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু দু'টি মশা পাওয়া যায়। রক্ত খেয়ে লাল হয়ে আছে।

ঃ বৌমা, শোবার আগে মশারীটাও দেখে নিতে পার না?

বাচ্চা কাঁদতেই থাকে। হোসেন সাহেব টর্চ হাতে উপস্থিত হন। গম্ভীর গলায় বলেন—পেট ব্যথা। পেট ব্যথার কান্না এ রকম থেমে থেমে হয়। এক ডোজ আর্নিকা টু হানড্রেড খেলে আরাম হবে।

মনোয়ারা চোখ লাল করে তাকাতেই তিনি চুপ করে যান। চটি ফট ফট করতে করতে রফিক এসে উপস্থিত হয়।

ঃ বড্ড বেশী ক্রাইং হচ্ছে। হোয়াট হেপেণ্ড? দেখি আমার কোলে দাও তো ভাবী। এক মিনিটের মধ্যে কুল ডাউন করে দিচ্ছি।

মনোয়ারা ধমকে উঠেন– ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না। যা এখান থেকে।

ঃ আমি অসুবিধা কি করলাম? এরকম শকুন-চক্ষুতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

কান্না যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করে থেমে যায়। বাবু হাত পা ছড়িয়ে ঘুমুতে শুরু করে। কে বলবে এই কয়েক মিনিট আগেই সে রীতিমত একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিল।

রফিক হাই তুলে বলে—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে, এখন ঘুমোনো মুশকিল হবে। এক কাপ চা খেলে মন্দ হত না। কি বল ভাবী?

নীলু জবাব দেয় না। হোসেন সাহেব ক্ষীণ স্বরে রফিককে সমর্থন করেন।

ঃ দুধ চিনি ছাড়া হালকা লিকারের এক কাপ চা খাওয়া যায়। আইডিয়াটা খারাপ না।

মনোয়ারা রাগী গলায় বলেন--ঘুমুতে আস। রাত দু'টার সময় চা বানাতে হবে? মাথাটা খারাপ হয়েছে নাকি?

হোসেন সাহেব ঘুমুতে যান। নীলু সত্যি সত্যি রাত দুটোর সময় চা বানাতে যায়। চারদিকে সুনশান নীরবতা। গ্যাসের চুলায় নীল আগুন জ্বলছে। বিজ বিজ শব্দ হচ্ছে কেতলীতে। কেন জানি অন্য রকম একটা ভাব আসে নীলুর মনে। অন্য এক ধরনের আনন্দ। পৃথিবীটাকে বড় সুন্দর মনে হয়। ছোট-খাট দুঃখ তো থাকবেই তবু সব কিছু ছাড়িয়ে আমাদের চারিদিকে গভীর একটা আনন্দ আছে। এটা যে আছে তা সব সময় ধরা পড়ে না। কিছু রহস্যময় মুহূর্তেই শুধু ধরা পড়ে।

গাঢ় আনন্দে নীলুর চোখ ভিজে উঠে। সে গায়ের চাদর দিয়ে চোখ মুছে।

রফিক চায়ের তাগাদা দিতে এসে দৃশ্যটি দেখে থমকে দাঁড়ায়।

ঃ কাঁদছ কেন ভাবী?

ঃ কাঁদছি না।

রফিক ইতস্তত করে বলল--এ বাড়ির আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালবাসি এই কথাটা কি তুমি জান?

ঃ জানি।

ঃ এরপরও যদি দুপুর রাতে একা একা কাঁদ, তাহলে খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আর কাঁদবে না।

নীলু হাসল।

ঃ তুমি যদি চাও তাহলে একটা খুব মজার গল্প বলে তোমাকে হাসাবার চেষ্টা করতে পারি।

ঃ ঠিক আছে চেষ্টা কর।

রফিক কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে মৃদু স্বরে বলল, কাল ভোরে তুমি আমাকে একশটা টাকা দিতে পারবে? ধার। আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দেব। অনেস্ট।

ঃ এইটা তোমার মজার গল্প?

ঃ মজার গল্পটা একটু পরে বলছি। আগে সমস্যার কথাটা বলে নেই। ভাবী, পারবে?

ঃ একশ পারব না। পঞ্চাশ দিলে হয়?

ঃ বাকি পঞ্চাশ পাব কোথায়?

ঃ খুব যদি দরকার হয় তাহলে তোমার ভাইকে বলে দেখতে পারি। বলব?

ঃ বল। তবে ভাবী, আমার কথা বলতে পারবে না। বলবে তোমার নিজের দরকার।

ঃ ঠিক আছে বলব। এখন শোনাও তোমার হাসির গল্প।

তারা দু'জন চায়ের কাপ হাতে বসার ঘরে এসে বসল। রফিক তার নতুন গজানো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প শুরু করল—

"এক লোক মসজিদে গেছে নামাজ পড়তে। বদনায় পানি বেশী ছিল না কাজেই একটা মাত্র পা ধোয়া গেল।

নামাজ যখন শুরু হল তখন দেখা গেল ঐ লোক বকের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে। অন্য পাটি গুটিয়ে রেখেছে। তখন ইমাম সাহেব...."

এই পর্যন্ত শুনেই নীলু মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ল। রফিক বিরক্ত স্বরে বলল— গল্প না শুনেই হাসছ যে, সবটা শুনে নাও। মেয়ে-ছেলেদের সাথে হাসির গল্প বলাও একটা মুসিবত। না শুনেই হাসি। হোয়াট ইজ দিস?

পুরানো ঢাকার ঘিঞ্জির মধ্যে যে এমন একটি বিশাল এবং আধুনিক ধরনের বাড়ি থাকতে পারে সেটা রফিকের কল্পনাতেও আসেনি। সে গেটের ভেতরে পা দেবে কি দেবে না বুঝতে পাবল না। এ জাতীয় বাড়িতে কুকুর থাকবেই। এসব কুকুররা আবার কোন একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কারণেই বোধ হয় মানুষদের মধ্যে যে শ্রেণীর একটা ব্যাপার আছে সেটা চমৎকার বুঝে ফেলে। কোন আগন্তুক তাদের মুনিবের শ্রেণীর চেয়ে নিম্নশ্রেণীর হলেই কামড়াবার জন্যে ছুটে আসে।

বাড়ির গেট বন্ধ। তবে গেটের ভেতরও আবার ছোট গেট আছে। মাথা নীচু করে যার ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয়। রফিক তাই করল এবং আশ্চর্য, সত্যি সত্যি একটি কুকুরের ডাক শুনা গেল। ভয়াবহ কিছু নয়। মৃদু গর্জন। রফিক চট করে মাথাটা টেনে নিল।

গেটের দারোয়ান বলল--ও কিছু করবে না। আসেন। কাকে চান?

বড়লোকের বাড়িতে ঢোকার এই আরেক ফ্যাকড়া, জায়গায় জায়গায় জবাবদিহি করে ঢুকতে হবে। গেটে একবার বলতে হবে। বাড়িতে বেল টিপলে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি আসবে, তাকেও বলতে হবে। তারপর তাকে বসানো হবে। এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হবে। বড় লোকেরা চট করে দেখা দেন না।

ঃ কার কাছে যাবেন?

এই দারোয়ানটির বাড়ি বোধ হয় রাজশাহী-টাজশাহীর দিকে হবে। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছে। চেহারাও মাই ডিয়ার টাইপের। রফিক হাসি মুখে বলল—রহমান সাহেব কি আছেন?

ঃ জি না, উনি নাই। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না।

ঃ তাঁর মেয়ে কি আছে?

জ্বি আপামনি আছেন। যান সোজা চলে যান। দরজার বাঁ দিকে কলিং বেল আছে। কুকুর কিছু করবে না।

রফিক খুব সহজ ভাঙ্গতে হাটবার চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরটা আসছে সঙ্গে সঙ্গে। বিশাল পর্বতের মত একটা জন্তু। তার চোখে গভীর সন্দেহ। বোধ হয় টের পেয়ে ফেলেছে এই লোক তাদের সমাজের না। এবং এই লোকের পকেটে আছে মাত্র দু'টি পাঁচ টাকার নোট। যার একটি ছেঁড়া বলে কেউ নিতে চাচ্ছে না। গত এক সপ্তাহে কয়েকবার ভীড়ের মধ্যে বাস-কনডাকটারের হাতে গছিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজ হয়নি।

রফিক বেল টিপে দাঁড়িয়ে রইল। কুকুরটা বড় বিরক্ত করছে তাকে, শুঁকে শুঁকে দেখছে। সে বহু কষ্টে কুকুরটার পেটে প্রচণ্ড একটা কিক দেবার ইচ্ছা দমন করল। কলিং বেল নষ্ট কিনা বুঝা যাচ্ছে না। কারোর কোন সাড়া নেই। রফিক দ্বিতীয়বার বেল টিপল।

তাকে অবাক করে দরজা খুলল শারমিন। শারমিনকে আজ অন্য দিনের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর লাগছে। নিজের বাড়িতে আছে বলেই হয়ত চেহারায় কোন কাঠিন্য নেই। চুল বাঁধা নয়, পিঠময় ছড়ানো, সাধারণ একটা সূতীর শাড়ি এলেমেলো করে পড়া। রফিক বলল, চিনতে পারছেন তো?

ঃ চিনতে পারব না কেন? আসুন ভেতরে আসুন।

রফিক হড়বড় করে বলল, আগামসি লেনে এসেছিলাম একটা কাজে, তারপর ভাবলাম এত কাছে যখন এসেছি তখন বরং দেখেই যাই।

ঃ ভাল করেছেন। আমি যে এখানে থাকি সেটা জানলেন কি ভাবে?

রফিক জবাব দিল না। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। বসার ঘরটা তেমন জমকালো না। বরং বলা চলে বেশ সাধারণ। বেতের তিনটি সোফা। পাশে ছোট ছোট কফি টেবিল। কার্পেটটিও বিবর্ণ। বাড়ির সঙ্গে খাপ খায় না। শারমিন হাসি মুখে বলল—এত মন দিয়ে কি দেখছেন?

ঃ আপনাদের বসবার ঘরটা আরো জমকাল হবে ভেবেছিলাম।

ঃ এটা ড্রইংরুম না। এটা হচ্ছে এন্ট্রিরুম। বসবার ঘরে ঢুকবার আগের ঘর।

ঃ বলেন কি?

ঃ বৃটিশ আমলের বাড়ি। ওদের মত করে বানানো হয়েছে। এমন কি বসবার ঘরে একটা ফায়ার প্লেস পর্যন্ত আছে।

ঃ মাই গড।

ঃ আসুন আপনাকে দেখাই।

বসবার ঘরে ঢুকে রফিকের মন খারাপ হয়ে গেল। কেন একজন মানুষের এত বেশী টাকা থাকবে এবং অন্য একজনের পকেটে থাকবে দু'টি পাঁচ টাকার নোট যার একটি ছেঁড়া বলে চালানো যাচ্ছে না।

শারমিন বলল—এবার পছন্দ হয়েছে বসবার ঘর?

ঃ হুঁ।

ঃ তাহলে মুখ এমন গম্ভীর করে আছেন কেন? ক্লাসে তো আপনার কথার যন্ত্রণাতে সবাই অস্থির।

রফিক ফ্যাকাশে ভাবে হাসল।

ঃ বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

রফিক বসল। বসতে বসতে বলল—আপনারা এতটা বড়লোক আমি বুঝতে পারিনি।

ঃ বুঝতে পারলে আসতেন না?

রফিক সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, আপনার এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে?

ঃ যাবে না কেন, এটা তো আর মসজিদ না। খান, তারপর বলুন কোন কাজে এসেছেন না এম্নিতেই এসেছেন?

শারমিনের মুখ হাসি হাসি। রফিক বেশ অবাক হল। এই মেয়েটি ক্লাসে প্রায় কোন কথাই বলে না। ছেলেরা কেউ কাছে গেলে চোখ মুখ কঠিন করে রাখে। অথচ এখন কেমন সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে। আরেকটি জিনিস দেখেও রফিক অবাক হল, শারমিনের পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। সাত আট টাকায় যে সব পাওয়া যায় সে সব। তার ধারণা এ রকম বাড়িতে যারা থাকে তারা ঘরে সাধারণত জয়পুরী ঘাসের স্যাণ্ডেল পড়ে।

শারমিন বলল-চুপ করে আছেন কেন বলুন, কোন কাজে এসেছেন কি?

ঃ না, কোন কাজে আসিনি।

ঃ গল্প করবার জন্যে এসেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বেশ গল্প করুন, এমন স্টিফ হয়ে আছেন কেন? আমার মনে হয় ড্রইংরুমটায় আপনি ঠিক ইজি ফিল করছেন না। আমার নিজের একটি বসার ঘর আছে, আমি আমার নিজের মত করে সাজিয়েছি, চলুন ওখানে বসি। এই ঘরটা আমার নিজেরো ভাল লাগে না, কেমন যেন স্টাফি মনে হয়।

শারমিনের নিজের বসবার ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রলিতে করে একটি কাজের মেয়ে চা নিয়ে এল। চমৎকার একটি রূপোর থালায় ফ্রুট-কেক। অন্য একটি প্লেটে শিউলী ফুলের মত ধবধবে সাদা সন্দেশ।

ঃ এই সন্দেশ ঘরে তৈরী। আমাদের রমিজ ভাইয়ের করা, একবার খেলে সারা জীবন মনে থাকবে। এর একটি নাম আছে। নামটি আমার দেয়া—গোলাপবাহার, সন্দেশে গোলাপের গন্ধ আছে।

ঃ খাবার জিনিসে ফুলের গন্ধ আমার ভাল লাগে না। ফুলের গন্ধ থাকবে ফুলে। সন্দেশে থাকবে সন্দেশের গন্ধ।

শারমিন খিল খিল করে হেসে উঠল। এত সুন্দর হয় মানুষের হাসি? রফিক তাকিয়ে রইল মুগ্ধ চোখে।

ঃ আপনি খুব ভাল দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মদিন। এই কেক অবিশ্যি জন্মদিনের কেক না। জন্মদিনের কেক, বাবা সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসবেন। আপনি নিশ্চয়ই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন?

ঃ না, আমি এখন উঠব।

রফিক উঠে দাঁড়াল।

ঃ এখনই উঠবেন কি? চা তো শেষ করেননি?

ঃ অনেক দূর যেতে হবে।

ঃ কত দূর?

ঃ আমরা থাকি কল্যাণপুর। শহরের বাইরে।

শারমিন মুখ টিপে বলল, ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড?

ঃ না সে রকম কিছু না। ঐদিকে বাড়ি ভাড়া কম। আচ্ছা যাই তাহলে?

ঃ এক মিনিট দাঁড়ান। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, আপনাকে পৌঁছে দেবে।

ঃ পৌঁছে দিতে হবে না।

• দাঁড়ান তো। এ রকম করছেন কেন?

রফিককে পৌঁছে দেবার জন্যে চমৎকার লাল রঙের একটি গাড়ি বের হল। রফিক বিব্রত বোধ করতে লাগল।

শারমিন হাসি মুখে বলল, আবার যদি কখনো আপনার বন্ধুর বাড়িতে আসেন, তাহলে এদিকে আসতে পারেন। আমি খুশীই হব। কেউ কখনো আসে না।

ঃ আসে না কেন?

ঃ খুব যাদের টাকা-পয়সা আছে তাদের কেউ পছন্দ করে না। আমার বন্ধুবান্ধববা একবার এসে দ্বিতীয়বার আসতে চায় না। আজ আমার জন্মদিন অথচ কাউকে আমি আসতে বলিনি। আপনি হঠাৎ করে এলেন।

রফিক ইতস্ততঃ করে বলল-- আপনার জন্যে একটা বই এনেছিলাম।

শারমিন অবাক হয়ে বলল, আমার জন্যে? কেন?

রফিক জবাব দিতে পারল না। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া বইটি এগিয়ে দিল।

একটা কবিতার বই—এই বসন্তে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হচ্ছে বইটিতে লেখা—শারমিনের জন্মদিনে। তার মানে জন্মদিনের কথাটা রফিক জানতো!

রফিক বলল, যাই শারমিন।

শারমিন কিছু বলল না। সে বড়ই অবাক হয়েছে এবং তার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জাও করছে। কোথায় যেন সূক্ষ্ম ভাবে মন খারাপ হবার মত একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

এই ছেলেটিকে সে পছন্দ করে। দারুন হুজুগে ছেলে। সারাক্ষণই একটা না একটা হৈচৈ নিয়ে আছে। গত মাসে সে হঠাৎ ঘোষণা করল—এটা হচ্ছে সাম্যের যুগ। কবি নজরুলের ভাষায় পুরুষ-রমণীতে কোন ভেদাভেদ নাই। কিন্তু এই আমাদের ক্লাসেই ব্যাপারটা উল্টো। এ ক্লাসের সব কয়টা মেয়ে প্রথম দিকেব দু'সারি চেয়ারে এসে বসবে। এই দু'সারি ওদেব জন্য রিজার্ভ। এখন থেকে এটা বাতিল। মেয়েদের জন্যে এখন আর আলাদা জায়গা থাকবে না। যে আগে আসবে সে আগে বসবে।

ক্লাসের সব ছেলেরা হৈ হৈ করে তাকে খুব সাপোর্ট দিল। কাজের সময় সবাই পিছিয়ে গেল। শুধু রফিককে দেখা গেল মেয়েদের মাঝখানে বইখাতা নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। স্যার অবাক হয়ে বললেন, কি ব্যাপার, তুমি এদের মধ্যে কেন?

ক্লাসে দারুন হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, যাও যাও, নিজের জায়গায় গিয়ে বস। সবার চেষ্টা কিভাবে মেয়েদের বিরক্ত করা যায়। এটা ভাল না। মেয়েদেব দিকে মন দেবাব সময় অনেক পাবে, এখন পড়াশোনার দিকে মন দাও।

ছাত্রদের হাসির ঝড় উঠল।

আবাব একদিন সে ডায়াসে উঠে গম্ভীব গলায় এক বক্তৃতা দিয়ে বসল, আমরা ছেলেদের তুই তুই করে বলি অথচ মেয়েদের বলি আপনি করে। আজ এই বারোই সেপ্টেম্বরের সকাল বেলা আমি ঘোষণা করছি এখন থেকে আমরা মেয়েদেবও তুই করে বলব।

ক্লাসে নাসরিন হচ্ছে সবচেয়ে গম্ভীর ধরনের মেয়ে। মেয়ে না বলে বলা উচিত মহিলা। দু'টি বাচ্চা আছে তার। রফিক নাসরিনের কাছ গিয়ে বলল, নাসরিন তুই কেমন আছিস?

নাসরিন রেগে মেগে অস্থির। চোখ মুখ লাল কবে বলল, আমার সঙ্গে ফাজলামি করবেন না।

মেয়েদের তুই ডাকাব ব্যাপারে এখানেই চাপা পড়ে গেল। এক ধমকেই উৎসাহ মিইয়ে গেল রফিকের। কত বিচিত্র ধবনেব মানুষই না আছে।

শারমিন অলস ভঙ্গিতে বাড়ির পেছনেব দিকে রওনা হল। সেখানে তিনটা বড় বড গাছ আছে। রোদের মধ্যে হাঁটতে ভালই লাগছে। বিশাল অ্যালশেসিয়নটি আসছে তাব পেছনে পেছনে। শারমিন তার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যালো মার্টি সাহেব! কুকুরটি লেজ নাডল।

চমৎকার একটি সকাল, কি বল মার্টি?

মার্টি মাথা নাড়াল। যেন সে শারমিনের কথার অর্থ বুঝতে পারছে।

চমৎকার একটি সকালে সম্পূর্ণ অকারণে মাঝে মাঝে মানুষদের মন খারাপ হয়। তাদের কিছুই ভাল লাগে না। তোমাদেরও কি সেরকম হয়?

মার্টি সাহেব লেজ নাড়াল। যার কোন অর্থ বোঝা গেল না।

কুলগাছে হেলান দিয়ে পা ছাড়িয়ে বসে থাকলে কেমন হয়?

শারমিন তাই করল। মার্টি সাহেবের বসে থাকার পরিকল্পনাটা মনে ধরল না। সে রওনা হল গেটের দিকে।

গাছ ঝেঁপে কুল হয়েছে। পাকা ফুলের গন্ধে ম ম করছে চারদিক। খাবার লোক নেই। প্রকাণ্ড এই বাড়িতে তারা দুটি মাত্র মানুষ, সে এবং বাবা। চার-পাঁচজন কাজের মানুষ আছে, ড্রাইভার এবং দারোয়ান আছে কিন্তু ওদের থাকার জায়গা ভিন্ন। গেটের কাছে তাদের জন্যে বড় একটা ঘর তৈরী আছে।

সব কিছুই মানুষের অভ্যেস হয়ে যায়। এই বিরাট বাড়িতে কত দীর্ঘদিন ধরেই তারা দু'জন থাকছে। খুব ছোটবেলায় সে ঘুমাতো বাবার সঙ্গে। কোন কোন রাতে ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে কাঁদতো। বাবা বলতেন, এই তো আমি, তোমার হাত ধরে আছি। কোন ভয় নেই। স্বপ্ন দেখেছ?

ঃ হুঁ।

ঃ কি স্বপ্ন মা?

ঃ ভূতের স্বপ্ন।

ঃ দূর বোকা মেয়ে, ভূত আছে নাকি পৃথিবীতে? ভূত প্রেত বলে কিছু নেই।

ঃ বাতি জ্বালিয়ে রাখ বাবা।

বাবা বাতি জ্বালিয়ে দিতেন।

ঃ বাথরুম করব।

তিনি তাকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে যেতেন।

শারমিনের প্রায়ই মনে হয়, পৃথিবীর কোন বাবা বোধ হয় তার বাবার মত নয়। কোন বাবা তাঁর মেয়েকে এতটা ভালবাসেন না। সেই কবে শারমিনের মা মারা গেলেন। বাবা তখন যুবক মানুষ, সাতাশ আঠাশ বছর বয়স। কিন্তু মেয়ের কষ্ট হবে এই ভেবে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন না।

তাঁর অর্থ বিত্ত কোন কিছুর অভাব ছিল না। ইচ্ছা করলেই তিনি মেয়ের দেখাশোনার জন্যে কয়েক ডজন কাজের লোক রাখতে পারতেন। তাও তিনি করেননি। মেয়ের প্রতিটি প্রয়োজন নিজে মেটাতে চেষ্টা করেছেন।

রোজ নিজে তাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন। ক্লাস শেষ হলে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেন। মেট্রিক ক্লাস পর্যন্ত সন্ধ্যার পর পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন। মায়ের ভালবাসার অভাব তিনি একা মেটাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু অভাব আছে যা কিছুতেই বোধ হয় মেটে না। চাপা পড়ে থাকে শুধু।

ঃ আফামনি, আপনের টেলিফোন।

ঃ কে করেছে?

ঃ বড় সার।

শারমিন উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

ঃ কি করছিলে মা মণি?

ঃ কিছু না। কুলগাছের নীচে বসে রোদ পোহাচ্ছিলাম।

ঃ বন্ধু-বান্ধব কাউকে আসতে বলেছ?

ঃ না বাবা। আমরা দু'জনেই জন্মদিন করব। তুমি কখন আসবে?

ঃ সাতটার মধ্যে এসে পড়ব। খুব বেশী দেরী হলে সাড়ে সাত।

ঃ না, এত দেরী করলে চলবে না। তোমাকে আসতে হবে ছ'টার মধ্যে। পজিটিভলি।

ঃ আজ রাতে কি আমরা বাইরে খাচ্ছি?

ঃ না, ঘরেই খাবে। আমি রান্না করব বাবা।

ঃ চমৎকার! কি রান্না হচ্ছে?

ঃ তা বলব না। একটা সারপ্রাইজ আছে।

ঃ খাওয়া যাবে তো মা?

ঃ যাবে। যাবে না কেন?

রহমান সাহেব হাসতে লাগলেন। শারমিন বলল, তুমি কিন্তু ছ'টার মধ্যে আসবে।

ঃ হ্যাঁ আসব। আর শোন মা, আমেরিকায় একটি কল বুক করে সাব্বিরের সঙ্গে কথা বল।

শারমিন লজ্জিত স্বরে বলল, কেন?

ঃ জন্মদিন উপলক্ষ্যে কথা বলা।

ঃ সে তো উনি আমাকে করবেন। আমি কেন করব?

ঃ তাও তো ঠিক।

ঃ তুমি আসছ তো বাবা সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি কিন্তু পাঁচটার সময় আবার তোমাকে টেলিফোন করব। মনে করিয়ে দেবার জন্যে।

ঃ ঠিক আছে মনে করিয়ে দিও।

শারমিন টেলিফোন রেখে দিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় একটা কল বুক করল। সেখানে এখন বাজে রাত বারটা। সাব্বিরকে পাওয়া যাবার কথা। শারমিন একবার ভাবল নিজের পরিচয় না দিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললে কেমন হয়?

হ্যালো, কে?

গলা শুনে বুঝতে পারছেন না কে?

ও শারমিন, কি ব্যাপার?

কোন ব্যাপার নেই। আপনার গলা এমন লাগছে কেন?

কেমন লাগছে?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা। মনে হচ্ছে কোন কারণে খুব কান্নাকাটি করেছেন।

কি যে পাগলের মত কথা বল।

শারমিন খিল খিল করে হাসল। হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আপনাকে লিখেছিলাম কয়েকটা সায়েন্স ফিকশন পাঠাতে। আপনি পাঠিয়েছেন ভূতের উপন্যাস।

ঃ স্টিফান কিং পাঠিয়েছি। খুব ভাল লেখা।

ঃ ভূতের গল্প পড়ে শেষে রাতে ভয়ে মরি আর কি! আপনি সায়েন্স ফিকশন পাঠাবেন। এসিমভের নতুন কোন বই।

ঃ ঠিক আছে। আর শোন, তোমাকে যে একটা জিনিস পাঠাতে বলেছিলাম সেটা তো পাঠালে না।

শারমিন লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

ঃ ঐসব পাঠানো যাবে না।

ঃ যাবে না বললে হবে না। পাঠাবে।

শারমিন কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন।

ঃ তাই নাকি? মাই গড, আমার মনেই ছিল না।

ঃ তা থাকবে কেন? আচ্ছা রেখে দিচ্ছি।

ঃ না, রাখবে না। অনেক কথা আছে।

শারমিন হাসল।

শাহানার স্যার এসেছেন। শাহানা অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছে। ভাবীর এসে কাছেই কোথাও বসবার কথা। কিন্তু ভাবী আসছে না। স্যার ভারী গলায় বললেন, এত ছটফট করছ কেন, কি হয়েছে?

ঃ কিছু হয় নাই স্যার।

ঃ তাহলে মন দিয়ে শোন কি বলছি। এ কিউব প্লাস বি কিউব....

ঃ স্যার, আমি একটু আসছি।

শাহানা উঠে রান্নাঘরে গেল। নীলু ভাত চড়িয়েছে। সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগেই ভাত হয়ে যায়, আজ দেরী হচ্ছে। বাসাবো থেকে নীলুর এক খালা শাশুড়ী এসেছিলেন। মাত্র কিছুক্ষণ আগে গেলেন।

ঃ ভাবী!

ঃ কি ব্যাপার?

ঃ একটু এসে বস না ভাবী। স্যার এসেছেন।

ঃ ভাত চড়িয়েছি শাহানা, বাবাকে বল।

ঃ বাবা রশিদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন। স্যার কে বলে [illegible] আজ পড়ব না?

ঃ ঠিক আছে। তোমার যদি পড়তে ইচ্ছা না করে বলে দাও।

শাহানা দাঁড়িয়ে রইল।

ঃ কি, আর কিছু বলবে?
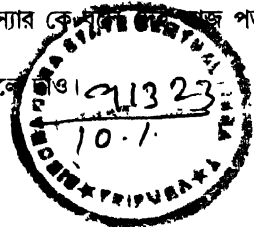
ঃ তুমি এসে বলে দাও না ভাবী।

ঃ আমি কেন?

শাহানা ইতস্ততঃ করে বলল, বলে দাও আমি আর তাঁর কাছে পড়ব না। আজও সে রকম হয়েছে ভাবী।

ঃ ভুলে হয়। সামান্য জিনিসটাকে এত বড় করে দেখছ কেন?

শাহানা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ভুলে না ভাবী।

ঃ ঠিক আছে। চল বলব উনাকে।

ঃ আমি যাব না। তুমি একা গিয়ে বলবে।

'আর পড়াতে হবে না' শুনে মাষ্টার সাহেব কিছু বললেন না। নীলুর ধারণা ছিল জিজ্ঞেস করবেন—কেন? কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

ঃ আপনার পাওনা টাকা আপনি সামনের মাসের তিন তারিখে এসে নিয়ে যাবেন।

মাষ্টার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ঃ বসুন চা খেয়ে যান।

মাষ্টার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বসলেন। শাহানা নিজেই চা এনে দিল। চায়ের সঙ্গে দেবার মত কিছু ছিল না। শুধু চা দিতে শাহানার লজ্জা লাগছিল। মাষ্টার সাহেব খুব আগ্রহ করে চা খেলেন। মৃদু স্বরে বললেন, যাই শাহানা, মন দিয়ে পড়বে।

শাহানার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন একজন ভাল টিচার কিন্তু কি বাজে একটা স্বভাব। নিশ্চয়ই আরো অনেক জায়গা থেকে তাঁকে এভাবে বিদায় নিতে হয়েছে।

শাহানার আজ আর বই নিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে ভাবীর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু এখন সেখানে মা আছেন।

রান্নাঘরে গেলেই মাষ্টার চলে গেল কেন সেই প্রশ্ন উঠবে। শাহানার ঠিক এই মুহূর্তে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা করছে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল মা চড়া গলায় চেঁচাচ্ছেন—

ঃ মনটা কত ছোট দেখ বৌমা। বাবুর মুখ দেখে দশটা টাকা দিয়ে গেল। তাও ময়লা একটা নোট। হাতে নিলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়।

ঃ বাদ দেন মা।

ঃ কেন, বাদ দিব কেন? তার নাতনীর মুখ দেখে দেড়শ টাকা খরচ করে আঙটি দিয়েছি। তার ছোট মেয়ের বিয়ের সময় তিনশ টাকা খরচ করে জামদানী দিয়েছি। আমার টাকা কি গাছে ফলে?

ঃ সবাই টাকা খরচ করতে পারে না মা।

ঃ বাজে কথা বলবে না। খরচ ঠিকই করতে পারে। নিজের বেলায় পারে। পঁচিশ বছর ধরে দেখছি তো। নাড়িনক্ষত্র জানি। যাও বৌমা, ঐ দশ টাকাটা তুমি রাস্তায় ফেলে দিয়ে আস, আমার আলমারীর উপর আছে।

ঃ বাদ দেন মা।

ঃ তোমাকে ফেলতে বলেছি ফেলে দিয়ে আস। ঐ দশটাকা নিয়ে আমি স্বর্গে যাব না।

নীলু বেরিয়ে আসতেই শাহানা ফিস ফিস করে বলল, আমাকে দিয়ে দিও ভাবী।

ঃ এস নিয়ে যাও। আর একটু বাবুর কাছে গিয়ে বস, এক্ষুনি দুধ খাবার জন্যে কাঁদবে।

বাবুর পাশে সফিক বসে ছিল। গভীর মনোযোগে সে ফাইল দেখছে। আজ সারাটা দিন তার নষ্ট হয়েছে। হিসাবে কোথাও জট পাকিয়ে গেছে। হিসাবপত্র দেখার দায়িত্ব মণীন্দ্র নাথের। সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

ঃ ভাইয়া, আসব ভেতরে?

ঃ আয়।

ঃ কি করছ?

ঃ একটা ফাইল দেখছি।

ঃ বসি একটু?

সফিক অবাক হয়ে বলল—বোস্। জিজ্ঞেস করছিস কেন?

ঃ তোমাকে কেমন জানি ভয়-ভয় লাগে ভাইয়া। সারাক্ষণ এমন গম্ভীর হয়ে থাক।

সফিক হাসল।

ঃ অফিসে সবাই নিশ্চয়ই তোমাকে ভয় পায়। পায় না?

ঃ পায় বোধ হয়। জানি না।

ঃ তুমি মাষ্টার হলে ছাত্রদের অবস্থা কাহিল হয়ে যেত ভাইয়া।

সফিক ফাইলে মন দিল। হিসাবের জটটা না খুললে কিছুতেই আর মন বসবে না। মণীন্দ্র মহাঝামেলা লাগিয়ে রেখে গেছে।

ঃ ভাইয়া, একটা কথা শোন।

ঃ পরে শুনব। কাজটা শেষ করে নেই।

কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকা মুশকিল। শাহানা উসখুস করতে লাগল।

ঃ কাজ শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে ভাইয়া?

সফিক জবাব দিল না। শাহানা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

রান্না শেষ হতে রাত নটা বাজল। নীলু এসে বলল, শাহানা, চট করে যাও তো, আনিসকে বলে আস খাবার দেয়া হয়েছে।

শাহানা অবাক হয়ে তাকাল।

ঃ আমি আজ রাতে ওকে খেতে বলেছি।

ঃ কেন ভাবী?

ঃ এম্নি বলেছি। খেতে বলার জন্যে আবার বিরাট কোন কারণ লাগবে নাকি? যাও বলে আস।

ঃ সিঁড়ি দিয়ে একা একা উঠতে ভয় লাগবে ভাবী। তুমি দরজা খুলে একটু দাঁড়িয়ে থাক।

আনিস চিলকোঠার ঘরে থাকে। খাওয়া দাওয়া করে বাড়িওয়ালা রশিদ সাহেবের বাসায়। রশিদ সাহবের সঙ্গে তার ক্ষীণ একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক মোটেই জোরালো নয়। এক সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন। চেষ্টাচরিত্র করে সিটি কলেজে ভর্তিও করিয়েছেন। গত বৎসর আই. এ ফেল করেছে এবং পড়াশোনা করবে না বলে

জানিয়েছে। এ রকম একজনকে ঘরে রেখে পোষার কোন মানে হয় না। রশিদ সাহেব এখন প্রাণপণ চেষ্টা করছেন আনিসকে ঝেড়ে ফেলতে। পারছেন না। আনিসের এ জায়গা ছেড়ে নতুন কোথাও যাবার জায়গা নেই। জোর করে তাকে বের করে দেবার মত নিষ্ঠুরতা তিনি দেখাতে পারছেন না।

তাছাড়া ছেলে হিসেবে আনিসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাঁর নেই। অত্যন্ত ভদ্র ছেলে। চেহারা ভাল। আচার-ব্যবহার ভাল। চায়ের দোকানে বসে বিড়ি ফুঁকে না। মেয়েদের দেখে শীষ দেয় না। রশিদ সাহেবের মনে একটা গোপন পরিকল্পনা ছিল, আনিসকে পড়াশোনা করিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিবেন। বীণার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন। মেয়ে জামাই তাঁর কাছেই থাকবে।

রশিদ সাহেবের স্ত্রী সেই পরিকল্পনা একেবারেই পছন্দ করেননি। স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় রেগে অস্থির হয়েছেন। তাঁর মেয়ে কালো নয়, কানা খোঁড়া নয়, তাকে হাভাতে ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে? দশটা পাঁচটা মেয়েও তার না। একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে হবে চাকর শ্রেণীর একটি ছেলের সাথে? দেশে কি ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের অভাব হয়েছে? না তাদের সহায় সম্পদ নেই? ঢাকা শহরে তিনটি বাড়ি, গ্রামের সম্পত্তি সবই তো তাঁর মেয়েই পাবে।

আনিসের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুরু থেকেই খারাপ ছিল। ইদানীং তিনি তাকে সহ্য করতে পারছেন না। কারণটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি লক্ষ্য করেছেন, আনিস খেতে বসলে বীণা এটা সেটা তার পাতে তুলে দিতে চেষ্টা করে।

তিনি একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ওর খাওয়ার সময় তোর থাকার দরকারটা কি? তুই কেন থালাবাটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করিস?

বীণা অবাক হয়ে বলেছে, একটা লোক একা একা বসে খাবে?

ঃ একা একা কোথায়? আকবরের মা আছে। রহিম আছে। তোর যাবার দরকারটা কি?

ঃ অসুবিধা কি?

ঃ অসুবিধা আছে। এতে লাই দেয়া হয়। লাই দিলেই এরা মাথায় উঠবে। খবরদার তুই যাবি না।

বীণা এর পরেও গিয়েছে। তিনি মনের মধ্যে একটা ভয় অনুভব করেছেন। সমবয়সী দু'টি ছেলেমেয়ের ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ হওয়া ঠিক না। বয়স খুব খারাপ জিনিস। একটা বয়সে সবাইকে ভাল লাগে।

আনিস ঘর অন্ধকার করে বসেছিল। শাহানা বাইরে থেকে ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, আনিস ভাই?

ঃ এসো শাহানা।

ঃ ঘর অন্ধকার কেন?

ঃ বাল্‌ব ফিউজ হয়ে গেছে।

ঃ আপনি আসুন, ভাত দেয়া হয়েছে।

ঃ ভেতরে এসো শাহানা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?
ঃ না, আমি ভেতরে আসব না।
ঃ কেন?
শাহানা জবাব দিল না। আনিস বের হতেই শাহানা বলল, দরজা লাগাবেন না?
ঃ অন্ধকারে তালাচাবী খুঁজে পাব না। থাকুক। চোর আমার ঘরে আসবে না। নেবার মত কিছু নেই।
সিঁড়ি অন্ধকার। এর মধ্যে কে আবার পানি ফেলে রেখেছে। শাহানা খুব সাবধানে পা ফেলছে। একবার পিছলে পড়ার মত হল। আনিস বলল, আমার হাত ধর শাহানা। পিছলে পড়ে হাত ভাঙ্গবে।
শাহানা কঠিন স্বরে বলল, হাত ধরতে হবে না। আমি ভালই দেখতে পাচ্ছি।
আনিস হাসল। অন্ধকারে তার হাসি দেখা গেল না।
আনিসকে খেতে বলা হয়েছে শুনে মনোয়ারা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। হুট করে কাউকে খেতে বলার অর্থটা কি? কোন উপলক্ষ-টুপলক্ষ থাকলেও একটা কথা। হঠাৎ তার মর্জি হল ওম্নি খেতে বলা হল। দুপুর রাতে শাহানাকে পাঠানো হল ডেকে আনতে।
নীলুর এটা আজ নতুন না। আগেও বেশ কয়েকবার আনিসকে খেতে বলেছে। প্রথমবার তিনি নীলুকে তেমন কিছু বলেননি। শুধু শুকনো গলায় বলেছেন, কাউকে দাওয়াত-টাওয়াত করতে হলে আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। বুঝলে বৌমা?
নীলু বলেছে, দাওয়াত না তো। ঘরে যা রান্না হয়েছে তাই খাবে।
ঃ সেটাও আমাকে জানিও।
নীলু কোন উত্তর দেয়নি কিন্তু আবার খেতে বলেছে এবং তাঁকে কিছুই বলেনি। শাশুড়ীর কথার অবাধ্য হবার মেয়ে নীলু না, কিন্তু এই একটি ব্যাপারে সে মনে হয় ইচ্ছা করেই অবাধ্য হচ্ছে। মনোয়ারার মনে হল এটা নীলুর একটা ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা। জানিয়ে দেয় যে, সেও এই সংসারের কর্ত্রী, তারও অধিকার আছে।
মনোয়ারা গম্ভীর মুখে সফিকের ঘরে ঢুললেন। সফিক চোখ তুলে তাকাল কিছু বলল না।
ঃ কি করছিস?
ঃ কিছু করছি না।
ঃ ভাত খেতে দেয়া হয়েছে। খেতে যা।
সফিক উঠে দাঁড়াল। মনোয়ারা শীতল গলায় বললেন, বৌমা দেখলাম আনিস ছোঁড়াটাকে খেতে বলেছে। তুই বৌমাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর তো কেন বলেছে?
ঃ এম্নি বলেছে। জিজ্ঞেস করবার দরকার কি?
মনোয়ারা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। সফিক বলল, ব্যাপারটা কি?
ঃ ব্যাপার কিছু না।
ঃ কিছু না তো তুমি এমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন?
মনোয়ারা তার জবাব দিলেন না। চলে গেলেন রান্নাঘরে। নীলু ব্যস্ত হয়ে বাটিতে তরকারী ঢালছে। আয়োজন খুবই সামান্য। ছোট মাছের তরকারী, একটা সব্জি ও ডাল। তরকারী মনে হয় কম পড়ে যাবে। হোসেন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, ছোট মাছের

তরকারীটা বড় ভাল হয়েছে। আরো নিয়ে আস। নতুন টমেটো দিয়ে রাঁধলে যে কোন জিনিস ভাল হয়।

নীলু পড়েছে মুশকিলে। তরকারী কিছুই নেই। মনোয়ারাকে ঢুকতে দেখে বলল, আপনিও ওদের সঙ্গে বসে পড়ুন না মা।

ঃ না, আমি আজ আর খাব না।

ঃ কেন?

ঃ শরীর ভাল লাগছে না, এই জন্যে খাব না। তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি?

নীলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কোন কারণে তার শাশুড়ী রেগে আছেন। সে কারণটা ধরতে পারছে না।

ঃ তরকারী তো সবটাই ঢেলে ফেললে। রফিক খাবে কি?

ঃ ওকে একটা ডিম ভেজে দেব মা। ছোটমাছ সে এম্নিতেই পছন্দ করে না।

ঃ করুক আর না করুক একটা জিনিস রান্না হয়েছে সেটা তাকে দিবে না? সে তো আর কাজের লোক না। এই বাড়িরই ছেলে। না তুমি সেটা মনে কর না?

নীলু বড় লজ্জায় পড়ে গেল। মা'র গলা যে ভাবে উঁচুতে উঠছে তাতে মনে হয় খাবার ঘর থেকে সবই শোনা যাচ্ছে।

ঃ হাগারের-পাগারের লোকজন ধরে ধরে আনলে খাবার তো কম পড়বেই। এটা তো আর হোটেল না।

নীলু কি বলবে ভেবে পেল না। এখন কিছু বলা মানেই তাঁকে আরো রাগিয়ে দেয়া।

ঃ শোন বৌমা, তোমাকে আরেকটা কথা বলি, শাহানা এখন বড় হয়েছে। কাউকে ডেকে আনার জন্যে রাতদুপুরে তাকে ছাদে পাঠানো যায় না। বুঝতে পারছ?

ঃ পারছি।

নীলুর চোখে পানি এসে গেল। মনোয়ারা তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। চোখের পানি তাঁকে বিন্দুমাত্রও নরম করতে পারল না। হোসেন সাহেব দরজায় এসে উঁকি দিলেন।

ঃ কই বৌমা, তরকারীর কথা বলছিলাম।

ঃ আনছি বাবা।

মনোয়ারা না খেয়েই ঘুমুতে গেলেন। খাওয়া নিয়ে তাঁকে পীড়াপিড়ির সাহস নীলুর হল না। সে নিজেও না খেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বসে রইল রফিকের জন্যে। ইদানীং রফিক ফিরতে রোজ এগারোটা বারটা বাজাচ্ছে। নীলুকে বলা আছে খাবার ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু তাতে লাভ নেই—উঠে এসে দরজা তো খুলতেই হবে।

এখন সাড়ে বারটা বাজে। আজ বোধ হয় আর আসবে না। নীলু ঘুমুতে গেল। বাবু কেমন দু'হাত উপরে তুলে ঘুমাচ্ছে। কম্বল সরে গেছে গা থেকে। টুকটুকে ফর্সা পা বের হয়ে আছে। ফ্লানেলের পায়জামা বানাতে হবে। যাতে কম্বল সরে গেলেও ঠাণ্ডা না লাগে।

ঃ নীলু, তোমার একটা চিঠি আছে। দিতে মনে ছিল না। দেখ টেবিলের উপর।

নীলু অবাক হয়ে বলল, তুমি জেগে ছিলে নাকি?

ঃ হুঁ।

ঃ বাবুর গা থেকে কম্বল সরে গেছে তুলে দাওনি কেন?

সফিক কিছু বলল না। নীলু চিঠি নিয়ে আবার বসার ঘরে চলে এল। চিঠি মা'র কাছ থেকে এসেছে। কাজেই এই চিঠি পড়তে পড়তে অনেকবার চোখ ভিজে উঠবে। আড়ালে পড়াই ভাল। মা তার সব চিঠিই সফিকের ঠিকানায় পাঠান। হয়ত ভাবেন এ ভাবে পাঠালে অন্য কেউ পড়বে না।

আমার মামনি,

মাগো, তোমার সোনামনিকে এখনও দেখিতে আসিতে পারিলাম না। যতবার মন হয় ততবার কষ্ট পাই। কি করিব মা, হাতপা বাঁধা। বজলুর হাতে টাকা নাই। আসা যাওয়ার খরচ আছে। এই দিকে বৌমাও অসুস্থ। ঘরে কাজের লোক নাই। সব কিছু আমাকেই দেখাশোনা করিতে হয়।

লক্ষ্মী মা আমার, রাগ করিও না। ফেব্রুয়ারী মাসে যে ভাবেই হউক আসিব। আর মা শোন, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী যে নাম রাখিতে বলেন সেই নামই রাখিও। তাঁদের অখুশী করিয়া কোন কাজ করিও না।

এই দিককার খবর ভালই। বিলু বেড়াইতে আসিয়াছিল। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া বৌমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হইয়াছে। দোষ বৌমার। মেয়েটা কয়েকদিন ভাইয়ের বাসায় থাকিতে চাহিয়াছিল। রাগারাগির জন্যে পারে নাই। তুমি তাকে চিঠিপত্র দাও না কেন মা? মেয়েটা বড় দুঃখী। তাকে নিয়মিত চিঠি দিও।

বড় জামাইয়ের স্বভাবচরিত্র আগের মতই আছে। বিলুর সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। বুঝিতে পারি না আল্লাহ্ পাক কেন আমার জন্যেই সমস্ত দুঃখ কষ্ট জমা করিয়া রাখিয়াছেন।

যাই হোক মা তুমি এইসব নিয়া চিন্তা করিও না। জামাইয়ের যত্ন নিও। তোমার সোনার সংসারের কথা যখন ভাবি তখন মনে বড় শান্তি পাই। তুমি বড় ভাগ্যবান মা। আল্লাহ্‌র কাছে সবুর স্বীকার করিও। না হইলে আল্লাহ্ পাক নারাজ হইবেন।

সুদীর্ঘ চিঠি। নীলু চিঠি শেষ করে দীর্ঘ সময় একা একা বসে রইল। মাকে কিছু টাকা পাঠাতে পারলে হত। এই মাসে সম্ভব হবে না। সফিকের হাতে কোন টাকাপয়সা নেই।

সংসারের খরচ বেড়েছে। আয় বাড়েনি। ক্রমে ক্রমেই সফিকের উপর চাপ বাড়ছে। এই চাপ আরো বাড়বে। সামনের দিনগুলি কেমন হবে কে জানে। গত মাসে সে নীলুকে হাতখরচের টাকা দেয়নি। লজ্জিত মুখে বলেছে, এই মাসে দিতে পারলাম না নীলু। এদিকে রফিক বলে রেখেছে—যে ভাবেই হোক দু'শ টাকা দিতে হবে ভাবী। নয়ত একেবারে বেইজ্জত হব।

প্রতি বৎসর শীতের সময় দেশের বাড়ী থেকে কিছু চাল আসে, এবার তাও আসেনি। কেন আসেনি কে জানে।

বাবু উঠে পড়েছে। প্রচণ্ড জোর তার গলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সবাইকে জাগিয়ে তুলবে। নীলু নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল। মনোয়ারার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাচ্ছেন, কি হয়েছে? ও বৌমা, কি হয়েছে?

রফিকের মনে ক্ষীণ আশা ছিল শারমিনের আচার আচরণে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করবে। বড় ধরনের কিছু না হলেও চোখে পড়বার মত। পরিচিত ভঙ্গিতে একটু হাসবে কিংবা করিডোরে দেখা হয়ে গেলে বলবে—কি, কেমন আছেন?

অথচ শারমিন আগে যেমন ছিল এখনো তেমন। গম্ভীর হয়ে ক্লাসে আসে। লেকচার শেষ হওয়া মাত্রই বিদায়। রফিকের আশা ছিল ডিপার্টমেন্টাল পিকনিকে সে যাবে। তখন এক ফাঁকে কিছু কথাবার্তা বলা যাবে। কি ধরনের কথাবার্তা বলবে তাও সে ভেবে রেখেছে। যেমন--

ঃ জন্মদিন কেমন হল?

ঃ ভালই। কবিতার বইটির জন্যে ধন্যবাদ। আমি ভাবতেই পারিনি আপনি আমার জন্মদিন কবে সেটা জানেন।

ঃ অনেক ঝামেলা করে বের করেছি, গরজটা যখন আমার।

ঃ আপনার গরজ! তার মানে?

ঃ মানে কিছু নেই।

ভেবে রাখা কথা কিছুই বলা হয়নি। শারমিন যায়নি পিকনিকে অথচ একশ টাকা চাঁদা দিয়েছে। চাঁদা দিয়ে না যাওয়া হচ্ছে একটা বড়লোকি দেখানো। রাগে গা জ্বলে গেছে রফিকের। পিকনিকের সমস্ত আয়োজনটা তার করা। টাকাটা ফেরত দিয়ে অপমান করে দু'একটা কড়া কড়া কথা বলা যায়। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলা যেতে পারে, "আপনার টাকা আছে জানি। কিন্তু টাকার খেলাটা এভাবে না দেখালেও পারতেন। টাকার খেলা আর যাকে দেখান, দেখান। আমাদেরকে দেখাবেন না।"

রফিক ভেবে পেল না, কথাটা ইউনিভার্সিটিতে বললে ভাল হবে না বাড়িতে গিয়ে বলবে। অনেক ভেবেচিন্তে সে বাড়িতে যাওয়াই ঠিক করল। অকারণে তো যাচ্ছে না, একটা কাজে যাচ্ছে। ইতস্ততঃ বোধ করার কিছুই নেই।

কিন্তু রফিক ইতস্ততঃ করতে লাগল। গেটের কাছে এসেও মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ফিরে যাওয়াই ভাল। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। এতদূর এসে ফিরে যাবার মানে হয় না।

ঃ রহমান সাহেবের মেয়ে বাসায় আছে?

ঃ জ্বি আছেন। যান কুকুর কিছু করবে না আপনি সোজা চ'লে যান, কলিং বেল টিপ দেন।

দারোয়ান তাকে চিনতে পারছে না। আর চেহারা কি এতই সাধারণ যে মাত্র দু'সপ্তাহ আগে দেখাও গুবলেট করে ফেলেছে। দারোয়ান একা নয়, কুকুরটা পর্যন্ত তাকে চিনতে পারছে না অথচ নিম্নশ্রেণীর পশুদের নাকি স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। একবার কোন একটি

জিনিসের ঘ্রাণ নিলে একটা কুকুর নাকি সারাজীবন সেটা মনে রাখে। এই কুকুরটার সেদিন সর্দি ছিল বোধ হয়। সেদিন যেমন শুঁকতে শুঁকতে আসছিল, আজও তাই আসছে।

গতবার বেল টিপতেই দরজা খুলে দিয়েছিল শারমিন। আজও তাই হবে নাকি?

না, সেরকম হল না। বয়স্কা একজন মহিলা দরজা খুলল। কাজের মেয়ে না আত্মীয়স্বজনদের কেউ? আত্মীয়স্বজনদের কেউ হলে সালাম দেয়া দরকার। রফিক নরম স্বরে বলল, শারমিন আছে?

ঃ জ্বি আছে।

ঃ একটু বলেন, রফিক এসেছে।

ঃ বসেন। খবর দেই।

রফিক এন্ট্রিরুমে বসে রইল। তার মনে হতে লাগল—যেসব কড়া কথা সে ভেবে রেখেছে সে সব বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কারো বাড়িতে এসে অভদ্র হওয়া যায় না। তাছাড়া পিকনিকে না যাবার তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। অসুখবিসুখ হতে পারে। জরুরী কাজকর্ম থাকতে পারে, না জেনে হাউ হাউ করা ঠিক না। রফিক বেশ অনেকক্ষণ বসে রইল।

যে মহিলাটি বসতে বলেছে সে এল না, অল্পবয়েসী একটি মেয়ে এসে বলল, আপামনি বাসায় নাই।

ঃ তার মানে?

রফিকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। মেয়েটি দ্বিতীয়বার বলল, আপামনি বাসায় নাই। রফিক উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু কিছুই মনে আসছে না।

ঃ তোমার আপাকে বলবে মিথ্যা কথা বলবার কোন দরকার ছিল না। দেখা করবে না বললেই চলে যেতাম।

রফিকের ইচ্ছা করছে ছুটে পালিয়ে যেতে কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাকে হেঁটে হেঁটে গেট পর্যন্ত যেতে হবে। এই বিশাল বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে বেরুতেও সময় লাগবে।

ঃ রফিক, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

ঃ না।

ঃ সারাদিন শুয়ে আছ, ব্যাপার কি?

ঃ ব্যাপার কিছু না।

ঃ আমার তো মনে হয় তোমার জ্বর-টর কিছু হয়েছে। চোখ লাল।

ঃ তোমার মনে হলেই তো হবে না ভাবী। আমারো মনে হতে হবে। আমার মনে হচ্ছে শরীর ঠিকই আছে।

ঃ তুমি উঠে আস, তোমাকে ডাকছেন।

ঃ কে ডাকছেন?

ঃ কবির মামা। ঘণ্টাখানিক আগে এসেছেন। কি, আসবে না?

ঃ কবির মামা তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না। আসছেন যখন ইনশাআল্লাহ্ মাসখানিক থাকবেন। ধীরে সুস্থে আসছি।

রফিক তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

কবির মামার বয়স প্রায় ষাট। ছোটখাট মানুষ। থুতনিতে অল্প কিছু দাড়ি আছে। মাথার চুল দাড়ি সমস্তটাই ধবধবে সাদা। স্বাস্থ্য বয়সের তুলনায় অনেক ভাল। এবং যতটা না ভাল তিনি নিজে মনে করেন তার চেয়েও ভাল, যার জন্যে মাঝে মাঝে গুরুতর ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

আজও এ রকম একটা ঝামেলা বাধিয়েছেন। ছ'টা ঝুনা নারিকেল নিয়ে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে কল্যাণপুর পায়ে হেঁটে চলে এসেছেন। এরকম একটা কাণ্ড করার পেছনে একমাত্র যুক্তি হচ্ছে কোন বাস কনডাকটার নারিকেল হাতে বাসে উঠতে দিতে রাজি হয়নি। একজন রাজি হয়েছিল কিন্তু সে নারিকেলের জন্য আলাদা ভাড়া দাবী করায় কবির মামা রেগে আগুন হয়ে যান এবং হাঁটতে শুরু করেন। কল্যাণপুর এসে পৌঁছতে তাঁর পৌনে চার ঘণ্টা সময় লাগে।

বাসায় ঢুকেই তিনি সোফায় লম্বা হয়ে পড়েছেন। উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। কোমরের একটা পুরানো ব্যথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

মনোয়ারা বললেন, পিঠে তেল মালিশ করে দিবে?

ঃ দিক। বৌমাকে বল তেল গরম করতে। হোসেন কোথায়?

ঃ পেনসনের টাকা তুলতে গেছে। এসে পড়বে।

ঃ আসুক। তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

ঃ চা করে দিক?

ঃ চা না। লেবু দিয়ে এক গ্লাস সরবত করে আনতে বল।

নীলু পিঠে তেল মালিশ করতে বসল। কবির মামা ক্ষীণ স্বরে বললেন, মানুষের সেবা আমি নেই না। লজ্জা লাগে। কিন্তু মা, তোমার সেবা নিতে লজ্জা লাগে না। মনে হয় এই সেবাটাতে আমার অধিকার আছে।

ঃ অধিকার তো আছেই।

ঃ নাগো মা, অধিকার নাই। দুই মাস আগে তোমার একটা মেয়ে ল। আমাকে কেউ একটা খবর দেয় নাই। এখানে এসে জানলাম মেয়ে হবার খবর।

নীলু খুব লজ্জা পেল। মনোয়ারা সরে গেলেন।

কবির মামা গম্ভীর গলায় বললেন, বুঝলে বৌমা, সত্যিকার আত্মীয়তা সম্পর্ক নাই তো, সে জন্যেই এই অবস্থা। যখন উপস্থিত হই তখন আমার কথা মনে হয়। সফিকের বিয়ের কার্ড পাই বিয়ের এক সপ্তাহ পর।

নীলু চুপ করে রইল।

ঃ বিয়ের পর হঠাৎ মনে পড়েছে, আরে কবির মামাকে তো বলা হয় নাই। তখন একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে।

নীলু দৃঢ়স্বরে বলল, আর এ রকম ভুল হবে না মামা।

ঃ না হওয়াই উচিত। ভালবাসার জবাব ভালবাসা দিয়েই দিতে হয়। রফিক আসছে না কেন? এই রফিক, রফিক!

রফিক উঁকি দিল।

ঃ আছ কেমন মামা?

ঃ ভালই আছি।

ঃ কোমর ভেঙ্গে ফেলেছ নাকি?

কবির মামা জবাব দিলেন না।

ঃ দেখি পা'টা দাও। সালাম করি, নয়ত পরে ক্যাট ক্যাট করবে।

ঃ তোর অসুখ-বিসুখ নাকি?

ঃ না।

ঃ এরকম গম্ভীর হয়ে আছিস কেন? মনে হয় বিরক্ত!

ঃ বিরক্ত না হয়ে উপায় আছে? তুমি এসেছ, ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে। সোফায় আমি ঘুমাতে পারি না।

ঃ আয়েসী হয়ে গেছিস মনে হয়। পরীক্ষা কবে?

ঃ এপ্রিল মাসে।

ঃ প্রিপারেশন কেমন?

ঃ সেকেণ্ড ক্লাস টাইপ। আমি তো মামা লাইফ লং সেকেণ্ড ক্লাস ছাত্র। পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাইলে কর।

ঃ পড়াশোনার আলাপ করতে ভাল লাগে না?

ঃ না।

ঃ যা আমার সামনে থেকে।

রফিক খুশী মনেই বের হয়ে গেল। কবির মামা বহু কষ্টে উঠে বসলেন। ব্যথা অনেকখানি কমেছে। এখন আর একে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। এসব জিনিস প্রশ্রয় দিলেই বাড়ে।

ঃ এবার তোমার কন্যাকে নিয়ে এসো গো মা।

নীলু তার মেয়েকে নিয়ে এল।

ঃ চশমাটা দাও। চশমা ছাড়া ভাল দেখি না।

বাবুকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বার বার বলতে লাগলেন, তোমার এই মেয়ে শাহানার মত রূপসী হবে। বড় সুন্দর। গোলাপ ফুলের মত লাগছে।

ঃ আপনি মামা দোয়া করবেন।

ঃ এই যুগে মা দোয়াতে কাজ হয় না। কোন যুগেই হয় না। কাজ হয় কর্মে। কর্ম ঠিক রাখবে। তাহলেই হবে। নাম কি রেখেছ মেয়ের?

ঃ এখনো রাখা হয় নাই। বাবা রেখেছেন টুনী।

ঃ টুনীফুনী আবার কিরকম নাম?

ঃ আপনি একটা নাম রাখেন মামা।

ঃ আমার নাম কি আর পছন্দ হবে?

ঃ পছন্দ হবে। আপনি রাখেন।

কবির মামা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, তোজল্লী। তোজল্লী রাখ। এর মানে হচ্ছে আল্লাহর জ্যোতি।

নীলুর মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক তোজল্লী ধরনের নাম সে আশা করেনি।

ঃ নাম পছন্দ হয়েছে তো মা?

ঃ জি হয়েছে।

ঃ তা হলে তোজল্লিই রাখ।

তিনি ফতুয়ার পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে মেয়ের মুখ দেখলেন। এই একশ টাকাই ছিল তাঁর সঙ্গে।

রাতে কবির মামার জ্বর এসে গেল। বেশ ভাল জ্বর। হোসেন সাহেব বললেন, এক ডোজ আর্নিকা খাবে? ব্যথা সেরে যাবে।

তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন—কয়েকটা জিনিসে আমার বিশ্বাস নাই। হোমিওপ্যাথি তার মধ্যে একটা।

ঃ তা হলে ডাক্তার ডেকে আনুক।

ঃ এই দুপুর রাতে ডাক্তার ডাকতে হবে না। তোমরা ঘুমাতে যাও।

রাতে তিনি কিছু খেলেন না। নীলু এক গ্লাস দুধ নিয়ে গিয়েছিল, তিনি ছুঁয়েও দেখলেন না।

ঃ দুধ শিশুদের খাবার মা, দেশে দুধের অভাব। আমরা বুড়োরাই যদি সব দুধ খেয়ে ফেলি ওরা খাবে কি?

রফিক বিরক্ত হয়ে বলল—তুমি এক গ্লাস দুধ খেলে ওদের কম পড়বে না।

ঃ এক গ্লাস এক গ্লাস করেই লক্ষ গ্লাস হয়। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু বিচার করতে হয়। একটা রাত উপোস দিলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। উপোসের মত বড় ওষুধ কিছু নাই।

কবির মামার ঢাকা আসার উদ্দেশ্য দ্বিতীয় দিনে জানা গেল। তাঁর মাথায় বিরাট একটা পরিকল্পনা এসেছে। তিনি নীলগঞ্জকে সুখী নীলগঞ্জ বানাতে চান। নীলগঞ্জের সব মানুষকে তিনি সুখী দেখতে চান। সেখানে কোন দুঃখ থাকবে না। সবাই দু'বেলা ভাত খাবে। সবটাই তিনি করবেন স্বেচ্ছাশ্রমের বিনিময়ে। তাঁর পুরানো ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। মনোয়ারা বললেন, আপনার তো ভাইজান এখন বিশ্রামের সময়। রিটায়ার করেছেন, এখন বিশ্রাম করবেন।

ঃ শুয়ে থাকলেই বুঝি বিশ্রাম হয়? বিশ্রাম হচ্ছে কাজে। একটা ভাল কাজ করার মধ্যে বিশ্রাম আছে। সফিক কি বলিস?

ঃ সফিক কিছু বলল না।

ঃ হোসেন, তোমার কি মত?

ঃ ভালই তো।

ঃ ভালই তো বলছ কেন? আইডিয়া পছন্দ হচ্ছে না? মরবার আগে যদি এটা করে যেতে পারি তাহলে কাজেব মত কাজ হয়। কিছুই তো করলাম না জীবনে।

ঃ কিছুই করনি কথাটা তো ঠিক বললে না। হাজার হাজার ছাত্র তৈরী করেছ। এটা তো কম না।

ঃ নীলগঞ্জের এই কাজটাও করতে চাই। আমাকে দেখে অন্যরা উৎসাহী হবে। বাংলাদেশে হাজার হাজার নীলগঞ্জ হবে। দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ঠিক কি না বল?

ঃ ঠিক।

ঃ একটা বড় জাবদা খাতা কিনেছি, ছাত্রদের সব নাম ঠিকানা বের করে করে লিখছি। এদের সবার কাছে চিঠি দেব। তারপর দেখা করব। কাজে নেমে পড়তে হবে। কতদিন বাঁচি তার ঠিক নাই কোন।

তিনি সবার সঙ্গেই মহা উৎসাহে নীলগঞ্জ নিয়ে আলাপ করলেন। রফিক শুধু বাদ পড়ল। রফিকের সঙ্গেও তুলতে চেয়েছিলেন, রফিক হাই তুলে বলল— এইসব বোগাস আদর্শবাদী স্বপ্নের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না মামা।

ঃ বোগাস?

ঃ বোগাস তো বটেই। একজন রিটায়ার্ড স্কুলমাষ্টার বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে ফেলবে?

ঃ বাংলাদেশের কথা তো বলছি না। নীলগঞ্জের কথা বলছি।

ঃ তোমাকে দিয়ে এসব হবে না মামা। এই বয়সে খামাখা দৌড়াদৌড়ি করে শরীর নষ্ট করবে। এম্নিতেই কোমর ভেঙ্গে কাত হয়ে আছো।

কবির মামা দু'দিন ঢাকা থাকলেন। ফিরে যাবার ভাড়া ছিল না। সফিকের কাছ থেকে ত্রিশটাকা ধার করলেন।

ধারের টাকা সাত দিনের মধ্যে ফেরত এল। মানি অর্ডারের কুপনে তোজল্লী নামের আরবী বানান, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশদ ভাবে লেখা। সেই সঙ্গে লেখা--আমার পুরনো কোন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা লিখে রাখবে। ভুল হয় না যেন।

সব মানুষের মধ্যেই কিছু রহস্য থাকে।

অমীমাংসিত রহস্য। কবির মামার মধ্যে সেই রহস্যের পরিমাণ কিছু বেশী। তাঁর বাড়ি চব্বিশ পরগণার বারাসতে। বারাসত থেকে এগারো মাইল দূরে বনগ্রামের এক স্কুলে মাষ্টারী করতেন। ভাদ্রমাসের এক ভোরবেলায় হঠাৎ তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল। ক্যাম্বিসের ব্যাগ এবং একটি ছাতা নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। কাউকে কিছু বলে গেলেন না।

পথে বিধু মল্লিকের সঙ্গে দেখা। বিধু মল্লিক বলল, সাতসকালে কোথায় যান? মাষ্টার তার জবাবে ফ্যাকাসে ভাবে হাসলেন। পরিষ্কার কিছু বললেন না। বিধু মল্লিক বলল, হাবড়া যান নাকি?

ঃ হুঁ।

ঃ রেতে ফিরবেন না?

ঃ হুঁ ফিরব।

কিন্তু তিনি ফিরলেন না। সেটা বাংলা তেরশ বাহান্ন সন। ভারতবর্ষের ক্রান্তিকাল। দীর্ঘদিন তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

প্রায় এক যুগ পর ইংরেজী উনিশশো চুয়ান্ন সনে তাঁকে দেখা গেল ময়মনসিংহের নীলগঞ্জে। মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মুখভর্তি দাঁড়িগোফ। অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির মানুষ কিন্তু কাজকর্মে খুব উৎসাহ। ছ'মাসের মধ্যে স্কুলের চেহারা পাল্টে ফেললেন। কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে স্কুল কম্পাউণ্ডের সামনে চমৎকার একটি ফুলের বাগান করলেন। গ্রামের লোকজন বলাবলি করতে লাগল--তেলেসমতি কাণ্ড! করছে কি পাগলা মাষ্টার?

সেবার শীতে ময়মনসিংহ থেকে স্কুল ইন্সপেক্টর জমীর আলি সাহেব স্কুল ইন্সপেকশনে এলেন। বাগান দেখে অবাক হয়ে বললেন, এই বাগান আপনার করা?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ নিজের হাতেই করেছেন?

ঃ ছাত্ররা সাহায্য করেছে। নিজেও করেছি।

জমীর আলি সাহেব ফিরে গিয়ে স্কুলের সরকারী সাহায্য বাড়িয়ে দিলেন। শুধু তাই না, ময়মনসিংহ জেলার সব ক'টি মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টারকে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। যার সারমর্ম হচ্ছে— ছাত্রদের মানসিক বিকাশ সাধনের জন্যে প্রতিটি স্কুলে ফুলের বাগান থাকা বাঞ্ছনীয়। ফুল ছাত্রদের মনোজগতের উন্নতি ও সৌন্দর্যস্পৃহা বৃদ্ধির সহায়ক। ইত্যাদি।

অজ পাড়াগাঁর একটি দরিদ্র দীনহীন স্কুলে রকমারী ফুলের সমারোহ জমীর আলি সাহেবকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। যাব জন্যে তিনি পরের বছরই আবার স্কুল ইন্সপেকশনে এলেন এবং স্তম্ভিত হযে দেখলেন ফুলের কোন চিহ্নই কোথাও নেই। সে জায়গায় নানা ধরনের সবজীর চাষ করা হয়েছে। জমীব আলি থমথমে গলায় বললেন, কি ব্যাপার?

কবির মাষ্টার গম্ভীব গলায় বললেন, দরিদ্র দেশে ফুলের বিলাসিতা ঠিক না। শাক সবজী বিক্রি কবে কিছু পয়সা হয। সেই পযসা ছাত্রদের পিছনে খরচ করা হয়। সবাই এখানে খুব দরিদ্র।

জমীর আলি রাগী গলায় বললেন, দবিদ্রদের সৌন্দর্য বোধ থাকবে না?-

ঃ জ্বি না। আগে পেটে ভাত তাবপর অন্য কিছু। এখানে আমার অনেক ছাত্র আছে, যারা আজ স্কুলে না খেয়ে এসেছে।

জমীর আলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ফুলগাছগুলি আপনি কি নিজের হাতের নষ্ট করেছেন?

ঃ জ্বি, স্যার।

ঃ আপনার কষ্ট হয় নাই?

ঃ জ্বি, না।

ঃ পাগল নাকি আপনি? আমি কত জায়গায় আপনাব ফুলের বাগানেব প্রশংসা করেছি, আর আপনি কিনা সব উপড়ে লাউ-কুমড়া লাগিয়েছেন, আবাব বলছেন কষ্ট হয় নাই। আপনাকে বোঝা মুশকিল। ইউ আব এ ভেবী স্ট্রেঞ্জ ম্যান।

নীলগঞ্জের লোকেরাও বোধ হয তাঁকে বিচিত্র মানুষ হিসাবেই জানে। জীবন প্রায পার কবে দিয়েছেন এখানে। এখানকাব সবাই তাঁকে চেনে, পাগলা মাষ্টার হিসেবে। দেখে একটু অন্য রকম চোখে। শ্রদ্ধা ভালবাসাব সঙ্গে তাদের সেই দৃষ্টিতে কিছু ভয়ও হয়ত থাকে।

গ্রাম্য বড় বড় সালিশিগুলিতে তাঁকে থাকতে হয়। সমস্যাব যখন কোন রকম মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন একজন কেউ বলে--মাষ্টার সাব যা বলেন তাই। কবির মাষ্টারকে তখন কিছু একটা বলতে হয। এবং তাঁব কথাই হয সালিসির শেষ কথা।

তাঁর মীমাংসা যাদের পছন্দ হয় না তারাও চুপ করে থাকে। শুকনো মুখে বলে—আচ্ছা ঠিক আছে, মাষ্টার সাব বলছেন এর উপর আর কথা কি? মাষ্টার সাবের কথার একটা ইজ্জত আছে না?

একজন মানুষের জন্যে এটা হয়ত তেমন বড় কোন সম্মান নয়, আবার হয়ত ঠিক তুচ্ছ করবার মতও কিছু নয়।

ভাটি অঞ্চলের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে নীলগঞ্জের কেউ। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার বিবাদ। স্ত্রীকে ন্নাইয়র যেতে দিচ্ছে না। দু'বছর হয়ে গেল বাপের বাড়ি যেতে পারছে না মেয়েটি। কোন উপায় না দেখে এক সময় সে মাষ্টার সাবের কাছে জড়সড় হয়ে দাঁড়াবে।

মাষ্টার সাহেব বলবেন—কার বাড়ির বউ তুমি? কোন দিন তো দেখি নাই?

বৌটি ক্ষীণ স্বরে বলবে—মিয়া বাড়ির।

ঃ ও, আচ্ছা সোলায়মানের বৌ। বাটিতে করে কি এনেছ গো মা?

ঃ মাছের সালুন।

ঃ ভাল। খুব ভাল। রাতে আরাম করে খাব। রেখে দাও।

বৌটি তরকারীর বাটি রেখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আছে,

রাত্রে যাব একবার তোমাদের বাড়ি। চারটা ডাল ভাত খাব তোমাদের ওখানে।

মাষ্টার সাহেব যান রাতের বেলা। সোলায়মানকে ডেকে প্রচণ্ড একটা ধমক দেন—চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। বাচ্চা মেয়ে আটকে রেখে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছে! কাল ভোরেই যেন নৌকা ঠিক হয়।

নৌকা ঠিক হয় ভোরবেলাতেই। আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে দীর্ঘদিন পর বৌটি রওনা হয় বাপের বাড়ি।

একজন ভিনদেশী মাষ্টারের এই ক্ষমতাও তো তুচ্ছ কবার মত নয়। এ ধরনের ক্ষমতা হঠাৎ করে আসে না। অর্জন করতে হয়। কবির মাষ্টার তা করেছেন।

কেনাকাটা করতে নীলু কখনো একা একা আসে না। তার সঙ্গে থাকে শাহানা কিংবা রফিক। আজ সে এসেছে একা। এবং আমার সারা পথেই মনে হয়েছে গিয়ে দেখবে নিউমার্কেট বন্ধ। সে লক্ষ্য করেছে যেদিনই কোন একটা বিশেষ কিছু কেনাকাটার থাকে, সেদিনই নিউমার্কেট থাকে বন্ধ। হয় সোমবার পড়ে যায়, কিংবা মঙ্গলবার। আজ অবশ্যি বুধবার। কে জানে এখন হয়ত নিউ মার্কেট বুধবারেই বন্ধ থাকে। অনেকদিন এদিকে আসা হয় না।

নিউমার্কেট খোলাই ছিল। দুপুরবেলার দিকে শুধু বয়স্কা মহিলারাই বাজার করতে আসে নাকি? নীলু লক্ষ্য করল তার চারদিকে খালাম্মা শ্রেণীর মহিলা। দরদাম করছে। কেনাকাটা বিশেষ করছে না। সময় কাটাবার জন্যেই আসা বোধ হয়।

একজন চকমকে শাড়ি পরা মহিলা সবকিছুর দাম জানতে জানতে এগুচ্ছে। নীলুর বেশ মজা লাগল। সে তার পেছনে পেছনে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগল। অনেকদিন পর সে ঘর থেকে বের হয়েছে। ভালই লাগছে তার। সে অন্যদের মত দরদাম শুরু করল। একটা ট্রাই সাইকেলের দাম করল।

ঃ কত টাকা?

ঃ তেরশ টাকা।

ঃ এত দাম? বলেন কি?

ঃ বিদেশী জিনিস। আমেরিকান। দেশীটা দেখবেন আপা?

ঃ আচ্ছা দেখান।

দোকানী খুব আগ্রহ নিয়ে দেখাতে লাগল। নীলুর মায়াই লাগল। সে কিছু কিনবে না, শুধু শুধু বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছে। এত টাকা দিয়ে বাবুর জন্যে ট্রাই সাইকেল কেনার প্রশ্নই উঠে না।

ঃ জাপানী সাইকেল দেখবেন আপা? মিডিয়াম দামের মধ্যে পাবেন।

ঃ দেখান দেখি কেমন?

নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। একটা সাইকেল কিনতে পারলে ভালই হত। বলে দেখবে নাকি সফিককে? না, বলাটা ঠিক হবে না। সফিক কিনে দিতে পারবে না। শেষে কষ্ট পাবে। কাউকে কষ্ট দিতে তার ভাল লাগে না।

ঃ এই নীলু না? এখানে কি করছিস?

নীলু তাকিয়ে রইল, মেয়েটিকে চিনতে পারল না।

ঃ এমন করে তাকাচ্ছিস কেন? চিনতে পারছিস না নাকি? চিনতে না পারলে চড় খাবি।

ঃ বন্যা না?

বন্যা এত লোকজনের মধ্যেও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। প্রায় ন'বছর পর দেখা। স্কুল জীবনের তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় দুজনে একবার প্রতিজ্ঞা করেছিল, সারাজীবন তারা বিয়ে করবে না। কোন পুরুষের অধীনে থাকবে না। স্বাধীনভাবে বেঁচে থেকে পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে মেয়েরাও ইচ্ছা করলে একা একা থাকতে পারে। প্রতিজ্ঞা করবার পর কি ভেবে যেন দু'জন খানিকক্ষণ কেঁদেছিল।

বন্যা নীলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, বিয়ে করেছিস, তাই না?

ঃ হুঁ। তুই?

ঃ আমিও করেছি। এখন বল, আমাকে চিনতে পারিসনি কেন?

বন্যা আগের মতোই আছে তবুও কেমন যেন অন্য রকম লাগছে। কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পরিবর্তনটা ধরা যাচ্ছে না। বন্যা বলল—কি, কথা বলছিস না কেন? আমার মধ্যে কোন চেঞ্জ দেখছিস?

ঃ না, তেমন কিছু দেখছি না।

ঃ বলিস কি, ববকাট করেছি। গাদাখানিক চুল কেটে ফেলে দিয়েছি। তোর চোখেই পড়ল না? তোর হয়েছেটা কি বল তো?

তাই তো! পিঠভর্তি চুল ছিল বন্যার। চুলে নজর লাগবে বলে বন্যার মা কি একটা তাবিজও তার গলায় দিয়ে রেখেছিলেন। এই নিয়ে ক্লাসে কত হাসাহাসি।

ঃ চুল কেটে ফেললি কেন?

ঃ হাসবেণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে কেটে ফেলেছি।

ঃ বলিস কি?

ঃ হ্যাঁ। আমার জিনিস আমি কাটব ওর বলার কি?

ঃ তুই এখনো আগের মতই পাগল আছিস।

ঃ আর তুই আছিস আগের মতই বোকা। চল যাই চা খাব।

ঃ কোথায় চা খাবি?

ঃ কোথায় আবার, রেস্টুরেন্টে।

ঃ একা একা চা খাব নাকি আমরা?

বন্যা বিরক্ত মুখে বলল, দু'টা মেয়ে যাচ্ছি আমরা, একা বলছিস কেন? আজ তুই সারা দিন থাকবি আমার সঙ্গে। ম্যাটিনিতে ছবি দেখবি।

নীলু হকচকিয়ে গেল। বন্যা বলল, নাকি স্বামীর অনুমতি ছাড়া মুভি দেখা যাবে না?

ঃ তা না । ঘরে বাচ্চা আছে।

ঃ এর মধ্যে বাচ্চাও বাঁধিয়ে ফেলেছিস? এমন গাধা কেন তুই?

বন্যা তাকে নিয়ে অসংকাচে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পুরুষের ভঙ্গিতে ডাকল— এই বয়, আমাদের দু'কাপ চা দাও।

নীলু মৃদুস্বরে বলল, এত পুরুষদের মধ্যে বসে চা খেতে তোর অস্বস্তি লাগবে না?

ঃ অস্বস্তির কি আছে? ওরা কি আমাদের খেয়ে ফেলবে নাকি?

ঃ কেমন তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

ঃ তাকাক না।

ঃ তুই আগের চেয়ে অনেক স্মার্ট হয়েছিস।

ঃ স্মার্ট হতে হয়েছে। চাকরি করি তো। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়।

ঃ চাকরি করিস?

ঃ করব না! তোর মত ঘরে বসে বছরে বছরে বাচ্চা দেব নাকি?

নীলুর এই কথাটা ভাল লাগল না। বন্যা এমনভাবে বলছে যেন বাচ্চা হওয়াটা একটা অপরাধ। কিন্তু বন্যাকে বড় ভাল লাগছে। আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে।

ঃ কোথায় চাকরি করছিস?

ঃ ইরানীয়ান এম্বেসীতে। রিসিপশনিস্ট।

নীলু একবার ভাবল জিগ্যেস করে বেতন কত কিন্তু জিগ্যেস করল না। বন্যা বলল বেতন কত জিগ্যেস করলি না? নাকি জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগল?

ঃ বেতন কত?

ঃ তিন হাজার টাকা। যাতায়াতের একটা এ্যালাউন্স পাই। মেডিকেল এ্যালাউন্স আছে। সব মিলিয়ে চার হাজার টাকার মত।

ঃ বলিস কি?

ঃ বেতন ভালই। নিজের টাকা খরচ করি। ওর কাছে চাইতে হয় না। আগে ভাইয়ের বাড়িতে যাবার জন্যে পাঁচ টাকা রিক্সা ভাড়া পর্যন্ত চাইতে হত। আর সে দিত এমন ভাবে যেন দয়া করছে, ভিক্ষা দিচ্ছে। এখন সে মাসের শেষে আমার কাছে ধার চায়।

বন্যা আশেপাশের টেবিলের সবাইকে সচকিত করে হেসে উঠল। নীলুর অস্বস্তি লাগতে লাগল। লোকগুলি কি ভাবছে কে জানে। নীলু বলল, আজ তোর অফিস নেই?

ঃ না, আজ ইরানের কি একটা জাতীয় উৎসব। নওরোজ না কি কি যেন বলে। চল যাই সিনেমা দেখি।

ঃ নারে, সিনেমা দেখব না।

ঃ না দেখলে না দেখবি। আমি একাই যাব।

বন্যা উঠে গেল বিল দিতে। নীলু দুঃখিত হয়ে লক্ষ্য করল, বন্যা একবারও জিগ্যেস করল না—তোর ছেলেমেয়ে ক'টি, ওদের নাম কি?

নীলু বলল--বন্যা, তুই একবার আমার বাসায় আসিস। আমার বাবুকে দেখে যাবি।

ঃ যাব। ঠিকানাটা বল, লিখে নিই।

বন্যা ঠিকানাটা লিখে নিল নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে। যেন নেহায়েত লেখার জন্যেই লেখা। বন্যা বলল, তুই এখন কি করবি? বাসায় যাবি?

ঃ একটা জিনিস কিনব, তারপর বাসায় যাব।

ঃ কি জিনিস?

ঃ আগামী কাল ওর জন্মদিন, সেই উপলক্ষে ওর জন্যে কিছু একটা কিনব।

ঃ ও-ও করছিস কেন? নাম ধরে ডাকিস না? তুই এমন গ্রাম্য মেয়েদের মত করছিস কেন? পড়াশুনা করে এই লাভ হল তোর? কোন্ পর্যন্ত পড়েছিস?

ঃ বি.এ. পাশ করেছি। এম. এ ভর্তি হয়েছিলাম. তারপর বিয়ে হয়ে গেল।

ঃ আর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে ঢুকে পড়লি? পড়াশুনা মাথায় উঠল।

নীলু কিছু বলল না। বন্যা বলল—জন্মদিনের জন্যে কিছু কেনার দরকার নেই? ওতে বেশী লাই দেয়া হয়। তাছাড়া উপহারটা তুই তোর হাসবেণ্ডের টাকাতেই কিনছিস, তুই নিজের টাকায় তো দিতে পারছিস না।

ঃ নিজের টাকা পাব কোথায়?

ঃ চাকরি করলেই পাবি।

ঃ চাকরি আমাকে কে দেবে?

ঃ চেষ্টা না করেই বলছিস কে দেবে? চেষ্টা করেছিস কখনো?

নীলু কিছু বলল না। হাঁটতে লাগল বন্যার সঙ্গে সঙ্গে। বন্যা বলল সব অফিসেই এখন মেয়েদের কোটা আছে। চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। ছেলেদের চাকরি পাওয়া সমস্যা, মেয়েদের চাকরি সমস্যা নয়। তুই সত্যি সত্যি চাইলে আমি চেষ্টা করতে পারি। চাস নাকি?

নীলু কিছু বলল না। বন্যা চলে গেল মুভি দেখতে। ঘরে তার এখন ফিরতে ভাল লাগছে না।

নীলু একা একা ঘুরতে লাগল। তার হাতে টাকা আছে মাত্র দু'শ। দু'শ টাকায় পছন্দসই কিছু পাওয়া যায় না। হালকা বাদামী রঙের একটা শার্ট পাওয়া গেল। খুব পছন্দ হল নীলুর কিন্তু দাম চাইল তিনশ টাকা। এর নীচে নাকি এক পয়সাও নামা যাবে না। নীলু মন খারাপ করে শেষ পর্যন্ত একটা লাইটার কিনল একশ পঁচাত্তর টাকায়। শার্টটা কেনা হল না এইজন্যে মনে একটা আফসোস বিঁধে রইল। ওকে শার্টটায় খুব মানাত।

সফিক লাইটার দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। নীলু বলল—পছন্দ না হলে ওরা ফেরত নেবে। পছন্দ হয়নি?

ঃ পছন্দ হয়েছে।

ঃ তাহলে এমন মুখ কালো করে আছ কেন? নাও একটা সিগারেট মুখে নাও, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

সফিক একটা সিগারেট বের করে ম্লান গলায় বলল, টাকাপয়সার এমন টানাটানি, এর মধ্যে এতগুলি টাকা বাজে খরচ করার কোন মানে হয় না।

নীলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। সফিক বলল, এইসব জিনিস খুব হারায়। এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখবে হারিয়ে ফেলেছি। কই ধরিয়ে দাও!

নীলু সিগারেট ধরিয়ে দিল। এবং কিছুক্ষণ পরেই বারান্দায় গিয়ে চোখ মুছে এল। অকারণে অন্যকে চোখের জল দেখানোর কোন মানে হয় না।

বাবু জেগে উঠেছে। কাঁদছে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। নীলু ঘরে ঢুকে বাবুকে কোলে তুলে নিল। ওর গা একটু গরম। কোলে উঠেও কান্না থামছে না। হাত মুঠি করে কেঁদে কেঁদে উঠছে। সফিক বলল, ওকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও, বড় বিরক্ত করছে।

নীলু বসার ঘরে চলে এল। শাহানা পড়ছে বসার ঘরে। সে পড়া বন্ধ করে উঠে এল, আমার কোলে দাও ভাবী। আমি কান্না থামিয়ে দিচ্ছি, এক মিনিট লাগবে।

ঃ তুমি পড়াশোনা কর, কান্না থামাতে হবে না।

ঃ আহা ভাবী, দাও না। প্লীজ।

শাহানা সত্যি সত্যি কান্না থামিয়ে দিল। চিন্তিত মুখে বলল, ওর গা বেশ গবম ভাবী।

ঃ হুঁ। একটু গরম।

ঃ বাবাকে শুনিও না। বাবা শুনলেই বেলাডোনা-ফোনা খাইয়ে দেবে।

শাহানা খিল খিল করে হেসে উঠল। নীলু হাসল না।

ঃ এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন ভাবী?

ঃ এমনি। কারণ নেই কোন।

ঃ মন খারাপ নাকি?

ঃ না।

ঃ আজ শুনলাম পোলাও রান্না হচ্ছে, ব্যাপার কি ভাবী? মা খুব চেঁচামেচি করছিল, মাসের শেষে এত খরচ!

ঃ চেঁচামেচি কখন করলেন?

ঃ তুমি বাইরে ছিলে—নিউমার্কেটে। আজ কি কোন বিশেষ দিন ভাবী?

ঃ বিশেষ দিন আর কি! তোমার ভাইয়ের জন্মদিন।

শাহানা মুখ টিপে হাসতে লাগল। নীলু বলল, হাসছ কেন?

ঃ এমনি হাসছি। ভাবী, তুমি ভাইয়াকে খুব ভালবাস, তাই না?

নীলু লজ্জিত হয়ে পড়ল। বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলু বলল—ওকে শুইয়ে দাও শাহানা, ঘুমুচ্ছে।

ঃ থাকুক না একটু। কি আরাম করে ঘুমাচ্ছে দেখ না।

ঃ পড়াশোনা কর শাহানা। বাবুকে নিয়ে ঘুরতে দেখলে মা রেগে যাবেন।

ঃ রাগুক, আমি কেয়ার করি না।

নীলু রান্নাঘরে উঁকি দিল। মনোয়ারা বিরক্ত মুখে কি যেন জ্বাল দিচ্ছিলেন। নীলুকে দেখেই রেগে উঠলেন— হঠাৎ করে তোমার এমন পোলাও খাবার শখ হল কেন বল তো?

নীলু বড় লজ্জা পেল।

ঃ সংসারের এই অবস্থা। এর মধ্যে হুটহাট করে এত বাজার করা ঠিক না। সবাই অবুঝ হলে চলে? বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া বাড়িয়েছে।

ঃ আবার?

ঃ হ্যাঁ। একশ টাকা বাড়িয়েছে। আর কি মিষ্টি মিষ্টি কথা। আমাকে ডাকছে বড় আপা। ইচ্ছা করছিল, এক চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেই।

নীলু হাসতে গিয়েও হাসল না। মনোয়ারা নিজের মনে গজ গজ করতে লাগলেন— ঢাকা শহরে চাকরি-বাকরি করতে হলে নিজের বাড়ি থাকতে হয়। ভাড়া বাড়িতে থেকে ঢাকা শহরে চাকরি করা যায় না।

নীলু অস্পষ্ট স্বরে বলল—একদিন হয়ত বাড়ি হবে।

মনোয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—হবেটা কি ভাবে? আকাশ থেকে টুপ করে একটা পড়বে নাকি? না তোমার আলাউদ্দিনের চেরাগ টেরাগ পেয়েছ? যাও তোমার শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করে এসো তো, তিনি এখন দয়া করে ভাত খাবেন কিনা। না খেলে কখন উনার মর্জি হবে।

মনোয়ারা আজ বিকাল থেকে হোসেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরকম তিনি প্রায়ই করেন এবং হোসেন সাহেব বড়ই কাবু হয়ে পড়েন। স্ত্রীর রাগ ভাঙ্গানোর জন্যে সম্ভব অসম্ভব নানারকম কায়দা করেন। আজ কিছুই করছেন না। সন্ধ্যা থেকে চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালানো হয়নি।

নীলু মৃদু স্বরে ডাকল— বাবা! হোসেন সাহেব উঠে বসলেন।

ঃ মা জিগ্যেস করেছেন ভাত খাবেন কিনা।

ঃ খাব, বলে আস খাব।

ঃ মা'র সঙ্গে কথা বন্ধ নাকি?

ঃ হুঁ।

ঃ কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে?

ঃ তেমন কিছু না। পেনশন তুলতে গিয়েছিলাম। তুলতে পারিনি তাতেই তোমার মা গেছে ক্ষেপে। বললাম কাল তুলব। এই ভীড়ের মধ্যে আমি বুড়ো মানুষ ধাক্কাধাক্কি করতে পারি নাকি?

ঃ তা তো ঠিকই।

ঃ এই জিনিসটা তোমার শাশুড়ীকে বুঝাব কি ভাবে? অন্যদেরও যে ছোটখাট প্রবলেম হতে পারে, এটা সে বুঝবে না। কি মুশকিল বল তো দেখি।

হোসেন সাহেব চাদর গায়ে দিলেন। বাতি জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছু বলবেন। নীলু তার শ্বশুরের এই ইতস্ততঃ ভঙ্গিটি খুব ভাল চেনে।

ঃ কিছু বলবেন বাবা?

ঃ হুঁ। ছাদে চল তো মা আমার সঙ্গে। তোমার শাশুড়ী যেন আবার না দেখে। বড় সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত মহিলা। তিলকে তাল করবে।

তারা নিঃশব্দে ছাদে উঠে এল। হোসেন সাহেব নির্জন ছাদেও গলা নীচু করে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। সেই সমস্যার কথা শুনে নীলুর মাথায় বাড়ি পড়ল।

হোসেন সাহেব পেনসন না তুলে ফিরে এসেছেন কথাটা ঠিক না। পেনসনের সাতশ এগারো টাকা তেত্রিশ পয়সা যথারীতি তুলেছেন। এবং একটা বিক্সা নিয়ে গিয়েছিলেন বায়তুল মুকাররমে এক পাউণ্ডের একটা ফ্রুট-কেক কিনবার জন্যে। ফ্রুট-কেকও ঠিকই কিনেছেন। দাম দিতে গিয়ে দেখেন পকেট ফাঁকা, একটা পয়সাও নেই।

নীলু শুকনো গলায় বলল— ভাল করে পকেট দেখেছেন?

ঃ খুব কম হলেও দশবার করে প্রতিটি পকেট দেখলাম। পকেটে টাকা না থাকলে টাকা পাওয়া যাবে না। একবার খোঁজাও যা, একশবার খোঁজাও তা।

ঃ তা ঠিক।

ঃ এখন কি করি তুমি বল বৌমা। কাল তো তোমার শাশুড়ী ঠেলেঠুলে আমাকে আবার পাঠাবে। পাঠাবে না?

ঃ হুঁ, পাঠাবেন।

ঃ চিন্তায় আমার খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কি করব একটা বুদ্ধি দাও মা।

নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল, সত্যি কথাটা বললে কেমন হয় বাবা?

হোসেন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, সত্যি কথা বললে উপায় আছে? আমাকে টিকতে দিবে এ বাড়িতে? তুমি তোমার শাশুড়ীকে কতটুকু চেন? আমি চিনি চল্লিশ বছর ধরে।

নীলু চুপ করে রইল। হোসেন সাহেব বললেন, তুমি বরং সফিককে আজ রাতে কথাটা বল। সে কাল সাতশ টাকা জোগাড় করে রাখুক। আমি তার অফিস থেকে নিয়ে আসব।

ঃ ঠিক আছে বলব।

ঃ এইটাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। এর আর দ্বিতীয় কোন সমাধান নেই।

হোসেন সাহেব হৃষ্টচিত্তে নিচে এলেন। তাঁর মনের মেঘ কেটে গেছে। খেতে বসে রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। তাঁর কলেজ জীবনের দু'একটা মজার গল্প বললেন। খাওয়া- দাওয়ার পর বাড়িওয়ালার বাসায় রওনা হলেন। খানিকক্ষণ টিভি দেখবেন।

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বললেন, লজ্জা লাগে না পরের বাড়িতে বসে টিভি দেখতে?

ঃ লজ্জার এর মধ্যে কি আছে?

ঃ রোজ রোজ অন্যের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নাই?

ঃ না, কিছুই নাই। তাছাড়া ওরা আমাকে পছন্দ করে। বাড়িওয়ালা মেয়েটা আমাকে চাচাজান ডাকে। রশিদ সাহেবও আমাকে খুব খাতির করে।

ঃ বাজে বক বক করবে না। দুনিয়া শুদ্ধ লোক তোমাকে খাতির করে। যা মনে আসে বলেই খালাস। আজ কোথাও যেতে পারবে না. বসে থাক এখানে।

ঃ বসে থেকে করবটা কি?

ঃ যা ইচ্ছা কর।

হোসেন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তবে খুব একটা বিচলিত হলেন না। মনোয়ারা কথা বলা শুরু করেছেন এটা একটা সুলক্ষণ। তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথি বই নিয়ে বসলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন। এক ফাঁকে নীলুর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেনে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি একজন সুখী পরিতৃপ্ত মানুষ। তাঁর কোন দুঃখ কষ্ট নেই। এই পৃথিবীতে বাস করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

শাহানা লক্ষ্য করল বই পড়তে পড়তে হোসেন সাহেব গুন গুন করে গান গাইছেন। গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, তবে "না গো না গো" এই শব্দগুলি আছে। শাহানার বড় মজা লাগল। বাবার মনে এত ফূর্তি কেন কে জানে? মাঝে মাঝেই তাঁর মধ্যে এমন ফূর্তির ভাব আসে। শাহানা বলল— তোমাকে এত খুশী লাগছে কেন বাবা? হোসেন সাহেব জবাব না দিয়ে পা নাচাতে লাগলেন।

নীলু পেনসনের ব্যাপার কি করে বলবে বুঝতে পারছে না। আজকের দিনটিতে সফিককে কোন খারাপ খবর দিতে ইচ্ছা করছে না। হঠাৎ করে বেচারা একদিনের মধ্যে সাতশ' টাকা জোগাড় করবে কি ভাবে?

সফিক ঘুমুবার আয়োজন করছে। শেষ, সিগারেটটি ধরিয়েছে। এখন সে খানিকক্ষণ পায়চারী করবে। নীলু হালকা গলায় বলল, আজ আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল- বন্যা নাম। সফিক কিছু বলল না। নীলু বলল, তোমাকে তো তার কথা বলেছিলাম। এক পুলিশ ইন্সপেকটরের মেয়ে। খুব ছটফট করত। সারাক্ষণ কথা বলত। ক্লাসে ওর নাম ছিল ফরফরানি। প্রায় ন'বছর পর ওর সঙ্গে দেখা। অবিকল আগের মতই আছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ। সারাক্ষণ বক বক করেছে। ও আবার চাকরিও করে- চার হাজার টাকার মত পায়।

সফিক কিছু বলল না। মশারী তুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সহজ স্বরে বলল– বাতি নিভিয়ে দাও নীলু। তোমার ঘুমুতে দেরী আছে নাকি ?

ঃ না আমিও শোব।

নীলু বাতি নিভিয়ে সফিকের গা ঘেঁষে ঘুমুতে গেল। সফিক হেসে বলল– কি ব্যাপার আজ আমার সঙ্গে কেন?

নীলু লজ্জিত স্বরে বলল, কেন তোমার সঙ্গে আমি ঘুমাই না?

ঃ তুমিই তো টুনীকে রেখে দাও মাঝখানে।

সফিক হাত বাড়িয়ে নীলুকে আকর্ষণ করল। পুরুষদের এই আকর্ষণের অর্থ পৃথিবীর সব নারীদেরই জানা। নীলু জড়িয়ে ধরল সফিককে। চারদিক অন্য রকম হতে শুরু করল। শারীরিক ভালবাসাও এক ধরণের ভালবাসা। এ ভালবাসাও নীলুর ভালই লাগে। এই সময়টাতেই সফিক তরল ভঙ্গিতে কিছু কথাবার্তা বলে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়। হাসির কথা বললে হাসে।

ঃ আমার এই বন্ধু কি বলছিল জান?

ঃ কি বলছিল?

ঃ আমাকে বলছিল একটা চাকরি-টাকরি জোগাড় করতে। চেষ্টা করলেই নাকি পাওয়া যায়।

ঃ তুমি কি বললে?

নীলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চাকরি একটা পেলে মন্দ হয় না কি বল?

ঃ ভালই হয়। সংসারের টানাটানি দূর হয়।

ঃ চেষ্টা করে দেখব নাকি?

সফিক তরল স্বরে বলল– তুমি কি চাকরি করতে পারবে?

ঃ পারব না কেন?

ঃ চাকরি করার মেয়ে অন্য রকম হয়। তুমি সেই টাইপ না। তুমি গৃহী টাইপ মেয়ে।

ঃ আমি ঠিকই পারব। গৃহী টাইপ হই আর যাই হই।

ঃ আচ্ছা দেখা যাবে।

সফিক এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। নানা রকম স্বপ্ন দেখতে লাগল। মন্দ হয় না একটা চাকরী পেলে। সংসারের কষ্ট দুর হয়। মাসে মাসে মাকে কিছু টাকা পাঠানো যায়। একটা টেলিভিশন কেনা যায়। টিভি দেখার জন্যে বাবাকে তাহলে আর রোজ রোজ অন্যের বাড়ি যেতে হয় না। রফিকের হঠাৎ আসা আব্দার মেটান যায়। শাহানাকে গলার একটা চেইন বানিয়ে দেয়া যায়। এত বড় মেয়ে অথচ কানে দু'টি ছোট্ট ফুল ছাড়া কোন সোনার গয়না নেই। গয়না দূরের কথা একটা ভাল শাড়ি পর্যন্ত নেই। গত ঈদে সে লাজুক ভঙ্গিতে বলেছিল– ভাবী, আমাকে একটা কমলা রঙের রাজশাহী সিল্কের শাড়ি কিনে দেবে?

নীলু বলেছে, হ্যাঁ দেব। নিশ্চয়ই দেব।

ঃ আমাদের ক্লাসের অরুণার এ রকম একটা শাড়ি আছে। অবিকল সে রকম একটা শাড়ি চাই।

ঃ ঠিক আছে।

ঃ তোমাকে আমি প্রিন্টটা দেখিয়ে দেব।

শাহানা প্রিন্ট দেখিয়েও দিল কিন্তু সেই শাড়ি কেনা হল না। হল না বলা ঠিক না, বলা উচিত কিনে দেয়া গেল না। শাহানা কিছুই বলল না। শুধু নীলু লজ্জায় এবং দুঃখে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে ঈদের ভোরবেলায় দীর্ঘ সময় কেঁদেছিল। কত রকমের দুঃখই না আছে মানুষের।

একদিন শাহানার হয়ত খুব বড়লোকের ঘরে বিয়ে হবে। ভাইয়ের বাড়ির ছোটখাট দুঃখ কষ্ট মনেই থাকবে না। কিন্তু নীলুর মনে তো এই দুঃখ থাকবেই। প্রতিটি ঈদের দিনে ভোরবেলা মনে পড়বে।

নীলু সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠল। একটা বেজেছে। বাবুর জেগে উঠার সময় হয়েছে, এক্ষুণি দুধ খাওয়ার জন্যে কাঁদতে শুরু করবে। দুধ বানিয়ে রাখাই ভাল।

বসার ঘরে শাহানা পড়ছে। খুব খাটাখাটনি করছে। নিশ্চয়ই ভাল করবে পরীক্ষায়। নীলু দরজা খুলে বেরুতেই শাহানা বলল, তুমি এখনো জেগে আছ?

ঃ হুঁ।

ঃ পড়াশোনায় দারুণ উৎসাহ দেখি।

ঃ তুমি কি চাও আমি ফেল করি?

ঃ না, তা চাই না। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ করে ফেল তাও চাই না।

শাহানা বই বন্ধ করে উঠে এল।

ঃ ভাবী, একটা কথা বলব?

ঃ বল।

ঃ বাবা তোমাকে ছাদে নিয়ে কি বলল?

ঃ তেমন কিছু না।

ঃ না ভাবী, বল। তোমার পায়ে পড়ি।

নীলু অল্প হেসে বলল, তোমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বললাম।

ঃ সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না ভাবী।

ঃ ঠাট্টা কোথায়, সত্যি কথা বললাম।

ঃ না ভাবী, বল কি ব্যাপার!

ঃ বললাম তো, একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ছেলে বিলেতে ডাক্তারি পড়ে। দেখতে খুব সুন্দর। ছবি আছে আমার কাছে, তুমি চাইলে ছবি দেখাতে পারি।

ঃ কসম বল।

ঃ কসম।

: তিন কসম?

: তিন কসম আবার কি?

শাহানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। সে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। তার মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। নীলু হাসতে হাসতে বলল, ঠাট্টা করছিলাম। মনে হয়, তোমার আশা ভঙ্গ হয়েছে?

শাহানা ছুটে এসে নীলুর চুল টেনে দিল--কেন তুমি এমন আজেবাজে ঠাট্টা কর। আমি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। দেখ এখনো আমার গা কাঁপছে। নীলু শাহানাকে জড়িয়ে ধরল।

বুধবারটা রফিকের জন্যে খুব লাকি। বুধবারে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারে। এইদিন কোন অঘটন ঘটবে না। কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখা হবে। বাসে উঠলে জানালার পাশে বসার সিট পাওয়া যাবে। বাসের কণ্ডাক্টার ভাংতি হিসেবে তাকে দেবে চকচকে নতুন নোট।

আজ বুধবার কিন্তু তবু অঘটন ঘটল। ফার্মগেটে বাস থেকে নামার সময় নতুন পাঞ্জাবিটা ফস করে পেটের কাছে ছিঁড়ে গেল। অনেকখানি ছিঁড়ল। রফিকের সঙ্গের শুকনো ভদ্রলোক বললেন—কণ্ডাক্টারকে একটা চড় দেন ভাই। তাড়াতাড়ি করেন, বাস ছেড়ে দেবে।

রফিক অবাক হয়ে বলল, তাকে চড় দেব কেন? সে তো ছিঁড়ে নাই!

: সে না ছিঁড়ুক, তার বাস তো ছিঁড়েছে!

অকাট্য যুক্তি। কিন্তু বাস ছেড়ে দিয়েছে। রফিক বিমর্ষ মুখে স্টেডিয়ামের দিকে এগুতে লাগল। তার প্ল্যান প্রোগ্রাম বদলাতে হবে। ছেঁড়া পাঞ্জাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না। সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি হচ্ছে একটা বই কিনে পেটের কাছে ধরে রাখা। অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার।

রফিক নিউজ স্ট্যাণ্ড থেকে এককপি বিচিত্রা কিনে উঠে দাঁড়ানো মাত্র মেয়েলী গলা শোনা গেল—রফিক সাহেব!

সে তাকিয়ে দেখে শারমিন। হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি গায়ে। লাল টুকটুকে একটা শাল। হাতে পাটের ব্যাগ। শারমিন বলল, এভাবে তাকাচ্ছেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না।

: চিনতে পারছি।

: আমি তখন থেকে লক্ষ্য করছি।

: তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ। দেখলাম পেটে হাত দিয়ে খুব চিন্তিত মুখে আপনি হাঁটছেন। কি হয়েছে আপনার?

রফিক কিছু বলল না।

ঃ আপনার শরীর খারাপ করেছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

ঃ শরীর ঠিকই আছে। বাস থেকে নামার সময় পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়াটা হাত দিয়ে ঢেকে হাঁটছি।

শারমিন হেসে ফেলল। রফিক বিরক্ত মুখে বলল— আপনি হাসছেন?

ঃ সরি, আর হাসব না।

ঃ এখানে কি করছেন?

ঃ বই কিনতে এসেছি। বিদেশে কিছু বই পাঠাতে হবে। একজন চেয়েছে।

ঃ কি বই? গল্প উপন্যাস?

ঃ না, সে গল্প উপন্যাস পড়ে না। সিরিয়াস ধরণের বই পড়ে।

ঃ একটা ডিকশনারী কিনে পাঠিয়ে দিন।

শারমিন খিল খিল করে হেসে ফেলল। রফিকের মনে হল বুধবার দিনটি আসলে তার জন্যে ভালই।

ঃ রফিক সাহেব, আপনার কাজ না থাকলে আসুন আমার সঙ্গে, বই পছন্দ করে দেবেন। আছে কোন কাজ?

ঃ না, কাজ নাই কোন। আর থাকলেই বা কি?

তারা হাঁটতে শুরু করল। শারমিনের হাঁটার ভঙ্গি স্বাভাবিক। কোন রকম সংকোচ নেই জড়তা নেই। যেন তারা দীর্ঘদিনের বন্ধু। শারমিন হালকা গলায় বলল, ঐদিন আপনি খুব রাগ করেছিলেন, তাই না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ খুব বেশী রাগ করেছিলেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ এখনো রাগ আছে?

ঃ আছে।

ঃ কি করলে আপনার রাগ কমবে?

ঃ আপনি যদি আজ সারাদিন আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে রাগ কমবে।

শারমিন চমকে তাকাল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। রফিক বলল, এখন বোধ হয় আপনি রাগ করেছেন, তাই না?

ঃ না, আমি রাগ করিনি।

ঃ তাহলে কি আজ সারাদিন থাকবেন আমার সঙ্গে? বাজার শেষ করে আমরা চিড়িয়াখানায় যেতে পারি।

শারমিন হেসে ফেলল। রফিক বলল--হাসছেন কেন?

ঃ চিড়িয়াখানায় যাবার কথা শুনে হাসছি।

ঃ তাহলে অন্য কোথাও, মিউজিয়ামে কিংবা সোনারগাঁয়ে যেতে পারি। প্রাচীন বাংলার রাজধানী।

ঃ আজ আপনার এত ঘুরাঘুরির শখ হয়েছে কেন?

ঃ কারণ আজ আমার জন্মদিন।

বলেই রফিকের একটু খারাপ লাগল। একটা মিথ্যা কথা বলা হল। কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কপটতা করতে ইচ্ছা করে না। রফিক সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। জন্মদিন প্রসঙ্গে এই মিথ্যা বলে তার খুব খারাপ লাগছে।

ঃ আপনার জন্মদিন আজ? বাহ, বেশ মজা তো। খুব ভাল দিনে দেখা হল আপনার সঙ্গে। আসুন আপনাকে একটা গিফট কিনে দেব। আপনি কিন্তু না বলতে পারবেন না।

রফিক কিছু বলল না।

ঃ আপনাকে খুব সুন্দর একটা পাঞ্জাবি কিনে দেব। ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরা কেউ আমার পাশে পাশে হাঁটলে আমার ভাল লাগে না।

শারমিন আবার হেসে উঠল। কিশোরীদের মত হাসি। রিনরিন করে কানে বাজে, হঠাৎ করে মন খারাপ করে দেয়।

রফিক মৃদু স্বরে বলল--শাবমিন, আমার জন্মদিনের কথাটা মিথ্যা। আজ আমার জন্মদিন নয়।

ঃ জন্মদিন নয়, তাহলে জন্মদিনেব কথাটা কেন বললেন?

ঃ আমার ধারণা ছিল এটা বললে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

ঃ আমার থাকাটা এত জরুরী কেন?

রফিক কোন জবাব দিল না। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যাব জবাব সরাসরি দেয়া যায় না। শারমিন দ্বিতীয়বার বলল, বলুন কেন আপনি চান আমি আজ সারাদিন আপনার সঙ্গে থাকি?

ঃ জানি না,কেন চাই।

শারমিন হালকা গলায় বলল, আমরা সাবা জীবনে অনেক কিছুই চাই কিন্তু সবকিছু পাই না। আমি সব সময় স্বপ্ন দেখি আমার অনেকগুলি ভাইবোন, সবাই হৈ-চৈ ছুটাছুটি করছে। ঝগড়া করছে। কিন্তু থাকি একা একা। আমার কি মনে হয় জানেন, কেউ যদি তীব্র ভাবে কোন জিনিস চায় সে সেটা পায় না। কোন কিছুব জন্যেই প্রবল আকাঙ্খা থাকা ঠিক না। বুঝতে পারছেন?

ঃ পারছি।

ঃ চলুন পাঞ্জাবি কিনি। জন্মদিন উপলক্ষ্যেই দিলাম। এ্যাডভান্স গিফট।

ঃ না, কোন দরকার নেই। আচ্ছা আমি যাই।

ঃ চলে যাবেন?

ঃ হ্যাঁ।

শারমিন বলল, রফিক সাহেব, আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। আসুন কোথাও বসে কথাটা বলি। এখানে কোন ভাল রেস্টুরেন্ট আছে?

ঃ না, এদিকে তেমন কিছু নেই।

ঃ চলুন কোন একটা চাইনীজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। চাইনীজ রেস্টুরেন্টগুলি এই সময় ফাঁকা থাকে। আসবেন?

ঃ চলুন যাই।

রফিক শারমিনের সহজ স্বাভাবিক আচার-আচরণের প্রশংসা করল। এই মেয়েটি জানে সে কি বলছে, কি করছে। এটা খুব বড় কথা। বেশীর ভাগ মানুষই জানে না সে কি করছে, কি বলছে।

শারমিন বলল, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন? এরা খুব ভাল সমুসা জাতীয় একটা খাবার তৈরী করে। চায়ের সঙ্গে ভাল লাগবে। দিতে বলি?

ঃ বলুন।

শারমিন খাবারের কথা বলল। অস্বস্তির সঙ্গে এদিক ওদিক খানিকক্ষণ তাকাল। যেন কি বলবে তা একটু গুছিয়ে নিচ্ছে। রফিক বলল, বলুন কি বলবেন?

ঃ আপনি এত গম্ভীর হয়ে থাকলে বলি কি করে? সহজ হয়ে বসুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভাইভা দিতে এসেছেন।

শারমিন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সাব্বির আহমেদ নামে একজন ভদ্রলোক আছেন। পি এইচ. ডি. করছেন আমেরিকায়। অত্যন্ত ভাল ছাত্র এবং আমার বাবা তাকে খুব পছন্দ করেন। আমি নিজেও করি। পছন্দ করার মতই মানুষ। তাঁর মাকে আমি চাচী ডাকি। যখন আমার কোন কারণে খুব মন খারাপ লাগে তখন উনার কাছে যাই, মন ভাল করবার জন্যে। বুঝতেই পারছেন ইনি কেমন মহিলা। পারছেন না?

ঃ পারছি।

ঃ ঐ সাব্বির আহমেদ ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, যখন আমি কলেজে পড়ি তখন থেকে। সে জুলাই মাসে দেশে ফিরবে, তখন আমাদের বিয়ে হবে।

রফিক কিছু বলল না। শারমিন মৃদু স্বরে বলল, আমি সুখী হতে চাই। এবং আমি জানি এই বিয়ে আমার জন্যে সুখ নিয়ে আসবে। আমার ইনট্যুশন তাই বলে।

রফিক সিগারেট ধরাল। শারমিন বলল, আমি আসলে একজন দুঃখী মেয়ে। আমি সুখ চাই, সুখী হতে চাই।

ঃ সবাই চায়।

ঃ হ্যাঁ, সবাই চায়। তবে আমি বোধহয় একটু বেশী চাই।

সে মুখ নীচু করে হাসল। রফিক বলল, কঠিন কঠিন বইগুলি ঐ ভদ্রলোকের জন্যে কিনবেন?

ঃ হ্যাঁ। আপনার কথামত একটা ডিকশনারীও কিনে দেব। ওর খুব মেজাজ খারাপ হবে।

রফিক হেসে ফেলল। শারমিন বলল, বই পছন্দ করবার জন্যে আপনি আসবেন তো আমার সঙ্গে?

ঃ হ্যাঁ, আসব।

ঃ কেনা-কাটার পর আপনার কথামত আমরা ঘুরে বেড়াব। সারাদিন ঘুরব।

ঃ তার দরকার নেই।

ঃ দরকার আছে। আজ আমার খুব ঘুরতে ইচ্ছা হচ্ছে। এবং আরেকটা কথা, রফিক সাহেব!

ঃ বলুন।

ঃ এখন থেকে আমরা তুমি করে বলব। আপনি আপনি শুনতে খারাপ লাগছে।

ঃ ঠিক আছে।

ঃ প্রথম প্রথম বলতে হয়ত একটু অস্বস্তি লাগবে, পবে আর লাগবে না।

সত্যি সত্যি তারা সারাদিন ঘুরে বেড়াল। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখার পর শারমিনের ইচ্ছা হল, প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁ দেখবে। রফিক বলল, ফিরতে দেরী হয়ে যাবে, সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

ঃ হোক সন্ধ্যা, আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সঙ্গে গাড়ি আছে। অসুবিধা কি?

উৎসাহে ও আনন্দে শারমিন ঝলমল করছে। এই আনন্দের উৎসটি কোথায় কে জানে? সারা পথ হাত নেড়ে সে অনেক গল্প করতে লাগল। তুচ্ছ সব কথা, এতেই একেবার সে হাসতে হাসতে ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ছে।

রফিক মোটামুটি চুপচাপই আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। পরিষ্কারভাবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

সোনারগাঁ যাওয়ার পথে শারমিনের চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল। পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে তারা চা খেল। শারমিন বলল, কেমন গ্রাম গ্রাম চারদিক, তাই না?

ঃ এটা তো গ্রামই। গ্রাম-গ্রাম তো লাগবেই।

ঃ তুমি কখনো গ্রামে গিয়েছ রফিক?

ঃ যাব না কেন, অনেকবার গিয়েছি।

ঃ আমি কখনো গ্রাম দেখিনি। একবাব তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব।

ঃ বেশ তো।

ঃ গ্রামের জোছনা নাকি খুব সুন্দর হয়?

হয় বোধ হয়, আমার এমন কাব্য ভাব নেই। মন দিয়ে দেখিনি কখনো।

তেমন কোন হাসির কথা নয়, কিন্তু খিল খিল করে হেসে উঠল শারমিন, যেন খুব মজার কথা। রফিক বলল, তোমার সাব্বির সাহেব কি তোমাকে আমার সঙ্গে গ্রামে যেতে দেবেন?

ঃ দেবে না কেন? নিশ্চয়ই দেবে।

ঃ দেখা যাবে।

ঃ ওর মধ্যে কোন প্রিজুডিস নেই।

ঃ না থাকলেই ভাল।

ঃ আর সে ভাবুক ধরণের, রাতদিন বই নিয়ে থাকে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ। মাঝে মাঝে হঠাৎ রোমান্টিক হতে চেষ্টা করে, সেটা আরো হাস্যকর লাগে।

ঃ দু'একটি উদাহরণ দাও শুনি।

ঃ না থাক, আমার লজ্জা করবে।

ঃ আহ, লজ্জার কি আছে এর মধ্যে?

শারমিন গম্ভীর হয়ে বলল, যেমন গতমাসে হঠাৎ চিঠি লিখল—শারমিন, তুমি অবশ্যই তোমার মাথার একগাছি চুল খামে ভরে পাঠাবে।

বলেই শারমিন লজ্জা পেল। সন্ধ্যার আলোয় তার লজ্জারাঙা মুখ দেখতে বড় ভাল লাগল রফিকের। তার জীবনে এই দিনটি বিশেষ দিন হয়ে থাকবে। একটি গোপন সঞ্চয়। রফিক একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করল। তার মনে হল সুখ এবং দুঃখ একসঙ্গে মিশে থাকে এমন ঘটনার সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশী।

শারমিন বাড়ি ফিরল রাত আটটায়। রহমান সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখেই বললেন—

ঃ কোথায় ছিলে মা?

ঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমেরিকায় পাঠাবার জন্যে কিছু বই কিনলাম, তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে নিয়ে খুব ঘুরলাম।

ঃ খবর তো দেবে। খুব চিন্তা করছিলাম।

ঃ আই এ্যাম সরি।

ঃ একটা টেলিফোন করে দিলেই হত।

শারমিন বাবাকে জড়িয়ে ধরল। রহমান সাহেব হেসে ফেললেন।

ঃ খুব ভাল বন্ধু বুঝি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ অনেকদিন পর দেখা হল?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বাসায় নিয়ে এলে না কেন?

ঃ নিয়ে আসব এক দিন।

ঃ সাব্বিরের চিঠি এসেছে। তোমার টেবিলে রেখে এসেছি।

ঃ থ্যাংকস।

ঃ কিছু বইপত্রও বোধহয় পাঠিয়েছে। বিরাট একটা প্যাকেট দেখলাম।

ঃ ভূতের বই পাঠাতে বলেছিলাম। তাই পাঠিয়েছে।

সাব্বিরের চিঠিগুলি সাধারণত ছোট হয়। "তুমি কেমন আছ? আমি ভাল। এখানকার ওয়েদার এখন বেশ চমৎকার।" এতেই শেষ।

কিন্তু এবারের চিঠিটি বেশ দীর্ঘ। ওয়েদার ভাল ছাড়াও অনেক কিছু লেখা। শারমিন লক্ষ্য করল চিঠি পড়তে তার কেমন যেন আগের মত ভাল লাগছে না। জড়ানো ধরণের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে তার সত্যি সত্যি হাই উঠল।

পাঠানো বইগুলিও খুলে দেখতে ইচ্ছা করছে না। এরকম হচ্ছে কেন? দায়িত্বপালনের মত করে সে চিঠি শেষ করল। বইয়ের প্যাকেট খুলে বইগুলি উল্টেপাল্টে দেখল। রাত দশটার দিকে গেল বাবার ঘরে। শোবার আগে 'গুড নাইট' জানাতে।

রহমান সাহেব বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে চুরুট টানছিলেন। ঘরে একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ। রাতের খাবারের পর তিনি সাধারণতঃ এক পেগ হুইস্কি খেয়ে থাকেন।

শারমিনকে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসলেন। আদুরে গলায় বললেন; ঘুমুতে যাচ্ছ মা?

ঃ হুঁ।

ঃ বস একটু।

শারমিন বসল।

ঃ কি লিখেছে সাব্বির? কেমন আছে সে?

ঃ ভালই আছে।

ঃ কবে আসবে কিছু লিখেছে?

ঃ না।

ঃ আমি ভাবছি ওকে লিখব জুন-জুলাইয়ের দিকে একবার দেশে আসতে। বাই দিস টাইম তোমার এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্টও নিশ্চয়ই বের হয়ে যাবে। হবে না?

ঃ হ্যাঁ হবে। আগস্টেই হবার কথা।

ঃ গুড। তাই লিখব। যাও মা এখন ঘুমুতে যাও। মনে হয় অনেক রাত হয়েছে।

শারমিন উঠে দাঁড়াল এবং হঠাৎ রহমান সাহেবকে অবাক করে দিয়ে শান্ত স্বরে বলল, বাবা, আমি ঠিক করেছি সাব্বির ভাইকে বিয়ে করব না।

রহমান সাহেব পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর চেহারা বা বসে থাকার ভঙ্গিতে পরিবর্তন হল না। চুরুট নিভে গিয়েছিল, তিনি চুরুট ধরালেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বললেন, এই নিয়ে আমি কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব, এখন ঘুমুতে যাও।

শারমিন নড়ল না। যেকানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। রহমান সাহেব শীতল কণ্ঠে বললেন, ঘুমুতে যাও শারমিন।

শারমিন ঘর ছেড়ে গেল। রহমান সাহেব সাধারণতঃ এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন। রাত একটায় বারান্দায় হাঁটতে গিয়ে দেখেন শারমিনের ঘরেও বাতি জ্বলছে। একবার ভাবলেন ডাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকলেন না।

ছোটবেলায় শারমিন মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বাতি জ্বালিয়ে বিছানায় বসে থাকত। তিনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতেন— ভয় পাচ্ছ মা?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমার সঙ্গে ঘুমুবে?

ঃ না।

ঃ মজনুর মাকে বলব তোমার ঘরে ঘুমুতে? মেঝেতে বিছানা পেতে সে ঘুমুবে।

ঃ না।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে সে না হয় দরজার বাইরে ঘুমাক।

ঃ না, দরকার নেই।

শারমিন অত্যন্ত জেদী। তাকে দেখে অবশ্যি খুব নরম ধরণের মেয়ে বলেই মনে হয়। রহমান সাহেব অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করলেন। শারমিনের ভেতর এক ধরণের দৃঢ়তা আছে, যাকে তিনি ভয় করেন। তার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করতে হবে। সেজন্যে তাঁকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার মত বাজে ব্যাপার আর কিছুই নেই।

ভোরবেলা শারমিনকে খুব স্বাভাবিক মনে হল। নিজের হাতে বাবার জন্যে বেড-টি নিয়ে এল। মার্টিকে খাবার দিয়ে বাগানে বেড়াতে গেল। তার রোজকার অভ্যাস হচ্ছে টেবিলে নাশতা না দেয়া পর্যন্ত বাগানে হাঁটা। তার সঙ্গে হাঁটবে মার্টি। মাটি খানিকক্ষণ হাঁটবে আবার দৌড়ে গিয়ে তার খাবার খাবে, আবার ছুটে আসবে শারমিনের কাছে।

নাশতার টেবিলে রহমান সাহেব শারমিনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। চেহারায় রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নেই। ভোরবেলায় গোসল করেছে। স্নিগ্ধ একটা ভাব এসেছে চেহারায়। রহমান সাহেব চা খেতে খেতে বললেন, কাল রাতে তুমি একটি প্রসঙ্গ তুলেছিলে, আমরা কি সেটা নিয়ে এখন আলাপ করব?

শারমিন মৃদু স্বরে বলল, আলাপ করার দরকার নেই।

ঃ আমি কি লিখব সাব্বিরকে আসবার জন্যে?

ঃ হ্যাঁ, লেখ।

ঃ কোন কারণে কি তোমার মন বিক্ষিপ্ত?

ঃ না।

রহমান সাহেব নিঃশব্দে চা-পান-পর্ব শেষ করলেন। চুরুট ধরালেন এবং একসময় ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, চল আমরা বরং বেড়িয়ে আসি কোন জায়গা থেকে। যাবে?

ঃ যাব।

ঃ কোথায় যেতে চাও?

ঃ আমি জানি না, তুমি ঠিক কর।

ঃ নেপালে যাবে? হিমালয়-কন্যা নেপাল!

ঃ যাব।

ঃ বেশ আমি ব্যবস্থা করছি।

শারমিনরা পরের সোমবারেই সাতদিনের জন্যে নেপাল চলে গেল। বেড়াতে যাবার জন্যে সময়টা ভাল নয়। প্রচণ্ড শীত, কিন্তু তবু ঢাকা ছেড়ে বেরুতে পেরে শারমিনের ভালই লাগল। কেমন যেন হাঁপ ধরে গিয়েছিল। নেপাল থেকে সে সুন্দর একটি চিঠি লিখল সাব্বিরকে।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমরা বেশ ক'দিন হল নেপাল এসেছি। চমৎকার জায়গা। আপনিও চলে আসুন। আপনি এলে আমার আরো ভাল লাগবে। কিছুদিন ধরেই আমার কেন জানি খুব ফাঁকা ফাঁকা

লাগে। আপনি এলে রাতদিন আপনার সঙ্গে গল্প করব। আপনার যত কাজই থাকুক সব ফেলে রেখে আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে। গোমড়ামুখের প্রফেসর আমার এতটুকুও পছন্দ নয়।

বিনীতা
শারমিন

টুনীর বয়স এখন ন'মাস।

ন'মাস বয়েসী বাচ্চারা বাবা, মা, দুদু এই জাতীয় কথা বলতে শেখে, কিন্তু টুনীর ব্যাপারটা হয়েছে এই রকম– সে শুধু শিখেছে একটি শব্দ–জেজে। যাই দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং হাত নেড়ে বলে ওঠে, জেজে।

তাকে কথা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে শাহানা। শাহানার পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাজেই প্রচুর অবসর। শাহানা ঘোষণা করেছে, এক মাসের মধ্যে টুনীকে সব কথা শিখিয়ে ফেলবে।

শাহানা টুনীকে সোফার গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়েছে। টুনী তাকে লক্ষ্য করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শাহানা তার মনোযোগ আরো ভালভাবে আকর্ষণ করবার জন্যে কিছুক্ষণ হাত নাড়ল, তারপর বলল, বলতো টুনী--মামা। টুনী তার দু'টি দাঁত বের করে ফিক করে হেসে ফেলল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল-- জেজে।

ঃ উহুঁ, জেজে নয়, বল মামা।

ঃ জেজে, জেজে।

ঃ হল না। বোকা মেয়ে বল, মা মা।

ঃ জে জে। জে ....

ঃ মোটেও হচ্ছে না। ইচ্ছা করলেই তুমি পারবে। তোমার কত বুদ্ধি।

ঃ জে জে। জে ....

ঃ হচ্ছে না।

ঃ জেজে, জেজে, জেজে।

শাহানা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। টুনী হাত বাড়িয়ে দিল। সে কোলে উঠতে চায়। দু'টি জিনিস সে খুব ভাল শিখেছে- কোল এবং ছাদ। কোলে উঠেই সে দরজার দিকে দেখাবে। দরজা খোলা মাত্র ছাদের দিকে হাত বাড়াবে।

ছাদে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে নিজের মনে হামাগুড়ি দেবে। মাঝে মাঝে একা একা দাঁড়াতে গিয়ে ধপ করে পড়ে যাবে। ব্যথা পেলেও কাঁদবে না। অবাক হয়ে বলবে–জেজে, জেজে।

শাহানা টুনীকে কোলে নিয়ে উঁচু গলায় বলল—ভাবী, আমি ওকে একটু ছাদে নিয়ে যাচ্ছি। কেউ তার কথার কোন জবাব দিল না। নীলু রান্নাঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। মনোয়ারা গেছেন ডেনটিস্টের কাছে। কাল রাত থেকে তাঁর দাঁতে ব্যথা। আজ গেছেন দাঁত ফেলে আসতে।

শাহানা ছাদে উঠে গেল। রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। ছাদ ভেজা। টুনীকে নামানোর প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু সে নেমে পড়ার জন্যে ছটফট করছে। শাহানা আনিসের ঘরে উঁকি দিল।

আনিস তিনকোণা একটা কাঠের বাক্সে হাতুড়ী দিয়ে পেরেক মারছিল। শাহানাকে দেখেই চট করে বিছানার চাদর টেনে বাক্স ঢেকে ফেলল। শাহানা অবাক হয়ে বলল--এটা আবার কি?

আনিস বলল, আমার ম্যাজিকের বাক্স। পাবলিককে দেখানো নিষেধ আছে।

ম্যাজিকের ব্যাপারটি অল্প কিছুদিন হল শুরু হয়েছে। আনিস মনস্থির করেছে সে ম্যাজিশিয়ান হবে। পড়াশোনায় তার মাথা নেই। এই লাইনে কিছু করতে পারবে না। তার ধারণা ম্যাজিকের লাইনে সে উন্নতি করবে।

বশিদ সাহেব মহা বিরক্ত হয়েছেন। কোন ভদ্রলোকের ছেলে ম্যাজিশিয়ান হতে চায়, এটা ভাবলেই তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। সার্কাস, ম্যাজিক এইসব হচ্ছে ফালতু লোকের কাজ। ভদ্রলোকেব [illegible] না। আনিসকে তিনি ঘাড় ধরেই বের করে দিতেন, কিন্তু মেয়ের জন্যে পারেননি। বীণা আনিসকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে শুনেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে এমন একটা কাণ্ড করেছে যে তিনি রীতিমত হকচকিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছেন--প্রেম-ফ্রেম না তো? লতিফা রেগে গিয়ে বলেছেন, কি পাগলের মত কথা বল? বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি তোমার? চাকর শ্রেণীর একটা লোকের সঙ্গে তোমার মেয়ে প্রেম করবে? এসব নিয়ে আর কোনদিন কথা বলবে না।

ঃ আনিসকে কি চলে যেতে বলব?

ঃ থাক। চলে যেতে বলার দরকার নেই, ওর এ বাড়িতে ঢোকা আমি বন্ধ করছি।

ঃ কিভাবে?

ঃ আমি ব্যবস্থা করব, তুমি দেখ না।

ব্যবস্থা তিনি কি করলেন ঠিক জানা গেল না। শুধু দেখা গেল আনিস একটা কেরোসিন কুকার কিনেছে। নিজের রান্না এখন নিজেই রাঁধছে।

আনিসের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে লতিফা বেশ কিছুদিন স্কুল ছুটি হবার সময়টায় স্কুল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। যদি আনিসকে দেখা যায়। না, দেখা গেল না।

বীণার একটা তালাবন্ধ স্যুটকেস আছে। চাবি জোগাড় করে গোপনে একদিন সেই স্যুটকেস খুললেন যদি চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায়। আনিসের কোন চিঠি পাওয়া গেল না, তবে পাশা নামের একটি ছেলের কুৎসিত ধরণের একটা চিঠি পাওয়া গেল। সেই চিঠি পড়ে তাঁর রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড়। কি সর্বনাশ!

লতিফা চিঠির কথা কাউকে বলতে পারলেন না। এটি এমনই এক চিঠি যা কাউকে দেখানো যায় না, কারো সঙ্গে এ নিয়ে গল্পও করা যায় না। বীণা সেই চিঠি স্যুটকেসের পকেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছে কেন কে জানে?

টুনীকে কোলে নিয়ে শাহানা কৌতূহলী হয়ে আনিসের ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখছে। সে বলল, সবই কি আপনার ম্যাজিকের জিনিস নাকি আনিস ভাই?

: হুঁ।

: ঐ আংটিগুলি কি?

: লিংকিং রিঙ। একটা চাইনীজ ট্রিক। একটার ভেতর দিয়ে একটা ঢুকে যায়, আবার বের হয়ে আসে।

: তাই নাকি? দেখান না!

: এখন দেখানো যাবে না, প্র্যাকটিস নেই। পুরোপুরি ওস্তাদ না হয়ে আমি কোন ম্যাজিক দেখাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে আস।

: না।

: না কেন?

: ইচ্ছা করছে না।

: প্লীজ আস। চা বানিয়ে খাওয়াব, আমার ঘরে এখন চা বানানোর সব সরঞ্জাম আছে।

: চা আমি খাই না।

টুনীকে কোলে নিয়ে শাহানা নিচে নেমে গেল।

নীলু রান্না চড়াতে গিয়ে দেখল, লবণ নেই। কাজের কোন লোক নেই। এমন মুশকিল হয় একেকবার। এখন লবণের জন্যে পাঠাতে হবে রফিককে, সে বোধহয় এখনো ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙালে সে রাগ করবে। দশটা বেজে যাচ্ছে, সফিকের যাবার সময় হয়ে এল। আজ না খেয়েই অফিসে যেতে হবে।

নীলু উঠে এল। রফিককে অনুরোধ-টনুরোধ করে পাঠাতে হবে, এছাড়া উপায় নেই।

রফিকের ঘরের সামনে এসে নীলু থমকে দাঁড়াল। দরজায় নোটিশ ঝুলছে-- রাত তিনটা দশ মিনিটে ঘুমাতে যাচ্ছি। কেউ যেন সকাল এগারোটার আগে না ডাকে। ডাকলে খুনোখুনি হয়ে যাবে।

উপায় নেই। নীলু দরজায় ধাক্কা দিল। রফিক চেঁচিয়ে উঠল, কে?

: আমি।

: ভাবী, তুমি অন্ধ নাকি? নোটিশ দেখছ না?

: দেখছি। উপায় নেই আমার, প্লীজ উঠে আস।

: কি করতে হবে?

: লবণ এনে দিতে হবে। রান্না চড়াতে পারছি না।

রফিক অত্যন্ত বিরক্ত মুখে দরজা খুলল। বিড়বিড় করে বলল--ভোররাতে তোমাকে রান্না চড়াতে হয় কেন বল তো? তোমাদের যন্ত্রণায় শান্তিতে একটু ঘুমাবার উপায় নেই।

রফিকের দাড়ি অনেকখানি বড় হয়েছে। তাকে দাড়িতে এখন ভালই লাগছে। স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে একটু ভাল হয়েছে। পড়াশোনার ঝামেলা চুকেছে এই শান্তিতেই বোধহয়।

এম. এ. পরীক্ষায় রফিকের রেজাল্ট বেশ ভাল হয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাস থার্ড। সে সেকেণ্ড ক্লাস আশা করেছিল, তবে নিচের দিকে। রেজাল্ট বের হবার পর অন্যদের চেয়েও

সে নিজে বেশী অবাক হয়েছে। নীলুকে বলেছে, আরেকটু খাটাখাটনি করলে ফার্স্ট ক্লাস মেরে দিতে পারতাম ভাবী। কি, পারতাম না?

: হ্যাঁ, তা তো পারতেই।

: আমি যে একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র তা আগে বুঝতে পারিনি। আগে বুঝতে পারলে রাতদিন পড়তাম। আর তো পড়ার স্কোপ নাই। শেষ পরীক্ষাটাও দিয়ে দিলাম।

: বিসিএস-এর জন্যে পড়। বিসিএস দাও।

: বিসিএস আমার হবে না ভাবী। ভাইবাতে আউট করে দেবে।

: কেন?

: বিসিএস-এ চেহারা টেহারা দেখে। আমার তো সেইদিক দিয়ে জিরো। শর্ট। বোকা বোকা চাউনি। তাও দাড়িটা থাকায় রক্ষা।

: তোমার কি ধারণা, দাড়ি রাখায় তোমাকে খুব হ্যাণ্ডসাম লাগছে?

: হ্যাণ্ডসাম না লাগলেও ইন্টেলিজেন্ট লাগছে। চেহারায় একটা শার্পনেস চলে এসেছে। কি, আসে নাই? একটা অনেস্ট অপিনিয়ন দাও তো ভাবী।

চাকরির চেষ্টা সে বেশ করছে। তিনটি ইন্টারভ্যু দিয়েছে এ পর্যন্ত। একটা সিলেট চা-বাগানে, বাকি দু'টি ব্যাঙ্কে। চা- বাগানের ইন্টারভ্যু খুব ভাল হয়েছিল। রফিকের ধারণা ছিল সেখানেই হবে। হয়নি। ব্যাঙ্কের ইন্টারভ্যু ভাল হয়নি। তাকে জিজ্ঞেস করেছে, বাংলাদেশের আয়তন কত? সে বলতে পারেনি। ইন্টারভ্যু বোর্ডের এক ভদ্রলোক বললেন, এম. এ. পাশ করেছেন, আর বাংলাদেশের আয়তন কত এটা জানেন না? আওয়ামী লীগের ছয় দফা কি কি বলতে পারবেন? এটাতেও সে গণ্ডগোল করে ফেলল। ভদ্রলোক বিরক্ত স্বরে বললেন, ইন্টারভ্যু বোর্ড একটু প্রিপেয়ার্ড হয়ে ফেস করবেন। পড়াশোনা করে তারপর আসবেন।

রফিক এরপর অবশ্যি আটঘাট বেঁধে নেমেছে। জেনারেল নলেজের বই কিনে এনেছে তিনটি। নোট করছে, পড়ছে। উৎসাহের সীমা নেই।

সফিক অফিসের কাপড় পরে খাবার-ঘরে আসতেই নীলু লজ্জিত মুখে বলল, আজ রান্না শেষ হয়নি এখনো। সফিক কিছু বলল না। কিন্তু তার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে সে কিছুটা বিরক্ত।

: লবণ ছিল না। রফিক লবণ আনতে গিয়ে অনেকখানি দেরী করল। তুমি আজ ক্যানটিনে খেয়ে নিও।

: ঠিক আছে।

নীলু ইতস্তত করে বলল, আর ঐ চায়ের দাওয়াতের কথাটা মনে আছে?

: কোন্ দাওয়াত?

: ঐ যে আমার বন্ধু বন্যা চায়ের দাওয়াত দিয়েছে আমাদের দু'জনকে। ওদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারী। রাতে তোমাকে বলেছিলাম।

: ক'টার সময় যাবার কথা?

ঃ চারটায়।

ঃ ঐ সময় তো আমি থাকব টঙ্গী। ছ'টা পর্যন্ত ফিল্ডে কাজ।

ঃ একদিন না গেলে হয় না?

ঃ আরে না। গেলে হবে কেন?

ঃ আমি একাই যাব?

ঃ যদি যেতেই হয় একা যাও। কিংবা রফিককে বলো পৌঁছে দেবে।

নীলু কিছু বলল না। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল সফিক হয়ত যেতে রাজি হবে। অনেকদিন তারা একসঙ্গে কোথাও যায় না। রাতে দাওয়াতের কথা শুনে হাই তুলে বলেছিল, আচ্ছা দেখি। তার মানে যাওয়া যেতে পারে। এখন মনে হচ্ছে আচ্ছা, দেখির মানে—সম্ভব না। নীলু ঘরের কাজ শেষ করতে লাগল। একাই যাবে সে। এবং ফিরবে সন্ধ্যা পার করে। এমন দেরী করবে যাতে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়।

.মনোয়ারা দাঁত দেখাতে সেই সকালে গিয়েছেন, এখনো ফেরেননি। এটাও একটা চিন্তার ব্যাপার। কোন ঝামেলা হয়েছে কিনা কে জানে। এত দেরী হবার তো কথা নয়।

নীলু রান্না শেষ করে ময়লা কাপড় ধুতে ঢুকল বাথরুমে। যেদিনই সে কাপড় ভেজায় সেদিনই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। শাশুড়ী চেঁচামেচি করতে থাকেন, দিনক্ষণ দেখে কাপড় ভিজাতে পার না? এ কি বিশ্রী অভ্যাস তোমার বৌমা, বৃষ্টিবাদলা ছাড়া তুমি কাপড় ধুতে পার না! এক কথা কতবার করে বলব তোমাকে?

আজ অবশ্যি বৃষ্টি হবে না, কড়া রোদ উঠেছে। ঘন্টা দুয়েক এরকম থাকলে সব কাপড় শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাবে।

বালতিতে ভেজা কাপড় নিয়ে নীলু ছাদে গেল। আনিস ছাদে হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট টানছিল। নীলুকে আসতে দেখেই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল। নীলু বলল, যাদুকরের খবর কি?

কোন খবর নেই ভাবী। রান্না চড়িয়েছি।

কি রান্না আজ?

ভাত আর ডিম ভাজা।

রোজ রোজ ডিম ভাজা খেতে অরুচি লাগে না?

না। কাপড় আমার কাছে দিন ভাবী, আমি মেলে দিচ্ছি।

তোমায় মেলতে হবে না। এটা মেয়েদের কাজ।

মেয়েদেব কাজ বলে আলাদা কিছু আছে?

আছে। এখনো আছে। তোমার ম্যাজিক কেমন চলছে?

ভালই চলছে ভাবী। এখন পামিং শিখছি।

কি শিখছ?

পামিং। অর্থাৎ হাঁতের তালুতে লুকিয়ে রাখার কৌশল।

এইসব কৌশল আমরা কবে দেখতে পাব?

খুব শিগগীরই পাবেন।

ঃ পি. সি. সরকার হচ্ছ তাহলে?

ঃ হাঁ ভাবী। আপনি হাসছেন—আমি কিন্তু সত্যি সত্যি হব।

ঃ নিশ্চয়ই হবে। হবে না কেন? সেদিন আমরা সবাইকে বলব যাদুকর আনিস সাহেবকে আমরা ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। তিনি আমাদের দোতলার চিলেকোঠায় থাকতেন।

ঃ ভাবী, আপনি মনে মনে হাসছেন।

ঃ না ভাই, হাসছি না।

সফিকের অফিস মাতাবলে—বিটা ফার্মাসিউটিক্যালস এণ্ড ইনসেকটিসাইড। নেদারল্যাণ্ডের একটা ওষুধ তৈরীর কারখানা। মূল কারখানাটি তেজগাঁয়। এখন সেটি আরো বাড়ানো হচ্ছে, টঙ্গীতে নতুন একটি কারখানা হচ্ছে।

বিদেশী কোম্পানীগুলোতে যেমন সাহেবী কায়দাকানুন থাকে, এখানে সে রকম নয়। দেশীয় অফিসগুলির মতই ঢিলাঢালা ভাব, স্যারেনসেন হচ্ছে একমাত্র বিদেশী। বাংলাদেশে কোম্পানীর বড় কর্তা। স্যারেনসেনের বাড়ি নরওয়েতে, পড়াশোনা করেছে ফ্রান্সে। ইংরেজী ভাল বলতে পারে না।

বিদেশীদের সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে এরা অত্যন্ত কর্মঠ। সময় সম্পর্কে সচেতন। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না—ইত্যাদি। স্যারেনসেনের সঙ্গে তার কোনটাই মিলে না। লোকটি মহা ফাঁকিবাজ। কাজ কিছুই বোঝে না। অকারণে চেঁচায়।

সফিক অফিসে ঢুকেই শোনে সাহেব খুব রেগে আছে। সবাইকে বকাবকি করছে। সফিক অবাক হয়ে বলল—কেন?

ঃ কে জানে কেন? কয়েকবার আপনার খোঁজ করেছে। যান স্যার, দেখা করে আসেন।

সফিক ঘরে ঢুকতেই সাহেব চেঁচিয়ে উঠল, কি ব্যাপার সফিক, এত দেরী কেন?

ঃ দেরী না, তুমিই চলে এসেছ সকাল সকাল। মনে হচ্ছে তুমি কোন কারণে আপসেট।

ঃ আপসেট হব না? তুমি পড়ে দেখ হল্যাণ্ডের হোম অফিস থেকে কি লিখেছে।

ঃ কি লিখেছে?

আহ্, পড়তে বলছি পড। জিজ্ঞেস করছ কেন?

এমন মেজাজ খারাপ করার মত কোন চিঠি নয়। হেড অফিস জানতে চেয়েছে লট নং ৩৭২-এর স্যাম্পল কেন এখনো পাঠানো হয়নি। র‍্যানডম স্যাম্পলিং করা হচ্ছে না এবং আনুষঙ্গিক অন্য কাজও আটকে আছে কাজেই ....।

ঃ সফিক বলল, স্যাম্পল যথাসময়ে পাঠানো হয়েছে। শিপমেন্টের ঝামেলায় হয়ত পৌঁছেনি। এই নিয়ে আপসেট হওয়ার কিছুই নেই।

ঃ পাঠানো হয়েছে?

ঃ নিশ্চয়ই পাঠানো হয়েছে। কাগজপত্র এনে দেখাচ্ছি তোমাকে।

ঃ দেখানোর দরকার নেই। তুমি একটা চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা কর। চিঠিতে লেখা থাকবে এত তারিখে স্যাম্পল শিপমেন্ট করা হয়েছে। তোমরা যদি না পাও আমাদের অবিলম্বে জানাও।

ঃ ঠিক আছে।

ঃ চিঠি না। একটা টেলেক্স করে দাও।

ঃ টেলেক্সই করব।

স্যুরেনসেন মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অমায়িক গলায় বলল—কফি খাবে নাকি?

ঃ না, কফি খাব না।

ঃ টঙ্গীর কাজ কেমন এগুচ্ছে?

ঃ ভালই এগুচ্ছে।

ঃ খুব লক্ষ্য রাখবে। তোমাদের দেশের লোক কিন্তু সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে।

সফিক কিছু বলল না। সাহেব গম্ভীর গলায় বলল, আমার কমেন্ট শুনে আবার মন খারাপ করনি তো?

ঃ না।

ঃ গুড। শোন সফিক, আজ আমি একটু সকাল সকাল ঘরে ফিরব। কাজেই আমাকে দিয়ে কোন সই-টই করাবার থাকলে করিয়ে নিও।

ঃ ঠিক আছে। আমি তাহলে যাই এখন?

ঃ যাও।

সফিক তার নিজের ঘরে ঢুকল। তার পদ হচ্ছে ম্যানেজারের। ম্যানেজার, এডমিনিস্ট্রেশন। তবে সে গত ছ'মাস ধরে জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছে। আগের জেনারেল ম্যানেজার ইংল্যাণ্ডের মিঃ রেভার্স টনির সঙ্গে বড়কর্তার খিটিমিটি চলছিল বহুদিন থেকে। গত ক্রীসমাসে সেই খিটিমিটি চরমে উঠেছে এবং রেভার্স সাহেব একদিন অফিসে এসে বড় সাহেবকে যে কথাগুলি বলল তার বাংলা অর্থ হচ্ছে, তোমার অফিস এবং কারখানা তুমি তোমার পশ্চাৎদেশে প্রবেশ করিয়ে বসে থাক, আমি চললাম। সাহেবরাও নোংরা কথা আমাদের মতই গুছিয়ে বলতে পারে।

বড় সাহেব এক সপ্তাহ গম্ভীর হয়ে রইল। প্রতি সন্ধ্যায় সাত আট পেগ হুইস্কি খেয়ে পুরোপুরি আউট হবার চেষ্টা করতে লাগল। সেটা সম্ভব হল না। অ্যালকোহল তাঁকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। এক সপ্তাহ পর জেনারেল ম্যানেজার হারানোর দুঃখ তার অনেকটা কমে এল। সে সফিককে ডেকে বলল, তুমি জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে নাও। আমি দশদিনের মধ্যে হেড অফিস থেকে অর্ডার আনিয়ে দিচ্ছি। বৃটিশগুলি হচ্ছে মহা হারামজাদা। টনি কোম্পানীটার বারটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সব ঠিকঠাক করা।

দশদিনের মধ্যে অর্ডার আসার কথা। ছ'মাস হয়ে গেল অর্ডারের কোন খোঁজ নেই। যখনই কোন রকম ঝামেলা উপস্থিত হয়, বড় সাহেব সফিককে ডেকে বলে, ব্যাপারটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ট্যাকল কর সফিক, আমি হেড অফিসে টেলেক্স করছি। কেন তারা তোমাকে এখনো কনফার্ম করছে না? এরা পেয়েছেটা কি? এভাবে কোন আন্তর্জাতিক কোম্পানী চলে, না চলা উচিত?

অফিসে সফিকের অবস্থা একটু অস্বস্তিকর। সিদ্দিক সাহেব হচ্ছেন তাব দু'বছরের সিনিয়ার। আগে ছিলেন প্রডাকশন ম্যানেজার। বছরখানেক আগে তাঁকে ঢাকা হেড

অফিসে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাঁকে ডিঙিয়ে জেনারেল ম্যানেজার হওয়াটা তিনি সুনজরে দেখছেন না। সফিকের বিরুদ্ধে বেশ জোরালো একটি দলও তাঁর আছে। তাঁর আচার-আচরণে সেটা কখনো বোঝা যায় না। সিদ্দিক সাহেব অত্যন্ত মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। সবার সঙ্গেই প্রচুর রসিকতা করেন।

সফিক তার ঘরে বসামাত্রই সিদ্দিক সাহেব ঢুকলেন। এবং তাঁর স্বভাবমত বললেন, তারপর জি এম সাহেব, হোয়াট ইজ নাউ? সাহেবকে ঠাণ্ডা করেছেন?

ঃ হুঁ, এখন ঠাণ্ডা।

ঃ আসলে এই কোম্পানীতে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করা দরকার, যে পোস্টের কাজই হবে সাহেবকে ঠাণ্ডা রাখা।

সফিক কিছু বলল না। সিদ্দিক সাহেব বললেন, আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে। দুঃসংবাদটা দিতে এলাম।

ঃ কি দুঃসংবাদ?

ঃ হিস্টোলিনের একটা নতুন ব্যাচের কাজ শুরু হয়েছে। প্রডাকশন ম্যানেজার জানিয়েছেন এই ব্যাচটা নষ্ট হয়েছে। প্রায় এক লাখ টাকা নর্দমায় ফেলা হল।

সিদ্দিক সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। যেন তাঁর কিছুই যায় আসে না। সফিক উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, ব্যাচ বাতিল করা হয়ে গেছে ?

ঃ না, এখনো হয়নি। তবে বাতিল করা ছাড়া উপায় নেই। ইমালসিফায়ার নেই। কাজ যখন শুরু করা হয় তখন জানা গেল ইমালসিফায়ার নেই।

ঃ সে কি? আগে জানা যায়নি?

ঃ স্টোর বলেছিল আছে। সেই ভরসাতেই শুরু করা হয়েছিল। মাঝপথে বলা হল নেই।

সফিক উঠে দাঁড়াল। সিদ্দিক সাহেব বললেন, যাচ্ছেন কোথায়?

ঃ তেজগাঁয়ে যাই।

ঃ সেখানে গিয়ে করবেন কি?

ঃ খোঁজ নেই কি হচ্ছে। অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা দেখি।

ঃ কোথায় পাবেন? আর পেলেও সেটা ব্যবহার করা যাবে না' কোম্পানীর দেয়া নিজস্ব জিনিস ব্যবহার করতে হবে। রেগুলেশন নাম্বার সিক্সটিন। কাজেই শান্ত হয়ে বসুন। চায়ের অর্ডার দিন। প্রডাকশন ম্যানেজার, স্টোর ইনচার্জ এবং চিফ কেমিস্টকে ডেকে পাঠান। লিখিত রিপোর্ট দিতে বলুন। হেড অফিসে টেলেক্স পাঠান।

সফিক কপালের ঘাম মুছল। হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে। সিদ্দিক সাহেব বললেন, আপনার টেলিফোন করবার দরকার নেই, আমি ইতিমধ্যেই টেলিফোন করেছি। এবং ওরা খুব সম্ভব রওনাও হয়ে গেছে।

ঃ বড় সাহেবকে খবর দেয়া দরকার।

সিদ্দিক সাহেব অলস ভঙ্গিতে বললেন—তা দরকার। তবে এখন খবর না দেয়াই ভাল। বড় সাহেব ব্যস্ত আছেন। ডিকটেশন দেবার জন্যে মিস রীতাকে ডেকেছেন।

সিদ্দিক সাহেব মুচকি হাসলেন। বড় সাহেব মাঝেমধ্যেই ডিকটেশন দেবার জন্য মিস রীতাকে ডেকে নেন নিজের কামরায়। তখন দরজা বন্ধ থাকে। এবং কিছুক্ষণ পর পর মিস রীতার খিলখিল হাসি শোনা যায়।

মিস রীতা গোমেজ এখানকার রিসিপশনিস্ট। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হলেও এখনো চমৎকার শরীরের বাঁধনী। চেহারায় স্নিগ্ধ ভাব আছে। খুবই আমুদী মেয়ে। বড় সাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে হবে যাবে এরকম একটা গুজব অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে।

সফিকের দিন শুরু হল খুবই খারাপভাবে। বড় সাহেবের সঙ্গে কোন কথা হল না। তিনি জানিয়ে দিলেন আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। অফিসের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে চান না।

দুপুর বেলা সফিক রাজশাহী থেকে শাশুড়ীর একটি চিঠি পেল। তাকেই লেখা।

"বিলুর একটি ছেলে হইয়াছে গত বুধবারে রাত আটটায়। ছেলে ভাল আছে। কিন্তু বিলুর অবস্থা খুবই খারাপ। তাহাকে রাজশাহী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। বেশ কয়েকবার রক্ত দেওয়া হইয়াছে। বাবা, তুমি কি নীলুকে সঙ্গে নিয়া একবার আসিবে? আমার মন বলিতেছে বিলুর দিন ফুরাইয়াছে.....,"

বিরাট চিঠি। সফিক চিঠি হাতে দীর্ঘ সময় চেয়ারে বসে রইল। নীলুকে আজ রাতের কোচেই পাঠানো দরকার। সঙ্গে কিছু টাকাপয়সাও দিয়ে দেয়া দরকার। টাকার জোগাড় করা যায় কিভাবে?

বন্যার বাসা খুঁজে বের করতে বেশী ঝামেলা হয় না। সুন্দর ছিমছাম ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট। বসার ঘরে বেতের সোফা। দেয়ালে জলরঙ ছবি। মুগ্ধ হবার মত সাজসজ্জা। নীলু মুগ্ধ হয়ে গেল।

ঃ সুন্দর সাজিয়েছিস বন্যা।

ঃ আমি সাজাইনি। ও সাজিয়েছে। এসবদিকে আমার ঝোঁক নেই।

ঃ আর সব গেস্ট কোথায়?

ঃ তোকে এবং তোর বরকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি। তাও তুই এলি একলা। এটা ভালই হল। আমার বরের সঙ্গেও আমার ঝগড়া হয়েছে। ও সকালবেলা ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমরা দু'জনে মিলে গল্প করব। রাতে ভাত খেয়ে তারপর যাবি।

ঃ ঝগড়াটা হয়েছে কি নিয়ে?

ঃ রেগুলার ফিচার। পার্সোনিলিটি ক্ল্যাশ। ও চায় আমার বাচ্চাকাচ্চা হোক। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি ঘর-সংসার করি।

ঃ তুই বাচ্চাকাচ্চা চাস না?

ঃ এখন চাই না। ও চাইলেই আমাকে বাচ্চা পেটে ধরতে হবে নাকি? পুরুষদের কথামত সারা জীবন চলব আমরা? আমাদের কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই? আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি?

ঃ তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন?

ঃ রাগব না কেন? নিশ্চয়ই রাগব। মেয়ে হয়েছি বলে কি আমরা মানুষ না? বাদ দে এসব. তোর কথা বল। বরকে নিয়ে এলি না কেন?

ঃ ওর কি যেন কাজ পড়েছে। টঙ্গী যেতে হবে।

ঃ আর তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস? তোকে বুঝ দেয়ার জন্যে বলা। কাজ-টাজ কিছুই না। স্ত্রীদের কারণে কিছু করবে না, এটা হচ্ছে পুরুষদের মটো। ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি।

ঃ সমগ্র পুরুষ জাতিটার উপর তুই রেগে আছিস।

ঃ তা আছি। তুই বোস, চা বানিয়ে আনি। রাতে কি খাবি বল?

ঃ রাতে কিছু খাব না। একা একা এতদূর যেতে পারব না।

ঃ একা যেতে হবে না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

ঃ ভয় করবে না তোর?

ঃ আমার এত ভয়-টয় নেই।

ঃ খুব সাহস তোর!

ঃ হ্যাঁ, খুব। একজন পুরুষ যদি রাত দশটায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারে তাহলে একজন মেয়েও পারে।

ঃ থাক এত সাহস দেখানোর দরকার নেই।

বাসায় ফিরতে ফিরতে নীলুর সন্ধ্যা হয়ে গেল। বন্যা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, নীলু রাজি হয়নি। বন্যার স্বামী জহুর সাহেব চলে এসেছেন ততক্ষণে। বন্যা তাকেই বলল—তুমি নীলুকে পৌঁছে দাও না। বেচারী একা একা যেতে ভয় পায়। একটা বেবীটেক্সী নিয়ে চলে যাও।

কি সর্বনাশের কথা! অচেনা পুরুষমানুষের সঙ্গে সে বাসায় ফিরবে? নীলু আঁৎকে উঠে বলেছে, কিচ্ছু লাগবে না, আমি চলে যেতে পারব।

ঃ ঠিক তো?

ঃ হুঁ, ঠিক।

ঃ ভয় পাবিনে তো?

ঃ না।

নীলু ভয় পায়নি। তার মতো একা একা অনেক মেয়েই যাচ্ছে। তাছাড়া মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাসার কাছাকাছি এসে মনে হল সফিক খুব রাগ করবে। শুধু সফিক না, তার শাশুড়ীও রাগ করবেন। আর শাশুড়ীর রাগ মানেই হচ্ছে--ভূমিকম্প। কি যে অবস্থা হবে কে জানে?

কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কিছু বলল না। সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরা যেন তেমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সফিক বলল, তাড়াতাড়ি একটু গোছগাছ করে নাও নীলু, নাইট কোচে রাজশাহী যাবে। তোমার বোনের শরীর ভাল না।

নীলু আতঙ্কিত স্বরে বলল, মারা গেছে?

ঃ না, না। চিঠি পড়ে দেখ। অবস্থা ভাল না, তবে বেঁচে আছেন। তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, রফিক তোমার সঙ্গে যাবে।

ঃ টুনী, টুনী?

ঃ টুনী থাকবে এখানেই। অসুবিধা হবে না। তুমি যাও।

ঃ বিলু আপা বেঁচে আছে তো?

ঃ বললাম না, ভালই আছেন। চিঠিটা পড়ে দেখ, চিঠিতেই সব লেখা আছে। তেমন খারাপ হলে টেলিগ্রামই আসত। আসত না?

সফিকের কথা সত্যি না। বিকাল পাঁচটায় বিলুর মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে। নীলুকে মৃত্যু-সংবাদ দেয়া হবে কি হবে না, এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সফিক খবরটা দিতেই চেয়েছিল। তার মতে খবর না দিলে সে বোনের সঙ্গে দেখা হবার আশা নিয়ে যাবে এবং যখন দেখবে বোন বেঁচে নেই তখন অনেক বড় শক পাবে। সফিকের যুক্তি অন্যদের ভাল লাগেনি।

নীলু চলে যাবার পর সফিকের মনে হল কাজটা ঠিক হল না। তার সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। সে চলে গেলে বিটা ফার্মাসিউটিক্যালস-এর সব কাজ আটকে থাকবে, এই ধারণাটা ঠিক না। কারো জন্যেই কিছু আটকে থাকে না। স্ত্রীর দুঃসময়ে স্বামী পাশে এসে না দাঁড়ানোটা দুঃখজনক। যে কোন স্ত্রী এইটুকু তার স্বামীর কাছ থেকে আসা করতে পারে। এবং আশা করা উচিত।

মনোয়ারা রাতে খাবার সময় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, বউটা না থাকায় বাড়ি খালি খালি লাগছে। বড় খারাপ লাগছে বউমার জন্যে।

এটা তাঁর কথার কথা নয়, তিনি ঠিকমত খেতে পারলেন না। আধ-খাওয়া প্লেট ঠেলে সরিয়ে উঠে পড়লেন। রাতে শোবার সময় হোসেন সাহেবকে বললেন, তোমার ছেলের এমনই রাজকার্য পড়ে গেছে বউটার সঙ্গে যেতে পারল না। যত অপদার্থ আমি পেটে ধরেছি। এই অপদার্থগুলির কপালে দুঃখ আছে।

হোসেন সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তুমি সফিককে বললে না কেন সঙ্গে যেতে?

ঃ কেন আমি বলব? এটা সে নিজে কেন বুঝে না? দু'টা পয়সা রোজগার করে সে কি ভেবেছে? সবার মাথা কিনে নিয়েছে? লাট সাহেব হয়ে গেছে?

এয়ারপোর্টে সাব্বিরকে রিসিভ করবার জন্যে শারমিন একা এসেছে। রহমান সাহেবের সঙ্গে আসার কথা, শেষ মুহূর্তে তিনি মত বদলালেন, তুমি একাই যাও মা। ড্রাইভারকে বলে দাও একটা ফুলের তোঁড়া নিয়ে আসতে। সাব্বির পছন্দ করবে।

ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করতে শারমিনের লজ্জা করছিল। ফুল-টুল নিয়ে আর কেউ আসেনি। সে একাই এসেছে। অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। কি ভাবছে তারা মনে মনে কে জানে।

ন'টার সময় প্লেন আসার কথা, সেটা এল এগারোটায়। কাস্টমস সেরে বেরুতে বেরুতে সাব্বিরের দু'টো মত বেজে গেল। সাব্বিরের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে। শীতের দেশ থেকে আসছে বলেই বোধহয় লালচে ভাব গালে। মাথাভর্তি চুল এলোমেলো হয়ে আছে। তার আচার-আচরণে একটা ছটফটে ভাব আছে। শারমিনকে স্বীকার করতেই হল সাব্বির অত্যন্ত সুপুরুষ। এরকম সুপুরুষদের পাশে দাঁড়াতে ভাল লাগে।

শারমিন হাসি মুখে বলল, এই নিন আপনার ফুল।

ঃ ফুল? ফুল কি জন্যে?

ঃ এতদিন পর দেশে ফিরছেন তাই।

সাব্বির ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল, আমার দেশের বাড়ি থেকে কেউ আসেনি? কাউকে তো দেখছি না? চিঠি দিয়েছি টেলিগ্রাম করেছি, হোয়াট ইজ দিস?

শারমিন কিছু বলল না। সাব্বিরের দেশের বাড়ির কাবোর সঙ্গে তার পরিচয়নেই। দেশের বাড়িতে সাব্বিরের তেমন কেউ নেইও। এক চাচা আছেন যিনি তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন। বড এক বোন আছেন, জামালপুরে তাঁর সঙ্গে শারমিনের কয়েকবার দেখা হয়েছে। তিনি এয়ারপোর্টে আসেননি। এলে দেখা হত।

সাব্বিব বলল--মা আসেননি?

ঃ না, উনি ঢাকায় নেই।

কোথায়?

ঃ জামালপুবে মেয়ের কাছে আছেন।

ঃ জামালপুবে কবে গেলেন? আমি তো কিছু জানি না।

ঃ গতমাসে গিয়েছেন।

সাব্বির অত্যন্ত বিরক্ত হল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তুমি দাঁড়াও তো এখানে। আমি খুঁজে দেখি। আছে হয়ত কেউ। এতদিন পব আসছি, কেউ আসবে না?

সাব্বির খুঁজতে গিয়ে আধ ঘন্টার মত দেরী করল। ফিরে এল মুখ কালো করে। কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না। শারমিন বলল, চলুন যাওয়া যাক।

ঃ কোথায় যাব?

ঃ আমাদের বাসায়, আর কোথায়?

ঃ না, প্রথম যাব ঝিকাতলা। মা কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে আসি।

সাব্বিরের মাকে পাওয়া গেল না। তার ছোট মামার কাছে জানা গেল তিনি জামালপুবে। ছোট মামা সাব্বিরেব প্রসঙ্গে কোন বকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। সাব্বির বলল, আমি আসব আপনি জানতেন না?

ঃ জানতাম।

ঃ আমি তো আশা করেছিলাম এয়ারপোর্টে আপনাকে দেখব।

ছোট মামা মুখ কালো করে বললেন, নিজের যন্ত্রণায় অস্থির। ছোট মেয়ের ডায়রিয়া। মহাখালি নিয়ে গিয়েছিলাম। তুই হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খা।

সাব্বির সেসব কিছুই করল না। বিরক্ত মুখে বের হয়ে এল। শারমিন বলল, এবার কি যাবেন আমার সঙ্গে?

ঃ হুঁ, যাব। তোমাদের ওখানে চা খেয়ে রওনা হব জামালপুর। জামালপুর যাবার সবচে ভাল বুদ্ধি কি?

ঃ ট্রেনে করে যেতে পারেন। বাই রোডে যেতে চাইলে আমাদের একটা গাড়ি নিয়ে রওনা হতে পারেন। আজই যেতে হবে?

ঃ হুঁ, আজই।

ঃ আপনি এমন ছটফট করছেন কেন?

ঃ কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

ঃ কেন?

ঃ জানি না, কেন?

শারমিন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, বাংলাদেশ কেমন লাগছে?

ঃ বাংলাদেশ দেখলাম কোথায়?

ঃ রাস্তাঘাট তো দেখছেন। কত বড় বড় রাস্তা হয়েছে দেখেছেন?

সাব্বির তার জবাব না দিয়ে মুখ গোমড়া করে বসে রইল। শারমিন বলল, আপনার শরীর ভাল তো?

ঃ হ্যাঁ, ভালই।

ঃ কতদিন থাকবেন?

ঃ বেশি দিন না। এক সপ্তাহ।

ঃ হঠাৎ এমন হুট করে চলে এলেন যে? আপনার তো কথা ছিল আগস্ট মাসে আসার।

ঃ এখানে কি যেন একটা ঝামেলা হচ্ছে, সেটা জানার জন্যে এসেছি।

ঃ কি ঝামেলা?

সাব্বির বিরক্ত স্বরে বলল, দু'শ ডলার করে মাকে প্রতি মাসে পাঠাই। তাঁর একার জন্যে যথেষ্ট টাকা, কিন্তু তারপরেও গতমাসে একটি চিঠি পেলাম যার থেকে ধারণা হয় যে তাঁর টাকা-পয়সার খুব টানাটানি। এর মানে কি? টাকাগুলি যাচ্ছে কোথায়?

ঃ এটা জানার জন্যে একেবারে আমেরিকা থেকে চলে এলেন?

ঃ শুধু এটা না। মা'র শরীর খারাপ। মনে হয়, ঠিকমত চিকিৎসাও হচ্ছে না। সেটাও দেখব।

রহমান সাহেব সাব্বিরকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। প্রথম যেদিন দেখেছিলেন সেদিনই তাঁর তাকে ভাল লেগেছিল। সেই ভাল-লাগা পরবর্তী সাত বছরে ক্রমেই বেড়েছে। তাঁদের প্রথম পরিচয়-পর্বটি বেশ নাটকীয়।

রহমান সাহেব সবে অফিসে এসে বসেছেন। তাঁর সেক্রেটারী বলল, একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘন্টাখানিক ধরে বসে আছে।

ঃ কি চায়?

ঃ আমাকে বলছে না।

রহমান সাহেব ছেলেটিকে আসতে বললেন। নিশ্চয়ই চাকরি-প্রার্থী। প্রতিদিনই বেশ কিছু এ ধরণের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়।

অত্যন্ত সুদর্শন একটি ছেলে ঢুকল। এবং সে কোন রকম ভণিতা না করে বলল, আমার নাম সাব্বির আহমেদ। আমি এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাটিসটিক্‌স-এ এম. এ. পাশ করেছি। আপনি কি দয়া করে আমার মার্কশীটটা দেখবেন?

ঃ কোন চাকরির ব্যাপার?

ঃ জ্বি না, কোন চাকরির ব্যাপার নয়।

ঃ ব্যাপারটা কি?

ঃ আপনি আগে দেখুন। তারপর বলব।

রহমান সাহেব দেখলেন। অনার্স এবং এম. এ. দু'টিতেই প্রথম শ্রেণী।

ঃ আপনার তো চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

ঃ না, আমার কোন অসুবিধা নেই। আমি অন্য ব্যাপারে এসেছি।

ঃ বলুন, শুনি।

ঃ আমি আমেরিকান একটি ইউনিভার্সিটি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব আইওয়াতে টিচিং অ্যাসিসটেন্টশীপ পেয়েছি। সেখানে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়াব, সেই টাকায় পি-এইচ-ডি করব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমি অত্যন্ত দরিদ্র। আমার আত্মীয়-স্বজনরাও দরিদ্র। আমেরিকায় যাবার জন্যে আমার ত্রিশ হাজাব টাকার মত দরকার।

ঃ আপনি চাচ্ছেন এই টাকাটা আমি আপনাকে দিয়ে সাহায্য করি?

ঃ ধার হিসেবে চাচ্ছি।

ঃ এত লোক থাকতে আমার কাছে এসেছেন কেন ?

ঃ শুধু আপনার কাছে নয়, আরো অনেকের কাছেই গিয়েছি। আমি একুশজন ইণ্ডাস্ট্রিয়েলিস্টের একটি লিস্ট করেছি। ঠিক করেছি এঁদের সবার কাছেই যাব।

ঃ লিস্টটা দেখতে পারি?

ঃ নিশ্চয়ই পারেন।

সাব্বির লিস্টি বের করে দিল।

ঃ আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির চিঠিটি সঙ্গে আছে?

ঃ হ্যাঁ আছে। বেজিস্ট্রারের চিঠি।

রহমান সাহেব চিঠিটা মন দিয়ে পড়লেন। শান্ত স্বরে বললেন, ওরা আই টুয়েন্টি পাঠিয়েছে?

ঃ জ্বি, পাঠিয়েছে।

ঃ ভিসা হয়েছে?

ঃ হ্যাঁ হয়েছে।

ঃ পাসপোর্টটা দেখাতে পারেন?

ঃ পারি।

সাব্বির পাসপোর্ট বের করল। মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা। রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, টিকেটের টাকা জোগাড় না করেই ভিসা করেছেন?

ঃ হ্যাঁ করেছি, কারণ টাকার ব্যবস্থা হবেই।

রহমান সাহেব শান্ত স্বরে বলেলন, ক্যাশ দেব, না চেক কেটে দেব?

ঃ ক্যাশ হলে ভাল হয়।

তিনি ক্যাশিয়ারকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে বললেন। সাব্বির বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখাল না। যেন এটা তার প্রাপ্য। রহমান সাহেব তাকে বাড়তি কোন ফেভার করছেন না।

আমেরিকা যাবার আগে সে দেখা করতে পর্যন্ত এল না। ছ'মাস পর ইউ এস ডলারে সাব্বির টাকাটা শোধ করল। সেই সঙ্গে চমৎকার একটি চিঠিও লিখল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বড়লোকদের প্রতি আমার এক ধরণের ঘৃণা আছে। সারাজীবন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম বলেই হয়ত। এখন বুঝতে পারছি ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাল মানুষ আছেন। আপনার অনুগ্রহের কথা আমি মনে রাখব। টাকাটা পাঠানোর আগে আমি আপনাকে লিখিনি, কারণ আমি এক ধরণের হীনমন্যতায় ভুগছিলাম। আশা করি, আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন।

বিনীত
সাব্বিব

দু'বছরের মাথায় সাব্বির দেশে এল। রহমান সাহেবের জন্যে প্রচুর উপহার নিয়ে এল। সাব্বিরের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ হল তখন। পি এইচ. ডি. শেষ করে আবার সে দেশে এল। শারমিনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হল সেই সময়। শারমিন তখন মাত্র কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে।

দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে দু'টো বেজে গেল। খাবার টেবিলে সাব্বির খুব গম্ভীর হয়ে রইল। রহমান সাহেব বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

ঃ কোন্ পরিকল্পনার কথা বলছেন?

ঃ আমেরিকাতেই থাকবে, না দেশে আসবে?

ঃ দেশে আসব। আমেরিকায় থাকব কেন? পোস্ট ডক শেষ করে ফিরব। এখানকার ইউনিভার্সিটিতে সহজেই আমার চাকরি হবার কথা।

ঃ অনেকেই তো ফিরতে চায় না।

ঃ আমি চাই। বিদেশের জন্যে আমার কোন মোহ নেই।

শারমিন বলল, আপনি এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন, আস্তে আস্তে খান।

ঃ দেরী হয়ে যাচ্ছে। জামালপুর যেতে হবে তো।

ঃ আজ না গেলে হয় না?

ঃ আমার হাতে সময় বেশী নেই। আজই যাব। বাসে করে চলে যাব।

রহমান সাহেব বললেন, বাসে যেতে হবে না। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, ও তোমাকে নিয়ে যাবে। তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে রওনা হলেই হবে, তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।

সাব্বিরকে বিশ্রামের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হল না। যেন এই মুহূর্তে তার রওনা হওয়া দরকার। শারমিন বলল, আপনি কি সব সময়ই এমন ছটফট করেন?

ঃ তা করি।

ঃ এরকম ভাব করছেন যেন দু'মিনিটের মধ্যে আপনার গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। আপনি আরাম করে বসুন তো, আমি চা এনে দিচ্ছি। শান্ত হয়ে চা খান।

ঃ চা আন। আমি বসছি শান্ত হয়ে।

ঃ আর শুনেন সাব্বির ভাই, আপনি তো গাড়ি চালাতে জানেন?

ঃ জানি। কেন?

ঃ আপনি আবার বাহাদুরি করে গাড়ি চালাতে যাবেন না। যা ছটফটে স্বভাব আপনার, এ্যাকসিডেন্ট করবেন।

সাব্বির হেসে ফেলল এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল—শারমিন, তুমিও চল না আমার সঙ্গে, মা খুব খুশী হবে।

শারমিন হকচকিয়ে গেল।

ঃ গাড়ি যখন যাচ্ছে তখন তো অসুবিধা হবার কথা নয়।

ঃ না না, আমি এখন যাব না।

ঃ কেন, অসুবিধাটা কি?

শারমিন কি বলবে ভেবে পেল না। সাব্বির বলল—গল্প করতে করতে যাব, তোমার ভালই লাগবে।

ঃ চট করে রেডি হওয়া যাবে না। তৈরী হতেও সময় লাগবে।

ঃ বেশ তো, না হয় কাল সকালে যাই। তৈরী হবার সময় পাবে। পাবে না?

শারমিন বিব্রত স্বরে বলল—আমি এখন যাব না সাব্বির ভাই।

ঃ কেন?

ঃ আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

সাব্বিরকে দেখে মনে হল তার আশাভঙ্গ হয়েছে। যেন সে ধরেই নিয়েছিল শারমিন যাবে।

বিকেলে শারমিনের নিজেরও কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগতে লাগল। মনে হল--গেলেই হত। যার সঙ্গে সারাজীবন কাটানো হবে তার সঙ্গে বিয়ের আগে কিছু সময় কাটানোয় এমন কোন মহাভারত অশুদ্ধ হত না। নাকি হত?

শারমিন বাগানে বেড়াতে গেল।

মার্টি বড়ই গাছের নিচে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। সারা গা কাদায় মাখামাখি।

ঃ এই মার্টি, তোর এ কি অবস্থা?

মার্টি শুয়ে রইল, ছুটে এল না। ওর শরীর ভাল নেই। শরীর ভাল থাকলে এভাবে শুয়ে থাকতে পারত না। ডাকামাত্র ছুটে আসত। শারমিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল—জয়নাল, জয়নাল!

জয়নাল অল্প কিছুদিন হল চাকরিতে যোগ দিয়েছে। তার আসল কাজ হচ্ছে, মার্টির দেখাশোনা। একটি কুকুরকে দেখাশোনার কাজ তার কাছে খুব অপমানজনক মনে হয়েছে

বলেই বোধহয় সে কখনো মার্টির ধারেকাছে থাকে না। আজও ছিল না। শারমিনের গলা শুনে ছুটে এল।

ঃ মার্টিকে গোসল করিয়েছিলে?

ঃ জ্বি আফা।

ঃ ওর গা এত ময়লা কেন?

ঃ কাদার মইধ্যে খালি গড়াগড়ি করে। কি করমু আফা।

ঃ যাও, আবার ওকে পরিষ্কার কর। মার্টি উঠে আয়।

মার্টি উঠে এল না। ঝিমুতে লাগল। জয়নাল বলল—এ আর বাঁচব না আপা।

ঃ বুঝলে কি করে?

ঃ লেজ নাইম্যা গেছে, দেখেন না? লেজ নামলে কুত্তা বাঁচে না।

জয়নালকে খুব উল্লসিত মনে হল। যেন সে একটা সুসংবাদ দিচ্ছে।

ঃ জয়নাল।

ঃ জ্বি, আফা।

ঃ কাল ভোরেই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

ঃ জ্বি, আইচ্ছা।

ঃ খাওয়া-দাওয়া করছে ঠিকমত?

ঃ জ্বি, করতাছে।

ঃ রাতের খাবার কখন দেয়া হবে?

ঃ সাইন্ধ্যাবেলা।

ঃ আমাকে খবর দেবে তখন। আমি দেখব ঠিকমত খায় কি-না।

শারমিনের অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল। মার্টি কি সত্যি সত্যি মারা যাবে? মৃত্যুর পর পশুরা কোথায় যায়? ওদেরও কি কোন স্বর্গ নরক আছে?

শারমিন দোতলায় উঠে গেল। বাড়ি এখন একেবারে খালি। বাবা গিয়েছেন মতিঝিল। কখন আসবেন কোন ঠিক নেই। কি একটা মিটিং না কি আছে। এসব মিটিং শেষ হতে অনেক দেরী হয়। কোন কোন দিন ফিরতে রাত একটা দেড়টা বেজে যায়। আজও হয়ত হবে। শারমিন কিছুক্ষণ একা একা বারান্দায় বসে রইল। কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। সবচে বড় কথা, কিছুই করার নেই।

লাইব্রেরী থেকে একগাদা বই আনা হয়েছে। কোনটাই পড়া হয়নি। মাঝে মাঝে এমন খারাপ সময় আসে, কোন কিছুতেই মন বসে না। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মার্টিকে খাওয়াবার সময় হয়েছে বোধহয়। শারমিন নিচে নেমে এল। এবং অবাক হয়ে দেখল রফিক বসে আছে।

ঃ আরে, তুমি কখন এসেছ?

ঃ প্রায় মিনিট পাঁচেক। দেখলাম দরজা খোলা, আশেপাশে কেউ নেই। চুপচাপ বসে আছি।

ঃ ভাল করেছ। এসো আমার সঙ্গে।

ঃ কোথায়?

ঃ মার্টি সাহেবকে ডিনার দেয়া হবে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।

ঃ কুকুর খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, এত শখ আমার নেই। তুমি খাইয়ে আস। আমি বসছি এখানে।

ঃ অসময়ে হঠাৎ কোত্থেকে এলে?

রফিক গম্ভীর হয়ে বলল—এখানে [illegible] বন্ধুর বাসায় এসেছিলাম, তারপর ভাবলাম এসেছি যখন তখন দেখা করে যাই।

ঃ বাজে কথা বলবে না। এখানে তোমার কোন বন্ধু নেই। তুমি আমার কাছেই এসেছিলে। ঠিক কিনা বল?

রফিক কিছু বলল না। শারমিন বলল—চা খাবে?

ঃ খাব।

ঃ চায়ের সঙ্গে আর কিছু?

ঃ খাব, তবে মিষ্টি না। আমি মিষ্টি খাই না। ঘরে তৈরী সন্দেশও না।

ঃ তোমাকে রোগা লাগছে কেন রফিক?

ঃ ভাবীকে নিয়ে রাজশাহী গিয়েছিলাম। এক সপ্তাহ খুব ছুটাছুটি করেছি। ভাবীর এক বোন মারা গেছে। একটা ছোট্ট ছেলে আছে তার। ছেলেটিকে নিয়ে এমন মুশকিলে পড়েছে সবাই!

ঃ মুশকিল কেন?

ঃ কোথায় রাখবে? কার কাছে রাখবে? এত ছোট বাচ্চার দায়িত্ব কেউ নিতে চাচ্ছে না।

ঃ বল কি?

ঃ দ্যাট্‌স ফ্যাক্ট। তোমার মার্টির জন্যে নিশ্চয়ই তিন-চারজন লোক আছে। কিন্তু এই বাচ্চাটির জন্যে কেউ নেই।

শারমিন কিছু বলল না। রফিক বলল—রাগ করলে নাকি?

ঃ না, রাগ করিনি। তুমি বস, চা নিয়ে আসছি। দুধ-চা না লেবু-চা?

ঃ আদা-চা। গলা খুসখুস করছে।

রফিক ভেবেছিল মিনিট দশেক গল্প-সল্প করে চলে যাবে কিন্তু সে রাত আটটা পর্যন্ত থাকল। এর মধ্যে যে ক'বারই সে উঠতে চেয়েছে শারমিন বলেছে--আহ্‌, বস না। এত ব্যস্ত কেন?

ঃ রাত হয়ে যাচ্ছে, অনেকদূর যাব।

ঃ যাবার ব্যবস্থা আমি করব। আজ আমার সঙ্গে ভাত খাবে।

ঃ সে কি, কেন?

ঃ কেন আবার কি? খেতে বলেছি তাই খাবে।

ঃ তোমাদের রান্না কি?

ঃ [illegible]

ঃ তোমাদের কখন কি রান্না হয় তা তোমরা জান না?

শারমিন কিছু বলল না।

ঃ খাও কিসে? রূপোর থালাবাটিতে?
ঃ বকবক করবে না। খেতে বসলেই টের পাবে কিসে খাই?
ঃ খাওয়াটা হবে কখন?
ঃ একটু দেরী হবে। বাবুর্চিকে নতুন একটা আইটেম রান্না করতে বলেছি।
ঃ আইটেমটা কি?
ঃ খেতে বসলেই টের পাবে। এখন আমার সঙ্গে এসো, মার্টিকে খাওয়ানো হবে।
ঃ আসতেই হবে?
ঃ হ্যাঁ, আসতেই হবে।

রহমান সাহেব ফিরলেন রাত দশটায়। শারমিন একটি ছেলের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে। এবং কিছুক্ষণ পর পর শব্দ করে হেসে উঠছে। এই দৃশ্যটি তিনি অবাক হয়ে দেখলেন। শারমিন বাবাকে দেখতে পায়নি।

রহমান সাহেব নিঃশব্দে দোতালায় উঠে গেলেন। তাঁর কপালে সূক্ষ্ম কিছু ভাঁজ পড়ল।

মনোয়ারার গাল ফুলে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়েছে।

সারাদিন কিছুই মুখে দেননি। ব্যথায় ছটফট করেছেন। ব্যথা কমানোর কোন ওষুধ কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না।

সবচে মুশকিল হয়েছে হোসেন সাহেবের। তাঁকে দেখামাত্র মনোয়ারার রাগ চড়ে যাচ্ছে। যা মনে আসছে তাই বলছেন। হোসেন সাহেব অনেকক্ষণ সহ্য করলেন। কিন্তু এক সময় স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি থমথমে মুখে বললেন—আমার উপর রাগ করছ কেন? তোমার দাঁতব্যথা তো আমি তৈরী করিনি? সে রকম কোন ইচ্ছা আমার নেই।

মনোয়ারা চোখ মুখ কুঁচকে বললেন—আমার সামনে থেকে যাও তো। শুধু শুধু ভ্যাজ ভ্যাজ করবে না।

ঃ যাবটা কোথায়?
ঃ যেখানে ইচ্ছা যাও। শুধু চোখের সামনে থাকবে না।
ঃ আই সি!
ঃ কি, দাঁড়িয়ে আছ কেন?
ঃ যাচ্ছি, শেষে আফসোস করবে কিন্তু।

হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। নীলু কাপড় ইস্ত্রি করছিল, তাকে গিয়ে বললেন—চললাম মা।

নীলু আশ্চর্য হয়ে বলল—কোথায় চললেন?

তিনি তার জবাব দিলেন না। অনেক সময় নিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগ গুছালেন এবং এক সময় সত্যি সত্যি বেরিয়ে গেলেন।

নীলু খুব একটা বিচলিত হল না। হোসেন সাহেব প্রায়ই এরকম গৃহত্যাগ করেন, ঘন্টা দু'এক রাস্তায় ঘুরাঘুরি করেন এবং এক সময় বাড়ি ফিরে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, হোসেন সাহেবের গৃহত্যাগের কিছুক্ষণের ভেতরেই মনোয়ারার দাঁতের ব্যথার আরাম হল। তিনি এক কাপ লেবু-চা এবং দু'স্লাইস রুটি খেলেন। রাতের বেলা কি রান্না হচ্ছে খোঁজ নিলেন, তারপর শাহানার সঙ্গে ছোটখাট একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন। ঝগড়া বাধানোর ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি বেশ স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোদের রেজাল্ট বেরুতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

শাহানা গম্ভীর গলায় বলল—আমি কি করে বলব এত দেরী হচ্ছে কেন। আমি কি বোর্ডের চেয়ারম্যান ?

মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন—তুই এমন ক্যাটক্যাট করে কথা বলেছিস কেন? একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, ছ্যাঁৎ করে উঠলি? তোর সঙ্গে কি কথাও বলা যাবে না?

শাহানা থমথমে মুখে তাকাল। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন -তোর তেল বেশী হয়েছে। কাজকর্ম নেই তো, শুধু বসে বসে খাওয়া। বসে বসে খেলে এমন তেল হয়ে যায়।

ঃ এরকম বাজে করে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না মা।

ঃ বাজে করে কথা বলব না?

ঃ না।

ঃ কেন? তুই কি রাণী ভিক্টোরিয়া?

ঃ হ্যাঁ, আমি রাণী ভিক্টোরিয়া।

ঃ চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। মুখে মুখে কথা!

শাহানা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। এবং দরজা বন্ধ করে দিল। শাহানার দরজা বন্ধ করা একটা ভয়াবহ ব্যাপার, সহজে এ দরজা সে খুলবে না। ক্রমাগত দু'দিন দু'রাত দরজা বন্ধ রাখার রেকর্ড তার আছে। এ দরজা কবে খুলবে কে জানে।

মনোয়ারা কিছুক্ষণ কাঁদলেন, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন।

নীলু বড় অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। এ বাড়ির সবার এখন মেজাজ খারাপ যাচ্ছে। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে রাগারাগি। নীলুর নিজের মন-মেজাজও ভাল না। এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে তার ভাল লাগে না। কিন্তু মাথা ঘামাতে হয়, এক এক করে সবার রাগ ভাঙ্গাতে হয়। ভাল লাগে না।

সংসারে অভাব-অনটন বাড়ছে। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করা যাচ্ছে না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের লোনের টাকা কাটতে শুরু করেছে। বাড়ি ভাড়া বেড়েছে একশ টাকা। নীলুর ধারণা ছিল খুব সহজেই রফিকের চাকরি হয়ে যাবে। ধারণা ঠিক হয়নি। রফিকের কিছুই হচ্ছে না। সপ্তাহে দু'তিনটা করে ইন্টারভ্যু দিয়ে হাসি মুখে ঘরে ফিরছে-- ভাবী একেবারে মেরে কেটে দিয়েছি।

ঃ তাই নাকি?

ঃ ইয়েস। স্মার্টলি সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। যেখানে হাসার দরকার সেখানে মৃদু হাসলাম। যেখানে গম্ভীর হওয়ার দরকার সেখানে গম্ভীর হলাম।

ঃ পেরেছ সবকিছু?

ঃ এইটি পারসেন্ট পেরেছি। যেগুলি পারিনি সেগুলি পারার কথা নয়।

ঃ চাকরি হবে বলছ?

ঃ একজনের হলেও আমার হবে।

ঃ বল কি?

ঃ দ্যাট্স রাইট। এখন চট করে চা সিগ্রেট খাওয়াও। আমাকে খুশী রাখার চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে লাভ হবে। বেতনের দিন ভাল-মন্দ কিছু পেয়েও যেতে পার।

শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। রফিক নতুন করে ইন্টারভ্যুর জন্যে তৈরী হয়। নীলুর বড় মায়া লাগে। মনোয়ারা রাগারাগি করেন—দুনিয়া সুদ্ধ লোকের চাকরি হয়, তোর হয় না কেন?

ঃ হবে। আমারো হবে।

ঃ কবে সেটা?

ঃ ভেরী সুন। কোন এক সুপ্রভাতে দেখবে রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি এসে হাজির।

ঃ আমি আর দেখে যেতে পারব না।

ঃ এখনো তো পাঁচ মাস হয়নি পাশ করেছি, এরমধ্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?

ঃ যার হয় পাঁচ মাসেই হয়, যার হয় না তার পাঁচ বছরেও হয় না।

চিঠি অবশ্যি একটা আসে রফিকের। রেজিস্ট্রি ডাকে নয়, সাধারণ ডাকে। 'মনসুর আলী কলেজে'র প্রিন্সিপালের চিঠি। ইতিহাসের প্রভাষক-পদে নিয়োগপত্র। যেতে হবে বরিশালের কোন এক গ্রামে।

নীলু জিজ্ঞেস করল—যাবে নাকি?

ঃ যাব না মানে? অফকোর্স যাব।

ঃ থাকতে পারবে গ্রামে?

ঃ খুব পারব। গ্রামের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিসিএস-এর জন্য সিরিয়াস একটা প্রিপারেশন নিয়ে নেব। দেখবে ফার্স্ট সেকেণ্ড কিছু একটা হয়ে বসে আছি।

রফিক মহা উৎসাহে বরিশাল চলে গেল। এবং এক সপ্তাহের মধ্যে মুখ অন্ধকার করে ফিরে এল। সফিক অবাক হয়ে বলল, চলে এলি কেন?

রফিক বিরক্ত হয়ে বলল -আরে দূর, যত ফালতু ব্যাপার। অলরেডি সেখানে একটা ভাল কলেজ আছে। রেষারেষি করে আরেকটা কলেজ দিয়েছে। না আছে মাষ্টার, না আছে ছাত্র। এগারোজন টিচার আছে, এরা গত পাঁচ মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না।

ঃ বলিস কি?

ঃ আমি যাওয়ামাত্র প্রিন্সিপাল আমার জন্যে একটা জায়গীরের ব্যবস্থা করে ফেলল। নাইনে পড়ে এক মেয়ে তাকে পড়াতে হবে। তার বিনিময়ে থাকা খাওয়া। চিন্তা কর অবস্থা।

সফিক কিছু বলল না। রফিক শুকনো মুখে বলল—ঝুলে থাকতাম সেখানেই কিন্তু মেয়ের বাবার কথাবার্তা যেন কেমন কেমন।

ঃ কেমন কেমন মানে?

ঃ ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, মেয়ে বিয়ে দিতে চায় আমার কাছে।

ঃ বলিস কি?

ঃ হ্যাঁ। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম আমাকে ভাই বলত, তারপর বলা শুরু করল—আপনি আমার ছেলের মত।

নীলু বলল—মেয়েটি দেখতে কেমন?

ঃ দেখতে ভালই। বরিশালের মেয়েরা খুব সুন্দর হয়। হাসছ কেন তুমি ভাবী? এর মধ্যে হাসির কিছু নেই। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।

ঃ বিয়ের ভয়েই পালিয়ে এসেছ?

ঃ সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না।

ঃ তুমি ওদের বলে এসেছো তো, নাকি না বলে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছ?

রফিক কোন উত্তর দিল না। পরবর্তী বেশ কিছুদিন কাটাল গম্ভীর হয়ে। নীলু ঠাট্টাটাট্টা করবার চেষ্টা করল—কি রফিক, বরিশাল-কন্যার জন্যে মন খারাপ নাকি?

ঃ একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কি সব ঠাট্টা কর, ভাল লাগে না।

ঃ মেয়েটির দিকে দরদ একটু বেশী বেশী, মনে হচ্ছে।

ঃ স্টপ ইট, ভাবী। প্লীজ।

বিসিএস পরীক্ষাও রফিকের ভাল হল না। ইংরেজী এবং ইতিহাস দু'টার কোনটাতেই নাকি পাশ মার্ক থাকবে না। রফিকের ধারণা এগজামিনররা খাতা দেখে হাসাহাসি করবে। হোসেন সাহেব বললেন—এতটা খারাপ হল কেন?

ঃ বোগাস সব কোশ্চেন করেছে, খারাপ হবে না?

ঃ বিসিএস-এ বোগাস প্রশ্ন করবে কেন?

ঃ করলে তুমি কি করবে বল? সব মাথা-খারাপের দল। ইতিহাসের প্রশ্ন পড়লে মনে হয় জিওগ্রাফীর কোশ্চেন।

ঃ বলিস কি?

ঃ বিশ্বাস না হলে তুমি পড়ে দেখ।

পরীক্ষা খারাপ দিয়ে রফিক খুবই মুষড়ে পড়ল। সে ধরেই নিয়েছিল ভাল করবে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও কমে গেল। নাশতা খেয়ে বেরিয়ে যায় রাত দশটা-এগারোটায় ফিরে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই রেগে যায়। কথাবার্তা যা হয় নীলুর সঙ্গেই। তাও সবদিন নয়, যেদিন মেজাজ ভাল থাকে সেদিন।

নীলু বুঝতে পারে, রফিক হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছে। এটা কাটিয়ে তোলার জন্যে তার কিছু করা উচিত, কিন্তু সে কি করবে বুঝতে পারে না। আগে মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার রফিক টাকা চাইত। এখন আর চাচ্ছে না। চাইতে লজ্জা পাচ্ছে বোধহয়। দিন দশেক আগে হঠাৎ করে চাইল—ভাবী, তোমার সঞ্চয় থেকে কিছু দিতে পারবে?

ঃ কত?

ঃ সামান্য কিছু, ধর পঞ্চাশ।

নীলু একশ টাকা এনে দিল।

ঃ গোটাটা দিলে নাকি ভাবী?

ঃ হুঁ, দিলাম।

ঃ থ্যাংকস। মেনি থ্যাংকস।

ঃ আমাকে থ্যাংকস কেন? তোমার ভাইকে দাও। আমি তো তার ধনেই পোদ্দারী করছি।

ঃ ভাইয়াকেও থ্যাংকস। আমি ভাবী সব লিখে রাখছি। ভেরি সুন তোমাদের সব পয়সা ফেরত দেব, উইথ ইন্টারেস্ট।

ঃ ঠিক আছে, দিও।

ঃ মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই একটা কিছু হবে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ সেভেন্টি পারসেন্ট পসিবিলিটি। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে বলেছে—আপনার মত ইয়াং একটিভ ম্যানদেরই এখন দরকার। নিউ ব্লাড। নিউ আইডিয়া।

ঃ বেতন কেমন?

ঃ ফ্যানটাস্টিক বেতন। বিদেশী কোম্পানী।

ঃ তোমার ভাইয়েরটাও তো বিদেশী কোম্পানী। বেতন তো এমন কিছু না।

ঃ কোম্পানীতে কোম্পানীতে বেশকম আছে ভাবী।

ঃ তোমাদেরটা খুব রমরমা কোম্পানী বুঝি?

ঃ খুবই রমরমা। গাড়ি এসে দিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে।

ঃ বল কি!

ঃ কোম্পানীর নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। থ্রি-বেড রুম। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।

ঃ ফ্ল্যাট দেখে এসেছ ?

ঃ না, আমি দেখিনি। ঐ অফিসের অন্য অফিসারের সঙ্গে আলাপ হল। সবাই বেশ মাইডিয়ার।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হুঁ। বেশ কয়েকজন মহিলা আছেন। বড় বড় পোস্টে। বুঝলে ভাবী, মেয়েদের জন্যে আজকাল চাকরির সুবিধা। তুমি যদি চেষ্টা কর, উইদিন টু মানথ একটা কিছু জুটিয়ে ফেলতে পারবে।

ঃ সত্যি ?

ঃ ইউ বেট! বি.এ. পাশ আছ। দেখতে শুনতেও মোটামুটি খারাপ না। চলে যায়।

ঃ চলে যায় মানে?

ঃ ডানাকাটা পরী তুমি নও ভাবী। এরকম কোন মিসকনসেপশন থাকা উচিত না। তবে দেখতে খারাপও না।

নীলু হেসে ফেলল। রফিক সিগারেট ধরিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলল—আমার কথা শোন ভাবী, চাকরির চেষ্টা কর। এই যুগে একার রোজগারে কিছু হয় না। দু'জনে মিলে হাল ধর।

ঃ তোমার ভাই পছন্দ করবে না।

ঃ এরমধ্যে পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই। কোশ্চেন অব সারভাইভেল।

চাকরির ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন থেকেই নীলু ভাবছে। বন্যা গতমাসে এসেছিল। তাকে এক সময় বলেই ফেলেছে—তুই বলেছিলি আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিবি। চাকরি জুটিয়ে দিবি। মনে আছে?

ঃ মনে থাকবে না কেন? করতে চাস?

ঃ হুঁ। কি রকম চাকরি?

ঃ মোটামুটি ধরণের একটা কিছু, তোকে তো আর ফস করে ক্লাস ওয়ান অফিসার বানিয়ে ফেলবে না।

ঃ কেরানীর চাকরি?

ঃ অসুবিধা আছে? দেড় দু'হাজার টাকা পাবি সব মিলিয়ে। এই বাজারে এটাই বা মন্দ কি? করবি ? তাহলে আগামী সোমবার আয় আমার অফিসে। আমি কথা বলে রাখব।

ঃ কার সঙ্গে কথা বলবি?

ঃ লোক আছে। তুই আয় তো!

নীলু সোমবারে যেতে পারেনি। বুধবারে সত্যি সত্যি গিয়ে উপস্থিত। বন্যা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নিল। হাসি মুখে বলল—তোর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে হাতে দেবার ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার নাম বন্যা নয়।

ঃ বলিস কি তুই ?

ঃ মামাকে তোর কথা বলে রেখেছি। সার্টিফিকেটগুলি এনেছিস?

ঃ না।

ঃ বললাম না, সার্টিফিকেটগুলি সব আনতে?

ঃ এখন গিয়ে নিয়ে আসব?

ঃ আচ্ছা থাক, পরে হলেও চলবে।

মতিঝিলের এমন একটি অফিসে তারা ঢুকল যে, নীলুর বুক কাঁপতে শুরু করল। রিসেপশনে উগ্র ধরণের সাজ করা ভারী সুন্দরী একটি মেয়ে। ঝক ঝক তক তক করছে চারদিক।

ঃ এইটাই নাকি অফিস?

ঃ হুঁ। কেন, পছন্দ হচ্ছে না?

নীলু কিছু বলল না। বন্যা বলল—চল মামার সঙ্গে তোকে পরিচয় করিয়ে দেই। মুখ এমন শুকনো করে রেখেছিস কেন ?

নীলু ফিস ফিস করে বলল—এখানে আমার চাকরি হবে না।

ঃ বুঝলি কি করে হবে না?

ঃ আমার মন বলছে, হবে না। কিছু কিছু জিনিস আমি টের পাই। সিক্সথ সেন্স।

ঃ রাখ তোর সিক্সথ সেন্স।

বন্যার মামা তেমন কোন উৎসাহ দেখালেন না। দু'একটা ছোটখাট প্রশ্ন করলেন--কবে পাশ করেছেন, এর আগে কোথাও চাকরি করেছেন? টাইপিং জানা আছে কিংবা শর্টহ্যাণ্ড? বাসা কোথায়? এমন কিছু জটিল প্রশ্ন নয়, কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে নীলুর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল এবং একবার মনে হল, না এলেই ভাল ছিল।

ভদ্রলোক তাদের কফি খেতে বললেন। প্রাইভেট ব্যবসার নানা সমস্যার কথা বললেন এবং এক সময় টেলিফোন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দু'টি মেয়ে বসে আছে তাঁর সামনে এটা তাঁর মনেই রইল না। নীলু ফিস ফিস করে বন্যাকে বলল—আমরা কি চলে যাব? বন্যা ইশারায় তাকে বসতে বলল। সবচে যে জিনিসটি নীলুর কাছে আশ্চর্যজনক মনে হল তা হচ্ছে—বন্যার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের তেমন কোন যোগাযোগ নেই। বন্যা নিজেও কেমন যেন মিইয়ে আছে। নীলু লক্ষ্য করল, তাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় কিছুই হয়নি। এমন একজন অল্প-পরিচিত মানুষের কাছে বন্যা তাকে এতটা ভরসা দিয়ে কেন নিয়ে এসেছে কে জানে। নীলুর বেশ মনখারাপ হল।

টেলিফোনে ভদ্রলোক প্রায় একঘন্টা কথা বললেন। খুব জরুরী টেলিফোন বোধহয়। কারণ কথা শেষ করেই তিনি বললেন—আমি আজ একটু ব্যস্ত। অর্থাৎ উঠতে বলা হচ্ছে।

বন্যা শুকনো মুখে বলল—একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেন মামা। চাকরির ওর খুব দরকার।

রাগ হবার মত কথা। নীলুর চাকরির এমন কিছু দরকার নেই। কিন্তু বন্যা এমনভাবে কথাটা বলল যেন নীলু ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে আছে।

ভদ্রলোক নিরাসক্ত গলায় বললেন—আমাদের এখানে কোন অপেনিং নেই। ভবিষ্যতে হবে এরকম আশাও নেই। তবে আমার কাছে পার্টিকুলারস রেখে যান, আমি দু'একজনকে বলে দেখব।

: ও কিন্তু মামা অত্যন্ত ভাল মেয়ে।

: ভাল মেয়েদের অফিসে দরকার নেই, অফিসে দরকার এফিসিয়েন্ট মেয়ে।

: ও খুব এফিসিয়েন্ট।

: বুঝলে কি করে? উনি তো এর আগে অফিসে কোন কাজ করেননি!

: মামা আপনি একটু দেখবেন।

: নিশ্চয়ই দেখব। নাম ঠিকানা এবং একটা বায়োডাটা আপনি আমার সেক্রেটারীর কাছে দিয়ে যান।

নীলুর এসব করার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বন্যা এমন আগ্রহ নিয়ে এসেছে তাকে না বলতে খারাপ লাগল। সে এমন ভাব করছে যেন বায়োডাটা লিখে দিলেই তার চাকরি হয়ে যাবে। এমন ছেলেমানুষও থাকে এই যুগে?

নীলু বাড়ি ফিরল খুব মন খারাপ করে। এতটা মন খারাপ হবে সে নিজে বুঝতে পারেনি। সে বোধহয় ধরেই নিয়েছিল চাকরিটা হবে। নানারকম পরিকল্পনাও তার ছিল। প্রতি মাসে মাকে কিছু টাকা পাঠাবে। বেতন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মানি অর্ডার করবে। যতদিন মা বেঁচে থাকবেন ততদিনই পাঠানো হবে। এ বাড়ির কারোর কিছু বলার থাকবে না। তার নিজের টাকা। দু'একটা শখের জিনিস কিনবে। একটা টিভি। একটা ফ্রীজ। একটা হারমোনিয়াম। গানের দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। তার বাবারও ছিল। বাবাই দু'মেয়েকে গান শিখিয়েছিলেন। বাব' মারা যাবার পর কোথায় সব ভেসে গেল।

কি চমৎকার গানের গলা ছিল বিলু আপার। বাবা সব সময় বলতেন—আমার এই মেয়ে গান গেয়ে পাগল করে দেবে সবাইকে। কোথায় গেল গান, কোথায় কি?

নীলু তার বোনের কথা কখনো ভাবতে চায় না। ওটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। কোনকালে তার যেন কোন বোন ছিল না। বিলু নামের কাউকে সে চেনে না। কিন্তু তবু একেক সময় এমন পরিষ্কারভাবে বিলু আপার মুখ মনে আসে। আদুরে স্নিগ্ধ একটা মুখ। যেন সে বলছে-- "কিরে নীলু, রোদে ঘুরে তোর মুখটা রাঙ্গা হয়ে আছে। দেখি বস তো আমার পাশে।" নীলু প্রায়ই ভাবে এত মায়াবতী একটি মানুষ কি করে হয়? কি দুঃখী মেয়েই না ছিল আপা, অথচ কী সুখী চেহারা! গভীর দুঃখের কিছুমাত্র ছাপ ছিল না বিলু আপার চোখে। আনন্দ উজ্জ্বল হাসি হাসি দু'টি চোখ।

সফিক সাধারণত রাত আটটার মধ্যে এসে পড়ে। সাড়ে আটটা বাজছে এখনো তার ফেরার নাম নেই। হোসেন সাহেবও ফেরেননি। কোথায় ঘুরছেন কে জানে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর রাগ থাকে না। আজ আছে। রাগ পড়েনি শাহানারও। এখনো তার ঘরের দরজা বন্ধ। মনোয়ারা রাগ ভাঙ্গানোর চেষ্টা করেছেন, লাভ হয়নি।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দিন খারাপ করেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি হলে ভালই হবে। গুমোট হয়ে আছে। নীলু আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

টুনী জেগে উঠেছে। তার হাসি শোনা যাচ্ছে। অদ্ভুত স্বভাব হয়েছে মেয়েটার, ঘুম ভেঙ্গে হাসতে শুরু করে। পৃথিবীর সব বাচ্চারাই জেগে উঠে কাঁদে। শুধু টুনীই বোধহয় হাসে। দূর থেকে টুনীর হাসি শুনতে এমন মজা লাগছে।

ঃ বৌমা!

নীলু চমকে তাকাল। মনোয়ারা টুনীকে কোলে নিয়ে বারান্দায় চলে এসেছেন।

ঃ একটু হলেই তো সর্বনাশ হত। কি যে কাণ্ড কর তুমি।

ঃ কি হয়েছে মা ?

ঃ খাটের কিনারে শুইয়ে রেখেছো। নিজে নিজে উঠে বসেছে, একটু হলেই পড়ত। এত অসাবধান হলে চলে?

নীলু কিছু বলল না।

ঃ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ঃ দিন খারাপ করেছে মা।

ঃ ঘরে আস। দরজা জানালা বন্ধ কর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকারটা কি?

জানালা বন্ধ করবার আগেই হঠাৎ করে প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করল। রীতিমত ঝড়। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনোয়ারা টুনীকে কোলে নিয়ে অকারণেই ছুটাছুটি করতে লাগলেন। মোমবাতি খুঁজে পাওয়া গেল না। হারিকেনে তেল নেই। প্রচণ্ড শব্দে বাথরুমের জানালার একটা কাঁচ ভাঙ্গল। মনোযারা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন—বৌমা, তোমার কি কোন কালেও বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না? ঝড় বাদলার দিনে হাতের কাছে হারিকেন রাখবে ঠিকঠাক করে--এক ফোঁটা তেল নাই হারিকেনে। এসব কি?

টুনীও ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। নীলু বলল--ওকে আমার কাছে দিন মা।

মনোয়ারা রেগে গেলেন—অন্ধকারে হাত থেকে ফেলবে। ও থাকুক আমার কাছে। তুমি তোমার কাজ কর।

করার মত কোন কাজ নেই। নীলু তার ঘরে চলে গেল। ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আলো হয়ে উঠছে চারদিক। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। মনে হয় এই কাছেই কোথাও যেন পড়ল। চুপচাপ বসে থাকতে ভালই লাগছে নীলুর।

ঃ ভাবী!

নীলু তাকাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে শাহানা এগিয়ে আসছে। নীলু হাসি মুখে বলল—রাগ কমেছে নাকি শাহানা? শাহানা জবাব দিল না। নীলু হালকা গলায় বলল--ওদের কি অবস্থা কে জানে?

ঃ কাদের?

ঃ বাবা আর রফিক।

ঃ তোমার বরের কথা তো কিছু বলনি? নাকি ভাইয়াকে নিয়ে তুমি ভাব না?

ঃ ভাবি।

শাহানা উঠে এল খাটের উপর। মৃদুস্বরে বলল—হঠাৎ করে এমন দিন খারাপ হল কিভাবে? যা ভয় লাগছে।

ঃ ভয়ের কি আছে?

টুনী কাঁদছে। মনোয়ারা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। কোন লাভ হচ্ছে না। শাহানা বলল—ভাবী, তুমি টুনীকে নিয়ে এস তো।

ঃ তুমি নিয়ে এসো, আমার কাছে দেবেন না।

ঃ আমি যাচ্ছিটাচ্ছি না।

নীলু হালকা গলায় বলল—এত ছোট ব্যাপার নিয়ে এরকম রাগ করে কেউ? জীবনে রাগ করার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার ঘটবে!

শাহানা মৃদুস্বরে বলল--হঠাৎ করে আমার কেমন যেন রাগ ধরে যায়। আর এ রকম করব না।

ঃ মোমবাতি কোথায় আছে জান?

ঃ জানি। আমার টেবিলের ড্রয়ারে।

ঃ একটা মোমবাতি মা'র ঘরে দিয়ে আস না। টুনী অন্ধকার দেখে কাঁদছে।

ঃ আমি পারব না ভাবী। তুমি যাও।

নীলু মোমবাতি জ্বালিয়ে মনোয়ারার ঘরে রেখে এল। টুনীর কান্না থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হাত পা ছুঁড়ে খেলা জুড়ে দিল। নীলুর ইচ্ছা হল বলে—ওকে আমার কাছে একটু দিন না মা। কিন্তু সে কিছু বলল না। মনোয়ারা দেবেন না।

ঃ বৌমা, ক'টা বাজল?

ঃ ন'টা পঁচিশ।

ঃ এ তো মহাচিন্তায় পড়লাম! কোথায় আটকা পড়ল ওরা কে জানে?

ঃ এসে পড়বে মা। আপনার দাঁতব্যথা কমেছে?

ঃ কমেছে।

ঃ কিছু খাবেন আপনি? দুপুরে তো কিছু খাননি?

ঃ না, কিছু খাব না। তুমি দেখ শাহানার রাগ ভাঙ্গাতে পার কিনা। যন্ত্রণা হয়েছে একটা।

ঃ ওর রাগ ভেঙ্গেছে মা। আমার ঘরে বসে আছে।

মনোয়ারা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দরজায় ধাক্কা পড়ছে। নীলু দরজা খুলে দেখল, আনিস দাঁড়িয়ে আছে। কাক-ভেজা হয়ে গেছে সে।

ঃ ব্যাপার কি আনিস?

ঃ অবস্থা কাহিল ভাবী। চা খাওয়াতে পারবেন?

ঃ তা পারব। শুকনো কাপড় কিছু পরে আস।

ঃ শুকনো কাপড় আমার কিছু নাই ভাবী। ঘর ভেসে গেছে। একটা গামছাটামছা কিছু দিন।

ঃ এসো ভেতরে। শাহানাকে বলছি কাপড় দেবে তোমাকে ।

নীলু চা বানিয়ে বসার ঘরে ঢুকে দেখল অন্ধকারে আনিস এবং শাহানা পাশাপাশি বসে আছে। ওদের বসার ভঙ্গিটার মধ্যেই কিছু একটা ছিল যা দেখে হঠাৎ নীলু একটু চমকাল। ভালবাসাবাসির কোন ব্যাপার নেই তো? শাহানার বয়স খুবই কম। এই সময়ে মন তরল থাকে। সবাইকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। দরজায় আবার ধাক্‌কা পড়ছে। হোসেন সাহেবের গলা পাওয়া যাচ্ছে--ও বৌমা, বৌমা?

রাত দশটার মধ্যে ভিজতে ভিজতে সবাই এসে উপস্থিত হল। তুমুল বর্ষণ হল সারারাত। আনিস থেকে গেল এ বাড়িতে। সোফার উপর বিছানা হল তার। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল সে।

জেগে রইল শাহানাও। সমস্ত রাত তাব মন কেমন করতে লাগল।

আজ প্রথমবারের মত সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। আনিস ভাই যখন গামছায় তার মাথায় ভেজা চুল মুছছে তখন হঠাৎ তার ইচ্ছে করছিল গামছাটা তার থেকে নিয়ে নিতে। তার বলতে ইচ্ছে করছিল--আনিস ভাই, মাথাটা নিচু করুন, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি। কেন এরকম মনে হল? এ রকম মনে হওয়া নিশ্চয়ই খুব খারাপ। খুব খারাপ মেয়েদেরই নিশ্চয়ই এরকম মনে হয়। কিন্তু সে খারাপ মেয়ে হতে চায় না। সে খুব একটা ভাল মেয়ে হতে চায়।

শাহানা চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। সে অন্ধকারে একা ঘুমুতে ভয় পাবে বলেই মনোয়ারা আজ তার সঙ্গে ঘুমিয়েছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন— কি হয়েছে রে শাহানা, কাঁদছিস কেন?

শাহানা ধরা গলায় বলল—জানি না কেন।

অদ্ভুত এক ধরণের কষ্ট হচ্ছে শাহানার। এ ধরণের কষ্ট পৃথিবীতে আছে তা তার জানা ছিল না। মনোয়ারা শাহানার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি কি কিছু বুঝতে পারছেন? মায়েরা অনেক কিছু বুঝে ফেলে।

শাহানা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে মা।

কবির সাহেব সাধারণত অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে ওঠেন। হাত মুখ ধুয়ে হারিকেন জ্বালিয়ে তাঁর পড়ার টেবিলে বসেন। জরুরী লেখালেখির কাজগুলি সূর্য উঠার আগেই সেরে ফেলা হয়। আজ তেমন কোন জরুরী লেখালেখির ব্যাপার নেই। অভ্যাসবশে লেখার টেবিলে বসেছেন। শুধু শুধু বসে থাকার কোন মানে হয় না, তিনি একটি প্রবন্ধ লিখতে বসলেন। প্রবন্ধের নাম— স্বাধীনতা। প্রথমে ইচ্ছে ছিল "মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা" এই বিষয়ে কিছু লিখবেন। প্রতিটি লেখারই নিজস্ব প্রাণ আছে। সে লেখাকে ঘুরিয়ে দেয়। এই লেখাটিও সে রকম হল। তিন পৃষ্ঠা লেখার পর কবির সাহেব লক্ষ্য করলেন দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে না লিখে তিনি লিখছেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রসঙ্গে। তিনি ভুরু কুঁচকে লেখাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে, যা ভাবছেন তা লিখতে পারছেন না। এটা বয়সের লক্ষণ। জরার লক্ষণ। সময় কি তাহলে শেষ হয়ে আসছে? তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষের মত এমন শক্তিধর একটি প্রাণী এত ক্ষীণ আয়ু নিয়ে আসে কেন? একটি কচ্ছপ বাঁচে আড়াইশ বছর। কচ্ছপের আড়াইশ বছর বাঁচার কোন প্রয়োজন নেই। জীবনের অপচয়।

শওকত উঠে পড়েছে। সে সাড়াশব্দ করে ডনবৈঠক করছে। কবির সাহেব বিরক্ত হয়ে তাকালেন শওকতের দিকে। গুনে গুনে সে পঞ্চাশটা ডন দিবে, তারপর কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে চা বানাতে বসবে। বিরাট একটা জামবাটিতে শরবতের মত মিষ্টি চা এনে টেবিলে রেখে গাল-ভর্তি হাসি দিয়ে বলবে, স্যার, চা। চা তিনি খান না। বহুবার এই কথা শওকতকে বলা হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। সে কাজ করে তার নিজের ইচ্ছায়। অন্য কেউ কি বলছে না বলছে তার কোন তোয়াক্কা করে না। তার ধারণা সকাল বেলা এক বাটি চা দিয়ে সে স্যারের সেবা করছে। এবং স্যারের আপত্তিটা মৌখিক, আসলে তিনি মনে মনে খুশিই হন।

শওকত তাঁর সঙ্গে এসে জুটেছে মাস তিনেক হয়। তবে কবির সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। নীলগঞ্জ স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়বার সময় সে উধাও হয়ে যায়। কোথায় আছে কি কেউ বলতে পারে না। মাস খানেক পর খবর পাওয়া গেল সে এক সার্কাস পার্টিতে ঢুকে সোহাগী চলে গেছে। নিউ অপেরা সার্কাস। খুব বড় দল। কবির সাহেব খবর পেয়ে সোহাগী চলে যান এবং কানে ধরে তাকে নীলগঞ্জে নিয়ে আসেন। কানে ধরা কথাটা মুখের কথা নয়, সোহাগী থেকে নীলগঞ্জ আসার সারাটা পথ তিনি সত্যি সত্যি তার কান চেপে ধরেছিলেন। পরবর্তী এক বৎসর কোন রকম ঝামেলা হয় না। সে ক্লাস এইটে প্রমোশন পায়। ক্লাস এইটেই সে মহা গুণ্ডা হিসেবে নীলগঞ্জে মোটামুটি একটা

ত্রাসের সৃষ্টি করে। নীলগঞ্জের চেয়ারম্যান সাহেবের ছোট মেয়ের জামাইয়ের সঙ্গে কি একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। এবং লাথি মেরে তার পা ভেঙ্গে ফেলে। কবির সাহেব খবর পেয়ে বেত হাতে তাকে ধরতে যান। তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। তার বাবা গ্রামের দরবার ডেকে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেন। পুত্রের প্রতি বিরাগ বশত এটা অবশ্যি করা হয় না, করা হয় চেয়ারম্যান সাহেবের রোষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। চেয়ারম্যান হাজি খবিরউদ্দিন খুব সহজ লোক না।

যাই হোক পরবর্তী চার বছর শওকতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। উড়ো খবর আসে সে চলে গেছে আসাম। এত জায়গা থাকতে আসাম যাবার কারণটি কারোর কাছেই পরিষ্কার হয় না।

চার বছর পর এক সকালবেলা কবির সাহেব দেখলেন তার বাড়ির বারান্দায় শওকত ঘুমাচ্ছে। চেনার উপায় নেই। বিশাল জোয়ান।

ঃ কিরে তুই কোত্থেকে?

ঃ স্যারের শরীরটা ভাল?

ঃ আমি ভাল। তুই এসেছিস কখন?

ঃ রাইতে।

ঃ বাড়িতে যাস নাই?

ঃ না, বাড়িতে গিয়া কি হইব।

ঃ এইখানেই থাকবি নাকি?

ঃ হুঁ।

কবির সাহেবের ধারণা, কিছুদিন থাকবে তারপর নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। কিন্তু এরকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খাচ্ছেদাচ্ছে আছে নিজের মত। এর মধ্যে খবর পেয়েছেন সে খবিরউদ্দিনকে শাসিয়ে এসেছে। বলে এসেছে, বেশী তেরিবেরি করলে বিলের মইধ্যে পুইত্তা থুইয়াম। ভয়াবহ ব্যাপার।

কবির সাহেব শরবতের মত মিষ্টি চায়ের খানিকটা খেলেন। সূর্য উঠি উঠি করছে। বেরিয়ে পড়বার সময় হয়েছে। সূর্য ওঠার আগেই তিনি সমস্ত গ্রামে একটা চক্কর দিয়ে আসেন।

কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রাস্তা প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে আছে। পা রাখা মাত্রই ডেবে যাচ্ছে। কবির সাহেব চটি খুলে ফেললেন। পাজামা হাঁটু পর্যন্ত টেনে তুললেন। এক হাতে একটি ছাতি নিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগলেন। আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। বৃষ্টি শুরু হবার সম্ভাবনা। এ রকম দিনে না বের হলেও চলত। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে—সকালে না ঘুরলে মনে হয় দিনটা ঠিকমত শুরু হল না। কিছু একটা যেন বাকি রয়ে গেল।

সূর্য এখনো ওঠেনি কিন্তু গ্রাম জেগে উঠেছে, শহরের সাথে গ্রামের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে শহরের মানুষেরা কখনো সূর্যোদয় দেখে না। কবির সাহেবের মনে হল সূর্যোদয় দেখাটা অত্যন্ত জরুরী। এই দৃশ্যটি মানুষকে ভাবতে শেখায়। মন বড় করে। কবির সাহেবের পরক্ষণেই মনে হল মন বড় করে ধারণাটা ঠিক না। গ্রামে অত্যন্ত ছোট

মনের মানুষদের তিনি দেখেছেন। মন বড়-ছোট ব্যাপারটির সঙ্গে প্রকৃতির কোন সম্পর্ক বোধহয় নেই।

ঃ মাষ্টার সাব স্লামালিকুম।

ঃ ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছ কুদ্দুস?

ঃ জ্বি মাষ্টার সাব, আপনের দোয়া।

ঃ যাও কোথায় এত সকালে ?

ঃ ইস্টিশনে যাই। ঢাকা যাওন দরকার।

ঃ ট্রেন তো সকাল দশটায়, এখনই কোথায় যাও?

কুদ্দুস কিছু বলল না। কবির সাহেবকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে সে প্রায় রাস্তায় নেমে গেল। কবির সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, স্টেশনে এতক্ষণ বসে থেকে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে এটা ঠিক না। অশিক্ষার জন্যে এটা হচ্ছে। দশটায় ট্রেন, বসে থাকবে ছ'টার সময়!

ঃ মাষ্টার সাহেবের শইলডা বালা?

ঃ হ্যাঁ, ভালই।

কুদ্দুস তাঁর পেছন পেছন আসতে লাগল। দুজনে হাঁটছে নিঃশব্দে। রাজারামের পুকুর ঘাট পর্যন্ত এসে কবির সাহেব বললেন—

ঃ তুমি তো উল্টোদিকে আসছ কুদ্দুস, ইস্টিশানে যাবে ইস্টিশানে যাও।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

কুদ্দুস উত্তরের সড়কের পথ ধরল। কবির সাহেব পুকুরে পা ধোয়ার জন্যে নামলেন। পা ধোয়া অর্থহীন। আবার কাদা লাগবে। কিন্তু রাজারামের এই পুকুরের কাছে এলেই পানিতে হাত পা ডুবাতে ইচ্ছে করে। বিশাল দিঘি। আয়নার মত স্বচ্ছ পানি। এই ঘোর বর্ষায়ও এর জল কাকের চোখের মত স্বচ্ছ।

হাত পা ধুতে ধুতেই কবির সাহেব লক্ষ্য করলেন, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দু'জন ভিখিরী যাচ্ছে। এই দৃশ্যটি নতুন। গ্রামের মানুষ জন সহজে ভিক্ষা করে না। এরা কি এই গ্রামেরই নাকি? তিনি হাত-ইশারা করে ডাকলেন। না, এরা এ গ্রামের না। কবির সাহেব কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন, বাড়ি কোন গ্রামে ? কতদিন ধরে ভিক্ষা করছ? বসতবাড়ি আছে? ছেলেমেয়ে নাই? ভিক্ষা করতে করতে কতদূর যাও? রাতে নিজ গ্রামে ফিরে যাও, না থেকে যাও?

ওরা বেশ আগ্রহ নিয়েই প্রশ্নের জবাব দিল। গ্রামের ভিক্ষুকরা শহরের ভিক্ষুকদের মত নয়, এরা বলতে পছন্দ করে। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ এখনো আছে। কবির সাহেব হাত মুখ ধুয়ে দাঁড়াতেই ওদের একজন চিকন সুরে বলল, চাচামিয়া, আট আনা পয়সা দেন।

কবির সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, আমি ভিক্ষা দেই না।

ওরা মুখ-চাওয়া-চাওযি করল। তিনি উত্তরের সড়ক ধরলেন। সূর্য উঠে গেছে। এখন আর হাঁটতে ভাল লাগবে না। গ্রামে ভিক্ষুক বাড়ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এটা হতে দেয়া যায় না। গ্রাম হচ্ছে উৎপাদনের জায়গা, এখানে ভিক্ষুক তৈরী হলে চলবে কিভাবে?

ঃ স্যার, স্লামালিকুম।

ঃ ওয়ালাইকুম সালাম। রকিব, ভাল আছ?

ঃ জ্বি স্যার। একটু বসবেন না?

ঃ না, আরেকদিন।

রকিব সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। সে গ্রামে থাকে না। রাজশাহীতে ফুড সাপ্লাইয়ে কাজ করে। অল্পদিনের মধ্যেই পয়সা-কড়ি করে ফেলেছে। বাড়ি এসেছে ঘর পাকা করবার জন্যে।

ঃ স্যার, একটা দোনলা বন্দুক কিনলাম।

ঃ তাই নাকি ? বন্দুক কেন?

ঃ একটা বন্দুক থাকলে স্যার ডাকাতি হয় না। জানেন তো, আশেপাশে খুব ডাকাতি হচ্ছে।

ঃ তাই নাকি? জানি না তো?

ঃ খুব হচ্ছে স্যার। এই গ্রামেও হবে। বন্দুকটা কিনলাম এই জন্যেই। আসেন না স্যার, একটু দেখে যান।

ঃ বন্দুক-টন্দুকের ব্যাপারে আমার উৎসাহ নাই রকিব। বন্দুক দিয়ে কিছু হয় না।

বলেই তাঁর মনে হল, কথাটা ঠিক না। মুক্তিযুদ্ধ বন্দুক দিয়েই করতে হয়েছে। বন্দুক একটা অত্যন্ত দরকারী জিনিস।

ঃ রকিব!

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ বন্দুক দিয়ে কিছু হয় না তোমাকে যে বললাম এটা ঠিক না। বন্দুকের দরকার আছে।

ঃ জ্বি স্যার, তা তো আছেই। গ্রামের এক বাড়িতে বন্দুক আছে শুনলে সেই গ্রামে আর ডাকাত আসে না।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ তোমার বন্দুক বাড়িতে থাকবে?

ঃ জ্বি।

ঃ তুমি কতদিন আছ?

ঃ এক সপ্তাহ থাকব স্যার। কাল একবার আসব আপনার কাছে ?

ঃ কোন কাজে, না এমনি দেখাসাক্ষাৎ?

ঃ একটা কাজ স্যার আছে।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে।

ঃ কখন আসলে পাওয়া যাবে আপনাকে?

ঃ সব সময়। যাব আর কোথায় ? ঘরেই থাকি সারাদিন।

রকিব বিদায় নিতে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল। এটা একটা নতুন ব্যাপার। কোন উদ্দেশ্য আছে কি? উদ্দেশ্য ছাড়া আজকাল কেউ কিছু করে না। তিনি ভুরু কুঁচকালেন। গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়। খবর পেয়েছিলেন শিয়ালজানি খালে পানি বাড়ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। বন্যা এ বছরও কি হবে? একটু ঘুরে শিয়ালজানি খালটা

দেখে গেলে হয়। একটা বাঁধ-টাধ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতি বছর বন্যা হলে তো সবাই ভিখিরি হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে তিনি শিয়ালজানি খালের দিকে রওনা হলেন। ফোটায় ফোটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। সঙ্গে ছাতা আছে, কিন্তু ছাতা মেলতে ইচ্ছা করছে না। পথে যেতে যেতে তাঁর মনে হল, আর দেরী করা ঠিক হচ্ছে না। কাজে হাত দেয়া দরকার। মানুষ কচ্ছপ নয়, সে আড়াইশ বছর বাঁচে না। অল্প কিছুদিন বাঁচে। যা করবার এই অল্প সময়ের মধ্যেই করতে হবে। শুরু করতে হবে একা, তারপর অনেকে এসে দাঁড়াবে পাশে। কোন সৎকাজে মানুষের অভাব হয় না। মানুষ এক সময় না এক সময় পাশে এসে দাঁড়ায়। তাঁর পাশেও লোকজন এসে দাঁড়াবে।

ছাত্রদের কাছে চিঠি লিখতে হবে। দেখা করতে হবে সবার সাথে। অনেক কাজ। শিয়ালজানি খালের পাড়ে কবির সাহেব দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মেলতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। পানি সত্যি সত্যি অনেকখানি বেড়েছে। ছোট একটা খাল। কিন্তু কত অল্প সময়ের নোটিশে বিশাল হয়ে যেতে পারে। এ রকম নজির আছে।

ঃ স্লামালিকুম মাষ্টার সাব।

ঃ ওয়ালাইকুম সালাম।

ঃ খালের পানি বাড়তাছে।

ঃ হুঁ।

ঃ এই বছর কিন্তুক পানি অইত না।

ঃ বুঝলে কিভাবে?

ঃ পর পর দুই সন বান হয় না। তারপর পানিটা দেখেন, ভারী পানি, বানের পানি অয় পাতলা।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জ্বি।

ঃ ভারী পাতলা বোঝ কিভাবে?

ঃ হাতে নিলেই বুঝন যায়।

কবির সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, খালের তীর বরাবর বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করব বুঝলে মজনু মিয়া?

ঃ এইটা সম্ভব না মাষ্টার সাব।

কবির সাহেব রাগী গলায় বললেন, অসম্ভব বলে কোন জিনিস নেই মজনু মিয়া, সবই সম্ভব। মানুষের ক্ষমতা খুব বেশী। অবশ্যি বেশীর ভাগ মানুষই তা জানে না। আস, ছাতার নীচে আস, ভিজছ কেন?

মজনু মিয়া হাসতে হাসতে বলল, ভিজতে ভাল লাগে মাষ্টার সাব।

মজনু মিয়ার দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে। ভাল লাগছে দেখতে। তিনিও ছাতি নামিয়ে ফেললেন। মজনু অবাক হয়ে বলল, ও মাষ্টার, ভিজতেছেন তো!

ঃ বৃষ্টিতে ভিজতে ভালই লাগছে।

মজনু মনে মনে ভাবল, আমাদের মাষ্টার খুব পাগলা কিসিমের আছে।

সন্ধ্যার দিকে খবর এল শিয়ালজানি খালের পানি অনেকখানি বেড়েছে। এই হারে বাড়তে থাকলে রাতের মধ্যে গ্রামে ঢুকবে। নীলগঞ্জের সমস্ত মানুষ শংকিত। খালের পাশে লোকজন আছে। অবস্থা তেমন দেখলে হাঁক-ডাক দেবে।

কবির সাহেব সন্ধ্যা থেকেই চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। সকালবেলা বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক হয়নি। জ্বর এসে গেছে। গলাব্যথা করছে। ঢোক গিলতে পারছেন না। বয়সের লক্ষণ। শরীর বলছে—এখন আর আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তা করিয়ে নিতে পারবে না। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে।

শওকত ঘুরছে শুকনো মুখে। তার খুব ইচ্ছা একজন ডাক্তার নিয়ে আসে। কবির সাহেব রাজি নন। সামান্য জ্বর-জারিতে ডাক্তার কি? তাছাড়া এ গ্রামে ডাক্তার নেই। বৃষ্টির মধ্যে যেতে হবে ফটিকখালি। কোন অর্থ হয় না। শওকত কাঁচুমাচু মুখে বলল, একটু চিড়া ভিজাইয়া দেই খান।

ঃ না।

ঃ রুটি বানাইয়া দেই? দুধ দিয়া চিনি দিয়া খান।

ঃ কিছু খাব না রে শওকত। তুই যা, পানির অবস্থাটা কি খোঁজ নিয়ে আয়।

ঃ না খাইয়া থাকবেন সারারাইত?

ঃ হুঁ। একটা কথা মন দিয়া শোন শওকত। এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পেটে ক্ষিধে নিয়ে ঘুমুতে গেছে। সুস্থ মানুষ। আর আমি অসুস্থ। খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি একবেলা না খেলে কিছু যাবে আসবে না।

কবির সাহেবের মন অন্য একটি কারণেও বেশ খারাপ। ঢাকা থেকে নীলু হঠাৎ করে তাঁকে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছে। সে চিঠিতে শাহানার সেকেণ্ড ডিভিশনে মেট্রিক পাশের খবরের সঙ্গে তার বোন বিলুর মৃত্যু সংবাদ আছে। শেষ লাইনটিতে সে লিখেছে, মামা, আপনি তো অনেক জ্ঞানী মানুষ, আপনি আমাকে বলেন এত কষ্ট কেন মানুষের?

চিঠি পড়ে তিনি চোখ মুছেছেন। এটাও বয়সের লক্ষণ। মন দুর্বল হয়ে গেছে। সামান্যতেই চোখ ভিজে উঠে।

দুপুর রাতে শওকত খবর নিয়ে এল, পানি কমতে শুরু করেছে। এই খবরের আনন্দেই সম্ভবত কবির সাহেবের জ্বর কমে গেল। তিনি হাসি মুখে বললেন, একটু যেন ক্ষিধে লাগছে রে শওকত।

ঃ ভাত খাইবেন?

ঃ দে চারটা ভাতই খাই। তরকারী কি?

ঃ খইলশা মাছ ডেঙ্গা দিয়া রাঁধছি। মাষের ডাইল আছে।

ঃ খেয়েই ফেলি চারটা।

খেতে খেতেই তিনি মনস্থির করলেন, আগামী কাল ভোরে ঢাকা যাবেন। সুখী নীলগঞ্জের কাজে হাত দেয়া দরকার। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ঃ শওকত।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ ঢাকা যাব কাল। তুইও চল আমার সাথে।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ বড় একটা কাজে হাত দিব। সুখী নীলগঞ্জ! নীলগঞ্জের মানুষের আর কোন দুঃখ থাকবে না।

শওকত তাকিয়ে থাকল। এই অদ্ভুত মানুষটিকে সে খুব পছন্দ করে। সেও মজনু মিয়ার মত মনে মনে ভাবল, আমাদের স্যার খুব পাগলা।

কবির সাহেব যাবেন ঢাকা। ভৈরব রেল স্টেশনে আটকা পড়ে গেলেন। এক গ্লাস পানি খাবার জন্যে স্টেশনের পাশের এক হোটেলে ঢুকেছেন। ক্যাশবাক্স নিয়ে বসা মোটাসোটা লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল—যেন ভূত দেখছে। কবির সাহেব বললেন, স্লামালিকুম। লোকটি জবাব দিল না।

ঃ পানি খাব। এক গ্লাস পানি দেয়া যাবে?

লোকটি লাফিয়ে উঠল। কবির সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না।

ঃ স্যার, আমি আপনার ছাত্র।

ঃ ভাল আছ বাবা?

ঃ আমার নাম স্যার ফজল। ফজল পা ছুঁয়ে সালাম করল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। পানির গ্লাসের জন্যে নিজেই ছুটে গেল। কিন্তু ফিরে এল পানি ছাড়াই।

ঃ স্যার, বাড়িতে চলেন। বাড়িতে পানি খাবেন। কাছেই বাড়ি। দুই মিনিট লাগবে।

ঃ ঢাকার গাড়ি ধরব ফজল।

ঃ আমি স্যার গাড়িতে তুলে দেব।

ঃ পানি এখানেই খেয়ে গেলে হত না?

ঃ বাড়িতে খাবেন স্যার।

ফজল কবির সাহেবের হাত থেকে ব্যাগ প্রায় ছিনিয়ে নিল। কবির সাহেব হাঁটতে শুরু করলেন। এজাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় তাঁর ছাত্র বের হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তাঁকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়। একবার শান্তাহার যাচ্ছিলেন। ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড়। টিকেট চেকার উঠেছে। টিকিট নেই যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। টিকিট চেকার দিব্যি বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে এক টাকা দু'টাকা করে নিয়ে নিচ্ছে। তার ভাব দেখে মনেই হচ্ছে না যে কাজটা অন্যায় এবং এরকম প্রকাশ্যে করাটা ঠিক হচ্ছে না। এক পর্যায়ে কবির সাহেব বললেন, আপনি কি করছেন এসব?

টিকিট-চেকার রাগী মুখে তাঁর দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে থেমে বলল, স্যার আপনি? সে এগিয়ে এসে সালাম করল।

ঃ তুমি কি বাবা আমার ছাত্র?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ তুমি তো আমাকেও লজ্জা দিলে। তোমার মত ছাত্র তৈরী করল যে মাষ্টার সে কেমন মাষ্টার?

টিকিট-চেকার গাড়ির দরজার কাছে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কবির সাহেবের নিজেরই একটু খারাপ লাগল। কিছু না বললেই হত। মুখের কথায় কি আর অন্যায় বন্ধ হয়? দোষ তো তার একার নয়। লোকগুলি বিনা টিকিটে উঠল কেন? প্রথম অন্যায় তো করেছে যাত্রীরা। দেশের সব মানুষই কি অসৎ হয়ে যাচ্ছে? নীতিবোধ নেই? ন্যায়, অন্যায় বিচার নেই?

শান্তাহার স্টেশনে ট্রেন বদলের জন্যে কবির সাহেব নামলেন। টিকিট-চেকার ছাত্র এসে উপস্থিত। কথা নেই বার্তা নেই, স্যুটকেস উঠিয়ে নিল হাতে।

ঃ ব্যাপার কি?

ঃ বাসায় যেতে হবে স্যার।

ঃ আমি তো রংপুর যাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি।

ঃ রাতের বেলা যাবেন স্যার। রাতে একটা ট্রেন আছে।

ঃ আজ বাবা বাদ দেয়া যায় না?

ঃ না, স্যার। আমার অনেক দিনের শখ আপনাকে সাথে নিয়ে একবেলা চারটা বাত খাই। স্যার, আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেননি?

ঃ না।

ঃ আপনি স্যার পুরো এক বছর আমার কলেজের পড়ার খরচ দিয়েছেন। প্রতি মাসের তিন তারিখে আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসতাম।

যেতে হল তাঁকে। গিয়ে মনে হল ছেলেটি তাঁকে ইচ্ছে করেই বোধহয় এনেছে। বিশাল পরিবার। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে ছাড়াও তিনটি বড় বড় বোন, দু'টি ভাই, বাবা এবং মা। সবাই মিলে দু'কামরার রেলের কোয়ার্টারে আছে। কবির সাহেবের বেশ মনখারাপ হয়ে গেল। ছেলেটি রাতে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিল। মৃদু স্বরে বলল, স্যার, বড় কষ্টে আছি। আপনি স্যার আমাকে বলেন, আমি কি করব!

তিনি কিছু বলতে পারলেন না। মাঝে মাঝে দারুণ সব অস্বস্তিতে পড়তে হয়। ভৈরবেও এই জাতীয় অবস্থা হল। পানি খেতে গিয়ে তিনি আটকা পড়ে গেলেন। কোন কিছুর বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ নয়। ফজল সেই জিনিসটিই করতে লাগল। তাঁকে বসিয়ে রেখে— একটু আসি স্যার বলেই উধাও হয়ে গেল এবং ফিরে এল প্রকাণ্ড একটা রুই মাছ নিয়ে। কবির সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। তাঁর ঢাকা যাবার দরকার।

দুপুরবেলা পিওন একটি রেজিষ্ট্রি চিঠি দিয়ে গেছে। খামের উপর লেখা—নীলুফার ইয়াসমিন। ইংরেজীতে টাইপ করা ঠিকানা। নীলু খুবই অবাক হল। কে তাকে রেজিস্ট্রি চিঠি দেবে? বিয়ের আগে চিঠি আসত। আজেবাজে সব কথার চিঠি- তোমাকে আজ

দেখলাম কলেজে যাচ্ছ যেন কোন রাজকন্যা পথ ভুলে এসেছে। জান, তোমার কথা ভেবে ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। রাত জেগে জেগে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ি- চুল তার কবেকার .....। এই চিঠিও সেরকম কিছু নাকি?

নীলু ভয়ে ভয়ে খাম খুলল। ইংরেজীতে টাইপ করা একটা চিঠি। মার্ক এণ্ড ফিসার-এ-র জেনারেল ম্যানেজার লিখছেন, তোমাকে জানানো যাচ্ছে যে, মার্কস এণ্ড ফিসার এর পারচেজ ডিভিশনে জুনিয়র এ্যাপ্রেনটিস অফিসার হিসেবে তোমাকে নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে। চাকরির শর্তাবলী নিম্নরূপ। শর্ত পছন্দ হলে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে কাজে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সহজ ইংরেজী, অর্থ না বোঝার কিছু নয়, তবু নীলুর মাথায় কিছু ঢুকছে না। সে পর পর চারবার চিঠিটা পড়ল। মার্কস এণ্ড ফিসার-এ চাকরির জন্যে সে কোন দরখাস্ত করেনি। মার্কস এণ্ড ফিসার কেন কোথাও করেনি। বন্যার চাপাচাপিতে সে তার মামার কাছে গিয়েছিল। চাকরির চেষ্টা বলতে এইটুকুই। বন্যা অবশ্যি একদিন এসে সাদা কাগজে তার দস্তখত নিয়ে গেছে। সার্টিফিকেট মার্কশীট নিয়েছে ফটো কপি করবার জন্যে! কোথায় কোথায় নাকি পাঠাবে। তাই দেখেই চাকরি হয়ে যবে? ইন্টারভ্যু-টিন্টারভ্যু কিচ্ছু লাগবে না? বাংলাদেশ এরকম সোনার দেশ হয়ে গেছে?

নাকি কোন রহস্য আছে এর-মধ্যে? হয়তো এই নীলুফার ইয়াসমিন সে নয়, অন্য কেউ। ভুল ঠিকানায় এসেছে। কিংবা ফাঁদ-টাদ পেতেছে কেউ। জয়েন করতে যাবে অম্নি তাকে ধরে পাচার করে দেবে পাকিস্তানে কিংবা সিঙ্গাপুরে। গতকালের পত্রিকাতেই আছে দশটি মেয়েকে পাচার করেছে পাকিস্তানে। ধরা পড়ে তারা এখন আছে লাহোরের এক জেল হাজতে। একটি মেয়ের ছবিও ছাপা হয়েছে। কেমন বউ-বউ চেহারা। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। রুমা নাম।

সারাটা দুপুর নীলুর কাটল অস্বস্তিতে। চিঠিটা কাউকে দেখানো যাচ্ছে না। বাসায় রফিক অবশ্যি আছে। তাকে এখনি কিছু বলা ঠিক হবে না। হৈ-চৈ চেঁচামেচি শুরু করবে। ব্যাপারটা পুরোপুরি না জেনে কাউকে কিছু না বলাই ভাল। বন্যাকে টেলিফোন করা যায় অবশ্যি। সে সবচে ভাল বলতে পারবে। রশিদ সাহেবের বাসায় নতুন টেলিফোন এসেছে। বন্যার টেলেফোন নাম্বারও লেখা আছে। কিন্তু দুপুরবেলায় বেরুতে গেলেই মনোয়ারা হাজারটা প্রশ্ন করবেন-- কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? দরকারটা কি? তবে মনোয়ারা খাওয়া-দাওয়া শেষ হলেই ঘুমুতে যাবেন। সেই সময় যাওয়া যায়। নীলু তার শাশুড়ির ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বন্যাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। মার্কস এণ্ড ফিসারের কথা শুনেই বলল, সেই অফিসেই তো তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম। মামার অফিস। নামটাও মনে নেই? গাধা নাকি তুই?

ঃ জয়েন করব?

ঃ করবি না মানে? এত ঝামেলা শুধু শুধু করলাম? কতবার যে আমি মামার কাছে গিয়েছি সেটা আমি জানি আর-মামা জানে।

ঃ আমার কেন জানি শুধু ভয় ভয় লাগছে।

ঃ ভয় ভয় লাগার কি আছে এর মধ্যে?

ঃ অফিসের চাকরি, পারব-টারব না—সবার বকা খাব।

ঃ বাজে কথা বলিস না। চড় খাবি।

ঃ বাসার সবাই কিভাবে নেবে কে জানে।

ঃ যেভাবে ইচ্ছা নিক, কিছুই যায় আসে না।

ঃ শাশুড়ি হয়ত রেগে যাবেন।

ঃ বেতন পেয়ে তাকে একটা গরদের শাড়ি কিনে দিস, দেখবি সব রাগ জল হয়ে গেছে। উঠতে বসতে তখন শুধু বৌমা বৌমা করবে।

বন্যা খুব হাসতে লাগল। এটা কোন হাসির ব্যাপার না। হয়ত শেষ পর্যন্ত সফিকই বলে বসবে--এত ছোট বাচ্চাকে রেখে চাকরি করবে কি? ওকে কে দেখবে? তাছাড়া সে রাজি হলেও নীলু কি পারবে টুনীকে রেখে অফিস করতে?

রফিক বাসায় ফিরল ন'টার দিকে। তার মনটন ভাল নেই। চাকরির ব্যাপারে একজনকে ধরার কথা ছিল। ধরা যায়নি। এক্ষুণি আসবেন এক্ষুণি আসবেন করে ওরা তাকে তিন ঘন্টা বসিয়ে রেখে বলেছে আজ, মঙ্গলবার খেয়ালই ছিল না। মঙ্গলবারে তিনি তো আসেন না। আপনি ভাই মঙ্গলবার ছাড়া অন্য যে কোন দিন আসেন। রফিক বহুকষ্টে রাগ সামলে বলেছে, আমি কাল আসব। কাল গেলেও লাভ হবে না। তবু যেতে হবে, কারণ এই লোক একজন মন্ত্রীর ফুপাতো ভাই। তাকে ধরে মন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।

রফিক বাসায় ফিরেই খেতে বসল। তার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

ঃ ডাল আর আলুভাজা? অত্যন্ত উচ্চমানের খাবার দেখছি ভাবী!

নীলু বলল, বাজার হয়নি আজ।

ঃ একটা ডিম ভেজে নিয়ে এসো।

ঃ ডিম নেই ঘরে, থাকলে ভেজে দিতাম।

রফিক প্লেট সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঃ এইসব ফালতু জিনিস আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব না।

ঃ না খেয়ে থাকবে?

ঃ হ্যাঁ। খাবার যা দিয়েছ সেটা খাওয়া আর না-খাওয়া সমান।

নীলু আর কিছু বলল না। রফিকের মধ্যে এই ছেলেমানুষিটা আছে। এই বয়সে খাবার নিয়ে রাগ করে কেউ? মনোয়ারা এসে বললেন, রফিক কি না খেয়ে চলে গেল বৌমা?

ঃ জ্বি।

ঃ জানোই তো সে এসব আজেবাজে খাবার খেতে পারে না। একটা ডিম এনে রাখলে না কেন?

ঃ কাকে দিয়ে আনাব বলেন? বাবার পায়ে ব্যথা, শুয়ে আছেন। ও এখনো অফিস থেকে ফেরেনি।

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বললেন, কি মুখে মুখে তর্ক করছ। আনিস ছোঁড়াটাকে বললেই তো এনে দেয়। চেষ্টা থাকলে একটা উপায় হয়। সেই চেষ্টাই নাই।

নীলু কিছু বলল না। মনোয়ারার মেজাজ চড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রফিকের উপর—সম্রাট জাহাঙ্গীর! মোঘলাই খানা ছাড়া খেতে পারেন না! পরের উপর খাওয়া তো টের পায় না। নিজের রোজগারে যখন খাবে, তখন বৌমা তুমি দেখবে আলুভর্তা দিয়ে সোনামুখ করে ভাত খাচ্ছে। শাহানশাহর জন্যে দুপুররাতে গিয়ে ডিম কিনে আনতে হবে! কি আমার ডিম খানেওয়ালা!

নীলু মৃদুস্বরে বলল, মা ও শুনবে।

ঃ শুনলে শুনবে। আমি কি ওর রাগের তোয়াক্কা করি? কান ধরে বের করে দেব না? চাকরিবাকরি না পেয়ে তেল বেশী হয়ে গেছে। তেল কমানো দরকার।

রফিক শোবার আয়োজন করছে। নীলু এসে দরজার পাশে দাঁড়াল, ঘুমিয়ে পড়েছ রফিক?

ঃ না।

ঃ আসব ভেতরে?

ঃ ইচ্ছে করলে আসতে পার।

নীলু ভেতরে ঢুকল। রফিকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। মনোয়ারার কাটা-কাটা কথা নিশ্চয়ই কানে গিয়েছে। নীলু বলল, ক্ষিধে নিয়ে ঘুম আসবে না। ভাত দিয়েছি, খেতে আস। রফিক জবার দিল না।

ঃ তোমার বিখ্যাত ডিমভাজাও আছে। আনিসকে পাঠিয়ে ডিম আনানো হয়েছে। কেন এমন ছেলেমানুষি কর রফিক? এসো, প্লীজ।

রফিক খাবার ঘরে এল কোন রকম আপত্তি না করেই। নীলু খেতে বসল রফিকের সঙ্গে।

ঃ তুমি খাওনি?

ঃ না।

রফিক হালকা গলায় বলল, সব সময় এমন ভাল মেয়ে সাজতে চাও কেন ভাবী? আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার ছিল না!

নীলু কিছু বলল না। রফিক গম্ভীর গলায় বলল, ধর আমি যদি রাতে না খেতাম, তুমিও কি না খেয়ে থাকতে?

ঃ কি জানি। জানি না।

ঃ না না, বলতে হবে তোমাকে।

ঃ আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে, আমি খেয়ে নিতাম।

ঃ দ্যাটস গুড। বাঙালী মেয়েদের একটা প্রবণতাই হচ্ছে, ভালমানুষির ভান করা। ভান আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তোমার মধ্যেও প্রচুর ভান আছে।

ঃ আছে নাকি?

ঃ অফকোর্স আছে। থাকতেই হবে।

নীলু প্রসঙ্গ পাল্টে মৃদুস্বরে বলল, খবর আছে রফিক।

ঃ খারাপ খবর, না ভাল খবর?

ঃ বুঝতে পারছি না।

ঃ বল শুনি।

ঃ আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

ঃ কি পেয়েছ?

ঃ চাকরি। মার্কস এণ্ড ফিসারে জুনিয়র অ্যাপ্রেন্টিস অফিসার। বেসিক পে ষোলশ' টাকা। হাউস রেন্ট আছে, মেডিকেল আছে, যাতায়াতের জন্যে এ্যালাউন্স আছে।

ঃ ঠাট্টা করছ তুমি?

ঃ ঠাট্টা না। খাওয়া শেষ কর, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখাচ্ছি।

রফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

ঃ সত্যি বলছ তো ভাবী?

ঃ হ্যাঁ. আজই পেয়েছি। কাউকে বলিনি এখনো।

ঃ ভাইয়াকেও না?

ঃ না। তাকে বলব ভেবেছিলাম, সে এসেই শুয়ে পড়েছে, তার শরীর ভাল না। ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

ঃ ভাইয়াকে ডেকে তোল এবং খবরটা- দাও দেখবে সে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

নীলু চুপ করে রইল। রফিক বল, ভাইয়ার জন্যে এটা যে কি পরিমাণ রিলিফ হবে তা তুমি বুঝতে পারছ না। ভয়ে আধমরা হয়ে আছ--ভাইয়াকে খবরটা দাও, দেখবে সে তোমার কোমর ধরে ওরিয়েন্টাল ড্যান্স দেবে।

নীলু হেসে ফেলল। রফিক বলল, এখন থেকে ভাবী আমার চাকরি না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে দু'শ টাকা করে হতেখরচ দেবে। তোমার নিজের বেতনের টাকা থেকে দেবে। আমার অবস্থা টাইট।

সফিক জেগেই ছিল। নীলু দেখল টুনীকে সরিয়ে একপাশে দেয়া হয়েছে। সফিক তার পাশে নীলুর জন্যে জায়গা রেখেছে। নীলু একটি দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করল। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে অপমান এবং অবহেলা আছে। আজ রাতে সফিকের নীলুকে প্রয়োজন, কাজেই টুনীকে একপাশে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আগামীকাল এই প্রয়োজন হয়ত থাকবে না, টুনী ঘুমুবে দু'জনের মাঝখানে।

সফিক বলল, ক'টা বাজে?

ঃ বারটা দশ। ঘুমুওনি এখনো?

ঃ ঘুমিয়েই ছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সফিক নীলুকে তার কাছে টানল। নীলু মৃদুস্বরে বলল, আমি একটা চাকরি নিলে কেমন হয়?

ঃ হঠাৎ চাকরির কথা বলছ কেন?

ঃ বল না কেমন হয়? অনেকগুলি বাড়তি টাকা আসে সংসারে। যা অবস্থা।

সফিক হালকা গলায় বলল, চাকরিটা তোমাকে দেবে কে? বাজারের অবস্থা তো জান না। রফিককে দেখছ না। এম. এ. পাশ করে রাস্তায় ঘুরছে।

নীলু বলল, আচ্ছা ধর যদি পাই, তাহলে?

ঃ তাহলে কি?

ঃ তাহলে কি চাকরিটা নেব?

ঃ তোমার শখ হলে নেবে।

ঃ শখ বলছ কেন, এটা কি প্রয়োজন না?

সফিক কিছু বলল না। চাকরির প্রসঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে তার ইচ্ছে করছে না। তারা বাতি নিভিযে ঘুমুতে গেল একটার দিকে। বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ঝম ঝম শব্দ হচ্ছে বৃষ্টির। এ বৎসর বর্ষা নেমেছে ভাল।

নীলু টুনীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমি কিন্তু চাকরি একটা পেয়েছি। মার্কস এণ্ড ফিসারে। আমার এক বন্ধু বন্যা, সে জোগাড় করে দিয়েছে।

সফিক কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শুধু।

ঃ আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়েন করবার কথা। জয়েন করব?

ঃ চাকরি পেয়েছ এই কথাটা আগে বললেই পারতে। এত ভণিতা করছিলে কেন?

ঃ তোমার কি ইচ্ছা না, আমি চাকরি করি?

ঃ ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ব্যাপার না। চাকরি করতে চাও করবে। ভণিতা করবে না। মেয়েলী ভণিতা আমার ভাল লাগে না।

ঃ মেয়েমানুষ মেয়েলী ভণিতাই তো করব।

আর কোন কথা হল না। রাত বাড়তে লাগল। ঝম ঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কাছেই। ছোট টুনী ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠল। নীলু তাকে কাছে টেনে নিল। মনে মনে বলল, পৃথিবীতে কেউ যদি আমাকে ভাল না বাসে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। তুই ভালবাসবি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালবাসার আমার দরকার নেই। একজনের ভালবাসা পেলেই হবে।

নীলুর ঘুম আসছে না। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি অথচ চোখে ঘুম নেই। নীলু মনে মনে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, বুঝলি টুনী, আমি খুব একজন অসুখী মানুষ। বাইরে থেকে সেটা কেউ বুঝতে পার না। সবাই ভাবে—বাহ্, নীলু মেয়েটা তো খুব সুখী হয়েছ । স্বামী কন্যা শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে কি চমৎকার মিলেমিশে আছে। এরকম সুখ কিন্তু আমি চাইনি রে পাগলি। আমি অন্য রকম সুখ চেয়েছিলাম। এমন একজন স্বামী চেয়েছিলাম যে সব সময় তার পাশে আমার জন্যে জায়গা রাখবে। শুধু বিশেষ বিশেষ রাতে রাখবে না।

আজ নীলুর একটি বিশেষ দিন। চাকরিতে যোগ দেবার তারিখ। সাড়ে ন'টায় সফিক বলল, এসো খেয়ে নিই।

নীলুর লজ্জা করতে লাগল। সে বলল, তুমি খেয়ে নাও।

ঃ খাবে না?

ঃ ইচ্ছা করছে না। ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নেব।

খেতে বসল সফিক একাই। নীলু বসল তার সামনের চেয়ারে। মনোয়ারা খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর মুখ গম্ভীর। তিনি নীলুর দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। সফিক বলল, এখানে বসে আছ কেন? তৈরী হও।

নীলু তৈরী হয়েই ছিল। তবু উঠে পড়ল। হোসেন সাহেব শোবার ঘরে বসে পত্রিকা দেখছিলেন। নীলুকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাসি মুখে তাকালেন, তৈরী নাকি মা?

ঃ হ্যাঁ।

নীলু পা ছুঁয়ে সালাম করল। হোসেন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, ফি আমানুল্লাহ মা। ফি আমানুল্লাহ।

নীলু একটু ইতস্ততঃ করে বলল, বাবা, আমার এই চাকরি করতে যাওয়া নিয়ে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?

হোসেন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আপত্তি থাকবে কেন?

ঃ মা বোধহয় খুব একটা পছন্দ করছেন না।

ঃ এখন না করলেও পরে করবে।

ঃ উনার উপর অনেক ঝামেলা পড়বে।

ঃ সহ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া টুনী তো বিরক্ত করে না। আমি দেখব টুনীকে।

ঃ যাই তাহলে বাবা?

ঃ যাও মা। দশবার ইয়ামুকাদ্দেমু পড়ে, ডান পা আগে ফেলে ঘর থেকে বেরুবে।

মনোয়ারা শেষ পর্যন্ত গম্ভীর হয়েই রইলেন। বৌয়ের চাকরির ব্যাপারটি তিনি গোড়া থেকেই অপছন্দ করে এসেছেন। সফিককে বেশ কয়েকবার বলেছেনও। কিন্তু সফিক কোন উত্তর দেয়নি। যেন এ ব্যাপারে তার কোন বক্তব্য নেই। কিছু জিজ্ঞেস করলে সফিক এমন ভাব করে যেন এর উত্তর দেয়াটা জরুরী নয়। গতকাল রাতেই তিনি সফিককে ডেকে বললেন, আমি এই বয়সে সংসার সামলাব কি করে?

সফিক হাই তুলে বলেছে, অসুবিধা হবে না। কাজের একটা লোক তো আছে।

ঃ ঐ লোককে আমি এক্ষুণি বিদায় করব।

ঃ কেন?

ঃ এত বড় একটা জোয়ান কেউ রাখে বাসায়? কোন দিন সবাইকে খুন করে জিনিসপত্র নিয়ে ভাগবে।

ঃ ওকে তাড়ালে তোমারই অসুবিধা হবে মা।

ঃ হোক অসুবিধা।

মনোয়ারা কাজের লোকটিকে সত্যি সত্যি বিদায় দিলেন। এতেও সফিক কিছু বলল না। ছেলেদের সংসারে থাকার কাল কি তাঁর শেষ হয়েছে? বোধ হয় হয়েছে।

রফিক নীলুকে অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। সে তার স্বভাবমত বকবক করছে। নীলুর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না, তবুও বলতে হচ্ছে। রফিক সঙ্গে থাকলে কথা না বলে থাকা মুশকিল।

ঃ কি ভাবী, গুমি হয়ে আছ কেন? আজকে তোমার খুশীর দিন। আনন্দ ফুর্তি কর।

ঃ কি আনন্দ ফূর্তি করব?

ঃ গান-টান গাও।

ঃ কি যে পাগলের মত কথা বল!

ঃ আমি হলে তাই করতাম। রিক্সায় যেতে যেতে গান ধরতাম, কি আনন্দ চারিধারে, কি আনন্দ চারিধারে!

ঃ টুনীকে ছাড়া এতক্ষণ থাকতেই পারব না।

ঃ খুব পারবে। আর এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা সবাই দেখব। চোখে চোখে রাখব।

ঃ সারাদিন তো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। তুমি আবার চোখে চোখে কি রাখবে?

ঃ আমি না রাখলেও অন্যরা রাখবে।

রফিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে নেমে গেল। মতিঝিল পর্যন্ত তার যাবার কথা, কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে এমনভাবে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল যেন খুব জরুরী কোন কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়েছে। অথচ তেমন কোন কাজই নেই। রাস্তায় হাঁটা। এই হাঁটার মধ্যেই পরিচিত অর্ধ-পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হওয়া।

ঃ অ্যাই রফিক না?

ঃ হুঁ।

ঃ চিনতে পারছিস?

ঃ না।

ঃ বলিস কি আমি ইয়াসিন। কলেজে তোর সঙ্গে পড়তাম।

ঃ ও ইয়াসিন, আছিস কেমন?

ঃ ভাল। এখন বিটিসিতে আছি।

ঃ গুড।

ঃ বেতনপত্র মন্দ না। তিনটা বোনাস আছে। আসিস একদিন আমার এখানে। ফ্রি সিগারেট দেব। খাস তো সিগারেট?

ঃ খাই।

ঃ আসিস তাহলে অফিসে।

ঃ আচ্ছা আসব।

অফিস কোথায় কিছুই না বলে চলে গেল ইয়াসিন। অনেক দিনের পুরানো পরিচিতদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু অবশ্যি আশা করা যায় না, ইউনিভার্সিটির বন্ধুরাই যেখানে দায়সারা গোছের কথা বলা শুরু করেছে। সেদিন করিমের সঙ্গে দেখা। সুন্দর একটি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে নিউ মার্কেটে ঘুরছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বলে দেয়া যায়, নতুন বিয়ে। সঙ্গের মেয়েটি তারই স্ত্রী, অন্য কারোর নয়, এটা বোঝানোর প্রবল চেষ্টা। গর্বিত দৃষ্টি। রফিক দূর থেকে ডাকল--করিম নাকি?

করিম অনুৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এল। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারত, তা এল না। সুন্দরী মেয়েটি ঘাড় কাত করে বইয়ের দোকানে বই দেখতে লাগল।

ঃ কিরে, বিয়ে করেছিস নাকি?

ঃ হুঁ, হুট করে হয়ে গেল। কাউকে খবর দিতে পারিনি। তুই আছিস কেমন?

ঃ ভালই।

ঃ দাড়ি-টাড়ি যেভাবে বড় করছিস—দরবেশ হয়ে যাচ্ছিস মনে হয়।

ঃ চেষ্টা করছি।

ঃ চাকরি-বাকরি?

ঃ হবে-হবে করছে। যা তুই—তোর বউ বিরক্ত হচ্ছে।

করিম প্রায় ছুটে গেল তার পুতুল স্ত্রীর কাছে। সময় বদলে যাচ্ছে। পুরোনো বন্ধুত্বের গাঁথুনি আলগা হয়ে যাচ্ছে। আর পাঁচ বছর পর একজন অন্যজনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলবে, কেমন, ভাল? ব্যাস, ফুরিয়ে গেল।

দুপুরে রফিক নীলুর খোঁজ নিতে গেল। হাসি মুখে বলল, দেখতে এলাম কাজকর্ম কেমন আগাচ্ছে।

নীলুর জন্যে ছোটখাটো ছিমছাম একটা ঘর। টেবিলের উপর একটা টেলিফোন। রফিক চোখ কপালে তুলে বলল, টেলিফোনও আছে নাকি?

ঃ সবার টেবিলেই আছে। পিবিএক্স। ডিরেক্ট লাইন না।

ঃ খুব মালদার পার্টি মনে হচ্ছে।

নীলুর লজ্জা করতে লাগল।

ঃ কাজকর্ম শুরু করেছ নাকি?

ঃ না। প্রথম দিন কাজকর্ম কিছু নেই। এটা ওটা শিখছি। দুপুরবেলা ঘুরঘুর করছ কেন? বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর।

ঃ তোমাদের এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই? ক্যান্টিন-ফ্যান্টিন কি আছে?

ঃ আছে। চল যাই।

ক্যান্টিন দেখে রফিক মুগ্ধ হয়ে গেল। নীচু গলায় বলল, কাজ করলে এইসব বিদেশী ফার্মেই কাজ করতে হয়। তুমি ভাবী আমার জন্যে একটু ট্রাই করবে। বসটসদের ভজিয়ে ভাজিয়ে বলবে আমার কথা।

ঃ ওরা কি আমার কথা শুনবে?

ঃ এখন না শুনুক, বৎসর-খানিকের মধ্যেই শুনবে। তোমার কাজকর্মে খুশী হয়েই ওরা শুনবে। শুনতেই হবে।

ঃ তোমার ধারণা, আগামী এক বৎসরের মধ্যে তোমার চাকরি হচ্ছে না?

ঃ অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সে রকমই মনে হচ্ছে। অবস্থা সুবিধার না ভাবী।

ঃ হাল ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?

ঃ এখনো ছাড়িনি। ধরেই আছি। তবে ধরে থাকতে থাকতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে।

রফিক উঠে দাঁড়াল।

নীলু বলল, যাচ্ছ কোথায় এখন?

ঃ এক বন্ধুর বাসায়।

ঃ এখন কি কারো বাসায় যাবার সময়?

ঃ আন-এমপ্লয়েডদের সময়-অসময় বলে কিছু নেই।

ঃ তোমার বন্ধুও কি আনএমপ্লয়েড?

রফিক কোন জবাব দিল না। সে হেঁটে হেঁটে চলে এল পুরানো ঢাকায়। শারমিনদের বাসায় যাবার তার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবু সে কেন জানি দুপুরবেলায় উপস্থিত হল সেখানে। কাজের মেয়েটি বলল, আপা ঘুমাইতাছে। ডাকুম?

ঃ না, কোন দরকার নেই। আমি অপেক্ষা করব। ঘুম ভাঙ্গলে খবর দিও। পত্রিকা বা ম্যাগাজিন কিছু থাকলে দিয়ে যাও, বসে বসে পড়ি।

বড়লোকদের বাড়ির কাণ্ডকারখানাই অন্যরকম। কাজের মেয়েটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফীর লেটেস্ট সংখ্যাটি দিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে চা এবং কেকও এসে গেল। চা খেতে খেতে পত্রিকা ওল্টাতে ভালই লাগছে। চমৎকার সব ছবি। বিদেশী পত্রিকাগুলি ছবি দেখার জন্যেই বের হয় সম্ভবত। একটি এস্কিমো পরিবারের ছবি দেখে রফিক মুগ্ধ হল। স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। দেখেই মনে হয় চমৎকার একটি জীবন এদের। পাশ করে চাকরি খুঁজতে হয় না। বাড়ি বানোনোর জন্যে জমি কিনতে হয় না। যেখানে পছন্দ সেখানে বরফের একটা ঘর বানিয়ে নিলেই হল। রাতে তিমি মাছের তেলের বাতি জ্বালিয়ে সবাইকে নিয় গল্পগুজব চলবে। বাইরে হু-হু করে বইবে তুষার-ঝড়। চমৎকার একটা জীবন। রফিক একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল।

ঃ আরে, তুমি কখন এসেছ?

ঃ এই তো কিছুক্ষণ।

ঃ আমাকে ডাকনি কেন?

সারা দুপুর ঘুমিয়ে শারমিনের চোখ ভারী হয়ে আছে। এলোমেলো করে পরা শাড়ি, চুল বাঁধা নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে দৃশ্যটি এত সুন্দর।

ঃ চা দিয়েছে?

ঃ হুঁ।

ঃ কোন কাজে এসেছ, না এমনি এসেছ?

ঃ এমনি এসেছি।

ঃ এসো আমার সাথে।

ঃ কোথায়?

ঃ আসতে বলছি আস।

শারমিন তাকে নিয়ে এল দারোয়ানের ঘরের পাশের ছোট্ট ঘরটিতে। মার্টি শুয়ে আছে সেখানে। শারমিনকে ঢুকতে দেখে এক ধরণের ঘড়ঘড় শব্দ করল। শারমিন মৃদুস্বরে ডাকল, মার্টি সাহেব! মার্টি মাথা তুলে একবার মাত্র তাকাল, তারপরই মাথা নামিয়ে নিল।

ঃ ও বাঁচবে না। এই ঘরেই ওর শেষ শয্যা।

বলতে বলতে শারমিনের গলা ভারী হয়ে এল। কেঁদে ফেলবে নাকি?

ঃ বেচারার এত কষ্ট হচ্ছে। সারা রাত ঘুমায় না, কাঁদে শুধু।

রফিক কিছু বলল না। শারমিন নিচু হয়ে মার্টির মাথায় হাত রাখল। চাপা স্বরে বলল, পশুদের সবচে বড় কষ্ট হচ্ছে এরা নিজেদের কষ্টের কথা অন্যদের বলতে পারে না।

ঃ অনেক মানুষও সেটা পারে না।

ঃ বাজে কথা বলবে না। মানুষ ঠিকই পারে। আজ তোমার মনে কোন কষ্ট হলে সেটা তুমি কাউকে বলবে না?

ঃ সব কষ্টের কথা কি বলা যায়? কিছু কিছু কষ্টের কথা কখনো বলা যায় না।

শারমিন বলল, মার্টি গেলে আমার খুব কষ্ট হবে। আমার বন্ধু কেউ নেই। মার্টিই আমার বন্ধু। শারমিন উঠে দাঁড়াল। হালকা গলায় বলল, আজ কিন্তু তুমি রাতে খাবে এখানে।

ঃ কেন?

ঃ একা একা খেতে আমার খুব খারাপ লাগে। বাবা চিটাগাং গেছেন, কাল আসবেন। তুমি না এলে সাব্বির ভাইকে আসতে বলতাম।

ঃ উনি আমেরিকায় যাননি?

ঃ সামনের সপ্তায় যাবেন। মামার বাসায় আছেন। সাতদিনের জন্যে এসে বেচারাকে দু'মাস থাকতে হল, মায়ের অসুখ।

ঃ তুমি কি তাকে আপনি আপনি করে বল?

ঃ হুঁ।

ঃ কেন, আপনি বল কেন?

ঃ তুমি বলতে কেমন জানি লজ্জা লাগে।

ঃ উনি কিছু বলেন না এ নিয়ে?

ঃ খুব একটা বলেন না। হঠাৎ এক-আধদিন বলেন।

বাগানে বসে চা খাওয়া গেল না। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করছে। শারমিন বলল, এসো দোতলার বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখি।

ঃ বৃষ্টির মধ্যে দেখার কি আছে?

ঃ দেখার কিছু নেই? কি বল তুমি?

ঃ আমার মধ্যে এত কাব্য ভাব নেই।

সন্ধ্যা পর্যন্ত রফিক বারান্দায় বসে রইল। তেমন কোন কথাবার্তা ওদের মধ্যে হল না। শারমিন কেমন অন্যমনস্ক। কথাবার্তা কিছুই বলছে না। রফিকের হঠাৎ খুব মনখারাপ হল। কেন সে বার বার ঘুরে ঘুরে এখানে আসে? এটা ঠিক না। কেন সে আসবে?

ঃ শারমিন, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে উঠি।

ঃ খেয়ে যেতে বললাম না?

ঃ না, আজ থাক অন্য একদিন।

ঃ আজ অসুবিধা কি?

রফিক হাল্কা স্বরে বলল, আজকের রাতটা খুব চমৎকার। তুমি সাব্বির সাহেবকে আসতে বল। দুজনে মিলে খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বসে গল্প-টল্প কর।

শারমিন কিছু বলল না। রফিক উঠে দাঁড়াল। অন্য সময় শারমিন আসতো তার সঙ্গে সঙ্গে। ড্রাইভারকে বলত পৌঁছে দিতে। আজ সে কিছুই করছে না।

রফিক ভিজতে ভিজতেই রওনা হল। তার বার বার ইচ্ছা করছিল পেছনে ফিরে শারমিনকে একবার দেখতে, কিন্তু সে তাকাল না। মার্টি সাহেব কাঁদছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে সে কান্না মিশে কেমন অদ্ভুত শুনাচ্ছে।

গেটের দারোয়ান বলল, চলে যাচ্ছেন নাকি স্যার?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ গাড়ি নিয়ে যান। গাড়ি আছে তো। ড্রাইভার চা খেতে গেছে, ডেকে নিয়ে আসছি।

ঃ ডাকতে হবে না।

রফিক লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল। দারোয়ান শ্রেণীর কারোর গলায় এমন শুদ্ধ ভাষা শুনতে ভাল লাগে না। কেন লাগে না? এটা কি অত্যন্ত বাজে ধরণের একটা মানসিকতা নয়? দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এর মধ্যে অবাক হবার কি আছে? এরা কি রফিকের এখানে আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে?

মনোয়ারা গম্ভীর মুখে বললেন, বৌমা, আজ অফিসে যাবে না?

নীলু হাসি মুখে বলল, আজ টুনীর জন্মদিন। অফিস যাব না।

মনোয়ারা কিছু বললেন না। আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। নীলুর খুব ইচ্ছা টুনীর দ্বিতীয় জন্মদিনটি খুব ভালমত করে। প্রথমটি করা হয়নি। সফিক কোন রকম উৎসাহ দেখায়নি। বিরক্ত মুখে বলেছে, জন্মদিন আবার কি?

নীলু বলেছে, আমাদের জন্যে তো না, টুনীর জন্যে।

ঃ এক বছরের বাচ্চা, ও জন্মদিনের কি বোঝে? বাদ দাও।

এ বছরে সে রকম কিছু বলতে পারবে না। টুনীর বয়স এখন দুই। জন্মদিনটি সে কিছু কিছু বুঝতে পারবে। আর না পারলেও জানবে তাকে ঘিরে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। সফিক বলতে পারবে না টাকা-পয়সা নেই। এর জন্যে সে টাকা আলাদা করে রেখেছে। তেমন কোন বড় উৎসব হবে না। একটা কেক কাটা হবে। কিছু ভালমন্দ রান্না হবে। টুনীকে সঙ্গে নিয়ে সে এবং সফিক একটা ছবি তুলবে স্টুডিওতে। প্রতি বছর এ রকম একটি করে ছবি তোলা হবে। সেই ছবির অ্যালবামটি টুনীর বিয়ের সময় টুনীকে উপহার দেয়া হবে। প্রথম জন্মদিনের ছবিটি অবশ্যি তোলা হয়নি।

সফিক অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, নীলু এসে বলল, তুমি কি আজ একটু সকাল সকাল আসতে পারবে?

ঃ না।

ঃ একটু চেষ্টা করে দেখ না।

ঃ কেন?

ঃ টুনীর আজ জন্মদিন না। তুমি এলে তোমাকে নিয়ে স্টুডিওতে একটা ছবি তুলব। সফিক জবাব দিল না। নীলু নরম স্বরে বলল, প্লীজ।

ঃ আচ্ছা দেখি।

ঃ দেখাদেখি না, আসতেই হবে। সন্ধ্যাবেলা কেক কাটা হবে। রাতে একটু খাওয়া-দাওয়া হবে।

ঃ অনেককে বলেছ নাকি?

ঃ না, বন্যাকে বলেছি। ও তার হাসবেণ্ডকে নিয়ে আসবে, আনিসকে বলেছি। আনিস ম্যাজিক দেখাবে।

ঃ ও ম্যাজিক জানে নাকি?

ঃ শিখছে। জানে নিশ্চয়ই। তুমি যদি তোমার কোন বন্ধু-বান্ধবকে বলতে চাও বল।

ঃ আমার আবার বন্ধু-বান্ধব কোথায়?

ঃ কেউই নেই?

সফিক জবাব দিল না।

নীলুর ধারণা ছিল, রফিককে বাজারে পাঠানো সমস্যা হবে। সে যেতে চাইবে না। ইদানীং সে অল্পতেই রেগে ওঠে। বাজারের কথা বললেই নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বাজার করাই শেষ পর্যন্ত আমার ক্যারিয়ার হবে। বাজার সরকারের কাজই পাব। অন্য কিছু পাব না।

আজ সে খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজি হল। শার্ট পরতে পরতে বলল, সিরিয়াস একটা হৈ চৈ হবে মনে হয়। বিরাট খাওয়া-দাওয়া নাকি?

ঃ বিরাট কিছু না। তোমার কোন বন্ধু-বান্ধবকে বললে বলতে পার।

ঃ বেকারের কোন বন্ধু-বান্ধব থাকে না। লিস্টি দাও, কি কি নিয়ে আসতে হবে বল। ঘর সাজানো হবে নাকি?

ঃ দাও না সাজিয়ে। বেলুন টেলুন দিয়ে সাজালে ভালই লাগবে।

ঃ সাজিয়ে দিতে পারি, তবে একশ টাকা ফিজ লাগবে।

ঃ দেব, ফিজ দেব।

সবচে আগ্রহ দেখা গেল শাহানার মধ্যে। তার উৎসাহের সীমা রইল না। সে কলেজে গেল না। নিজেই নিউমার্কেট থেকে রঙিন কাগজ কিনে আনল। হোসেন সাহেবও তার সঙ্গে জুটে গেলেন। শিশুদের উৎসাহ নিয়ে রঙিন কাগজের শিকল বানাতে বসলেন। মনোয়ারা বিরক্ত মুখে বললেন, তুমি বুড়ো মানুষ, রঙ্গিন কাগজ দিয়ে মালা বানাতে বসেছ?

ঃ বুড়ো মানুষরা মালা বানাতে পারবে না, এরকম কোন আইন আছে নাকি?

ঃ বাজে তর্ক করবে না।

ঃ এতদিন পরে একটা উৎসব হচ্ছে বাড়িতে আর তুমি ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছ এটা ঠিক না।

ঃ কি ঝগড়া বাধালাম?

ঃ এই তো বাধাচ্ছ। আমি এখন একটা কথা বলব, তুমি তার উত্তরে দশটা কথা বলবে। তারপর আমি আবার আরেকটা কথা বলব, তুমি তার উত্তরে বলবে বিশটা, তারপর....।

মনোয়ারা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মাথা ধরেছে এই অজুহাতে বিছানায় শুয়ে রইলেন। কোন ব্যাপারেই কোন রকম আগ্রহ দেখালেন না। নীলু যখন এসে বলল, পোলাওটা একটু বসিয়ে দিন না মা, তখন তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন, তুমি কি পোলাও রান্না ভুলে গেছ নাকি? নীলুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

সফিকের জন্যে সে সেজেগুজে বিকাল থেকেই বসে ছিল। সফিক আসামাত্র ছবি তুলতে যাবে। টুনীও খুব আগ্রহ নিয়ে নতুন জামা পরে বসে আছে। সে বার বার বলছে, বাব্বা কখন আসবে? বাব্বা হচ্ছে আব্বা। টুনী কিছু কিছু শব্দ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে। আব্বা হল বাব্বা। পাচ্ছি হচ্ছে পাখি। সে 'আ' 'বা' 'পা' উচ্চারণ করতে পারে না তা নয়, ঠিকই পারে।

তবু নতুন শব্দগুলি কেন বলে কে জানে। শিশুদের মধ্যে অনেক দুর্বোধ্য ব্যাপার আছে।

সাড়ে ছ'টা বেজে গেল, সফিক এল না। শাহানা বলল, তুমি একাই টুনীকে নিয়ে ছবি তুলে আস ভাবী, ভাইয়া আসবে না।

ঃ বলেছিল তো আসবে।

ঃ আসার হলে এসে যেত। চল আমরা তিনজনে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাই। শ্যামলীতে একটা ভাল স্টুডিও আছে।

ঃ আরেকটু দেখি।

শুধু সফিক নয়, বন্যাও আসেনি। নীলুর মন খারাপ হয়ে গেল। এত চমৎকার করে ঘর সাজানো হয়েছে অথচ লোকজন কেউ নেই। কেউ আসুক না আসুক, সফিক তো আসবে। হোসেন সাহেব বললেন, টুনী ঘুমিয়ে পড়বে বৌমা, কেকটা কাটাও। আনিস ম্যাজিক শুরু করুক, আমরা দেখি বসে বসে। উৎসবটা জমছে না মোটেই।

নীলু মৃদু স্বরে বলল, আরেকটু অপেক্ষা করি, ও এসে পড়বে।

আনিস চূড়ান্ত রকমের নার্ভাস। আজই তার জীবনের প্রথম ম্যাজিক শো। কে জানে কি হবে। পাঁচটা আইটেম সে তৈরী করে রেখেছে। আইটেম হিসেবে পাঁচটাই চমৎকার। আজ সারাদিনে সে প্রতিটি আইটেমই প্রায় এক হাজার বার করে প্র্যাকটিস করেছে। তবু তার মনে হচ্ছে, আসল সময়ে একটা কিছু গণ্ডগোল হয়ে যাবে। সবচে বড় সমস্যা হচ্ছে তার কোন কনফিডারেট নেই, যে দর্শকদের মধ্যে বসে থাকবে। প্রয়োজনের সময় বিশেষ

সাহায্যটি করবে। এরকম একজন কাউকে পাওয়া গেলে চমৎকার একটা ম্যাজিক দেখানো যেত। আনিস চিন্তিত মুখে বীণার সঙ্গে কথা বলতে গেল। বীণাকে বলে দেখা যেতে পারে। সে রাজী হবে কি হবে না কে জানে।

বীণা সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, কি করতে হবে বলে দেন, নো প্রবলেম।

ঃ বিশেষ কিছুই না, টেবিলের উপর একটা রুমালে আঙটি লুকানো থাকবে। তুমি আঙটি আছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়ে আঙটিটি তুলে নিয়ে আসবে।

ঃ তুলে আনবার সময় কেউ দেখবে না?

ঃ না। সবার নজর তাকবে ম্যাজিসিয়ানের দিকে। সেই সময় একটা বক্তৃতা শুরু করব আমি। পারবে না?

ঃ পারব না কেন? নিশ্চয়ই পারব।

আনিস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লতিফা বললেন, তোর ও বাড়িতে যাবার কোন দরকার নেই।

ঃ দাওয়াত দিয়েছে, যাব না?

ঃ না।

ঃ এসব বলে তো মা লাভ নাই। আমি যাব।

লতিফা গম্ভীর হয়ে রইলেন। মেয়েকে আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। কেন জানি তিনি বীণাকে কিছুটা ভয় পেতে শুরু করেছেন। বীণা দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছে। আনিসের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোন্ পর্যায়ে এই নিয়ে তিনি খুব ভাবেন। তাঁর ধারণা বীণা আনিসকে মাঝে মধ্যে এটা ওটা কিনে দেয়। এই ধারণাটা হয়েছে গত পরশু। বীণা একা একা নিউ মার্কেটে গিয়েছিল। নিউমার্কেট থেকে ফিরেই সে বেড়াতে গেল ছাদে। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি দেখলেন, আনিস লাল রঙের একটি নতুন চেকশার্ট গায়ে দিয়ে হাসি মুখে নামছে। এর মানেটা কি? সারাটা দিন লতিফার খুব খারাপ কাটল। সন্ধ্যার পর বীণাকে খুব সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আনিসের গায়ে একটা নতুন শার্ট দেখলাম।

বীণা হাই তুলে বলল, আমিও দেখলাম। খুব মানিয়েছে।

ঃ লাল রঙ ব্যাটাছেলেদের মানাবে কি?

ঃ লাল হচ্ছে এমন একটা রঙ, যা সবাইকেই মানায়।

ঃ নিউমার্কেট থেকে তুই কি কি কিনলি?

ঃ তেমন কিছু না, দু'দিস্তা কাগজ, একটা বল পয়েন্ট পেন।

ঃ এসব কিনার জন্যে নিউমার্কেট যেতে হল? সুরমা স্টোরেই তো পাওয়া যায়।

ঃ তা যায়, তবু গেলাম।

লতিফা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, নিউমার্কেট থেকে ফিরেই ছাদে গেলি কেন?

ঃ এম্নি গেলাম। ছাদে যাওয়া নিষেধ নাকি?

লতিফা একবার ভাবলেন, সরাসরি জিজ্ঞেস করেন শার্টটা বীণা কিনে দিয়েছে কিনা। সাহস হল না। ঘরে একটা বড় মেয়ে থাকায় কত যে সমস্যা। চোখের আড়াল হলেই বুক ধড়ফড় করে। বীণা গিয়েছে শাহানাদের ওখানে, ঘন্টাখানিকের ব্যাপার তবু ভাল লাগছে না। আনিসটাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দিতে পারলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত। লতিফা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

টুনী বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। রফিক বলল, ভাবী, আমি টেলিফোন করে দেখি ভাইয়া অফিসে আছে কিনা। টেলিফোনের কথাটা নীলুর মনে আসেনি। আগেই টেলিফোন কবা যেত।

ঃ কোত্থেকে কববে? রসিদ সাহেবের বাসা থেকে?

ঃ না, গ্রীন ফার্মেসী থেকে। চেনা লোক আছে। ভাইয়ার টঙ্গী অফিসের নাম্বার তোমার কাছে আছে?

ঃ না।

ঃ ঠিক আছে, আম্মি বের কবে নেব।

টুনীকে শুইয়ে দিতে গিয়ে নীলুর চোখে পানি এসে গেল। মানুষ এমন হয়, আশ্চর্য। নীলুর ইচ্ছা করতে লাগল বাতিটাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকে টুনীর পাশে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাকে হাসি মুখে সবার সামনে ঘুবে বেড়াতে হবে। আনিসের ম্যাজিক দেখতে হবে।

ঃ ভাবী?

ঃ কি শাহানা?

ঃ তাড়াতাড়ি এসো, কে একজন মেয়ে এসেছে আমাদের বাসায়। পবীর মত সুন্দব। না দেখলে তুমি বিশ্বাস কববে না। উপহাবেব প্যাকেট আছে হাতে।

ঃ বন্যা নাকি?

ঃ আরে না। উনাকে বুঝি আমি চিনি না? তুমি তাড়াতাড়ি আস।

নীলুও তাকে চিনতে পাবল না। মেয়েটি বিব্রত মুখে বলল, আমার নাম শারমিন। রফিকের সঙ্গে পড়ি। ও আমাকে দাওয়াত দিয়েছে, টুনির নাকি জন্মদিন।

ঃ হ্যাঁ। তুমি বস।

ঃ আপনি ওর ভাবী?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি সবাইকে চিনি। ও হচ্ছে শাহানা, তাই না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমাদের জন্মদিনের মানুষটি কোথায়?

ঃ টুনী ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঃ ওর উপহারটা হাতের কাছ রেখে আসি।

নীলু ভেবে পেল না।,এই মেয়েটির কথাই কি রফিক মাঝে মধ্যে তাকে বলে।?এমন চমৎকার একটি মেয়ে? শারমিন হোসেন সাহেব ও মনোয়ারা দু'জনকেই বিনীতভাবে সালাম করল। হোসেন সাহেব তাঁর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে নিতান্ত পরিচিতজনের মত গল্প শুরু করে দিলেন। এমুন কি মনোয়ারা পর্যন্ত মিশুক স্বরে গল্পে যোগ দিলেন।

ঃ বাসা কোথায় তোমার?

ঃ পুরানো ঢাকায়।

ঃ এত দূর একা একা এসেছ?

ঃ গাড়ি নিয়ে এসেছি। আর রাত বেশী হয়নি, সাতটা মাত্র বাজে।

শাহানা শারমিনকে নিয়ে ছাদ দেখাতে গেল। সে তাড়াতাড়ি কারো সঙ্গে সহজ হতে পারে না, সেও চট করে সহজ হয়ে গেল। শাহানার খুব ইচ্ছা করতে লাগল এই চমৎকার মেয়েটিকে ম্যাজিসিয়ান আনিসের কথা বলে। কাউকে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে।

ঃ এখানে কেউ থাকে নাকি শাহানা?

ঃ আনিস ভাই থাকেন।

ঃ আনিস ভাই কে?

ঃ আনিস ম্যাজিসিয়ান। যা সুন্দর ম্যাজিক দেখান।

ঃ তুমি দেখেছ?

ঃ না।

ঃ তাহলে বুঝলে কি করে সুন্দর?

শাহানা চুপ করে গেল। শারমিন হাসিমুখে বলল, আমি ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে একবার গিয়েছিলাম ইংল্যাণ্ড, সেখানে মিঃ স্মিথের ম্যাজিক দেখেছি। অপূর্ব!

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ। ভদ্রলোক একটা ইউনির্ভাসিটির অঙ্কের প্রফেসর। অথচ প্রফেশন্যাল ম্যাজিসিয়ানদের হার মানাতে পারেন।

শারমিন জন্মদিনের উৎসবে এসেছে এটা শুনে রফিকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। টেলিফোনে জন্মদিনের দাওয়াত অবশ্যি সে দিয়েছে। সেটাও তেমন কোন জোরালো দাওয়াত নয়। শারমিনও আসবে এমন কোন ইঙ্গিত দেয়নি। ঠিকানা অবশ্যি জিজ্ঞেস করেছিল।

নীলু বলল, শাহানা ওকে ছাদে নিয়ে গেছে।

ঃ শীতের মধ্যে ছাদে কেন?

নীলু হেসে ফেলল, মমতা খুব বেশী মনে হচ্ছে!

ঃ তুমি যা ভাবছ তা না ভাবী, শারমিনের শিগগীরই বিয়ে হচ্ছে। আগস্টে হবার কথা ছিল, পিছিয়ে গেছে।

ঃ আমি অবশ্যি মনে মনে আশা করছিলাম, এ মেয়ে এই বাড়িতেই আসবে।

ঃ পাগল হয়েছ? এরা যে কি সিরিয়াস বড়লোক এটা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।

ঃ সিরিয়াস বড়লোকদের মেয়েরা বুঝি বিয়ে করে না?

ঃ করে তবে আমার মত কাউকে করে না।

সফিক আধঘন্টার মধ্যে চলে আসবে বলেছিল, একঘন্টা পার হয়ে গেল, তার দেখা নেই। হোসেন সাহেব বললেন, আনিসের ম্যাজিকটা শুরু হয়ে যাক, দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি বরং টুনীকে ঘুম থেকে তোল।

টুনীর ঘুম ভাঙ্গানো গেল না। আজ দুপুরে ঘুমায়নি, সহজে সে আর জাগবে না। নীলু বলল, থাক ও ঘুমাক, আসুন আমরা ম্যাজিক দেখি।

আনিস এই শীতেও রীতিমত ঘামছে। হাত-পা কাঁপছে, কি অবস্থা হবে কে জানে। প্রতিটি আইটেমই অনেকবার করে করা। চোখ বন্ধ করেও এসব করা যাবে কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে এক্ষুণি একটা হাসির কাণ্ড হবে। শাহানা বলল, শুরু করুন আনিস ভাই।

বীণা বসে আছে শাহানার পাশে। বীণার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। কারো সঙ্গেই সে কোন কথাবার্তা বলছে না। যে কোন কারণেই হোক সে অস্বস্তি বোধ করছে। আনিস প্রায় একশ ভাগ নিশ্চিত সে আঙটি সরিয়ে দিতে পারবে না। আনিস ঘরের কোণের দিকে সরে গেল। তার হাতে কিছু নেই।

ঃ আমি তাহলে শুরু করছি। দেখুন আমার হাত, হাতে কিছু নেই।

হোসেন সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। ম্যাজিকের ব্যাপারে তিনি দারুণ উৎসাহ বোধ করছেন। আনিস তার খালি হাত দেখিয়ে মুহূর্তেই দু'টি টকটকে লাল রুমাল তৈরী করল। হোসেন সাহেব মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

শাহানা বলল, দেখি, রুমাল দু'টি আমার হাতে দিন তো আনিস ভাই। পরীক্ষা করে দেখি।

ঃ ম্যাজিকের রুমাল তো দেয়া যাবে না।

বলতে বলতেই আনিস রুমাল দুটি নিশানের মত কিছুক্ষণ বাতাসে উড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হল একটি টকটকে লাল গোলাপ। আনিস গোলাপটি এগিয়ে দিল শাহানার দিকে। শাহানা কেন জানি খুব লজ্জা পেল। হোসেন সাহেব মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, অদ্ভুত ম্যাজিক। এত সুন্দর ম্যাজিক আমার জীবনে আমি দেখিনি।

বীণা শুধু কঠিন দৃষ্টিতে বসে রইল। সে আশা করেছিল এই গোলাপটি সে পাবে।

আনিস আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, কাজেই তার তৃতীয় ম্যাজিক লিংকিং রিং হল চমৎকার। রফিক বলল, এ তো সিরিয়াস ম্যাজিশিয়ান। ঠিক না শারমিন?

ঃ হ্যাঁ, আমার নিজেরই এখন ম্যাজিক শিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

শাহানা বলল, মিঃ স্মিথের ম্যাজিকের মত লাগছে আপনার কাছে?

ঃ হ্যাঁ, সেরকমই লাগছে।

শেষ ম্যাজিকে গণ্ডগোল হয়ে গেল। আংটি হাওয়া করে দেয়ার ম্যাজিক। আনিস শারমিনের আংটি নিয়ে রুমালে ভরে রাখল টেবিলে। হাসি মুখে বলল, এখানে আংটি আছে, এ বিষয়ে কি কারো কোন সন্দেহ আছে। সন্দেহ থাকলে হাত রুমালে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে যান।

বীণার দায়িত্ব হচ্ছে পরীক্ষা করতে এসে আংটি উঠিয়ে নেয়া। সে উঠে দাঁড়াল এবং সরু গলায় বলল, আমার মাথা ধরেছে, আমি বাসায় যাব।

শাহানা বলল. আরে এখন যাবে কি? দেখে যাও কি হয়?

ঃ যা ইচ্ছা হোক, আমার ভাল লাগছে না।

আনিস বীণার এই হঠাৎ রাগের কোন কারণ খুঁজে পেল না। সে বলল, বীণা এসে দেখে যাও আংটি আছে কিনা।

ঃ অন্যরা দেখুক।

বীণা গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। শেষ ম্যাজিকটি আনিসের দেখানো হল না। হোসেন সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আনিস, আঙটিটার কি হল দেখাও?

ঃ ম্যাজিকের মাঝখানে কেউ উঠে গেলে সে ম্যাজিক আর দেখানো যায় না।

ঃ তাই নাকি? জানতাম না তো।

ঃ এটাই অন্য কোন দিন দেখাব।

শাহানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মন বলছে—বীণার মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। কি হয়েছে সে সম্পর্কে তার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, তবে সে একেবারেই যে বুঝতে পারছে না তাও নয়।

মনোয়ারা ম্যাজিক শেষ হওয়ামাত্র নীলুকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, শারমিন মেয়েটি কেন এসেছে এ বাড়িতে?

ঃ রফিক দাওয়াত করেছে তাই এসেছে।

ঃ দাওয়াত করবে আর হুট করে চলে আসবে? তাও একা একা এসেছে। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।

ঃ ঐসব কিছু না মা।

ঃ তুমি বুঝলে কি করে ঐসব কিছু না? বড়লোকের মেয়ে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছে।

নীলু কিছু বলল না।

ঃ রফিক চাকরি-বাকরি কিছু খুঁজছে না। ঐ মেয়ের পেছনে ঘুরঘুর করে সময় কাটাচ্ছে।

ঃ না মা, চাকরির চেষ্টা ও ঠিকই করছে।

বাজে কথা বলবে না। চেষ্টা করলে এই অবস্থা হয়? হয় না। আর কিছু যে হচ্ছে না সেই নিয়ে কোন মাথা-ব্যথাও নেই। দিব্যি মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে। আজ আমি তাকে কিছু কথা শুনাব।

ঃ থাক মা, আজ আর কিছু না বললেন।

ঃ কেন ? তাকে কথা শুনাতে হলে আগে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে? পঞ্জিকা দেখতে হবে?

ঃ আস্তে কথা বলুন, মা ওরা শুনবে।

ঃ শুনলে শুনুক, আমি কাউকে ভয় পাই নাকি? ওর রোজগারে আমি খাই?

ঃ ওদের খাবার দিয়ে আসি মা। রাত হয়ে যাচ্ছে।

সফিক ফিরল এগারোটায়।

নীলু না খেয়ে অপেক্ষা করছিল। সে কিছুই বলল না। সফিক বলল, জন্মদিন কেমন হল?

ঃ ভালই।

ঃ লোকজন এসেছিল?

ঃ এসেছে কেউ কেউ। তুমি হাতমুখ ধুয়ে আস, খাবার গরম করছি। নাকি খেয়ে এসেছ?

ঃ না, খাব কোথায়? অফিসে একটা ঝামেলা হল।

নীলু কোন আগ্রহ দেখাল না।

ঃ স্যারেনসেন মনে হয় চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ। অবশ্যি গুজবও হতে পারে।

নীলু নিঃশব্দে ভাত বেড়ে দিতে লাগল। সফিকের কথাবার্তা তার শুনতে ইচ্ছা করছে না। সারাদিনে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সফিক ভাত মাখতে মাখতে বলল, হুইস্কি খেয়ে ব্যাটা খুব হৈ-চৈ করছিল আজ, কেলেঙ্কারি অবস্থা।

সফিক অনেক রাত পর্যন্ত বসার ঘরে বসে বসে সিগারেট টানল। নীলু যখন বলল, ঘুমুবে না? তখন সে নিয়ম ভঙ্গ করে চা খেতে চাইল, কষ্ট না হলে একটু চা কর তো নীলু। কাজের ছেলেটা কোথায়? ওকে দেখছি না কেন?

ঃ মা বিদায় করে দিয়েছেন।

ঃ কবে করলেন?

ঃ গত সপ্তাহেই করেছেন, তোমার চোখে পড়েনি বোধহয়।

সফিক আর কিছু বলল না। চা খেতে খেতে এলোমেলো ভাবে কিছু কথাবার্তা হল। যেমন, রফিকের কিছু হয়েছে? চেষ্টা করছে না বোধহয় সে রকম। চাকরির বাজার এতটা খারাপ নিশ্চয়ই না।

প্রশ্ন করার জন্যেই করা। নীলু বলল, আমি ঘুমুতে যাচ্ছি।

সফিক কিছু বলল না।

নীলু শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল। তারা দুজনে কি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে? বোধহয় যাচ্ছে। কিন্তু কেন? দোষটা কার? সফিকের একার নিশ্চয়ই নয়। তারও নিশ্চয়ই কোন ভূমিকা আছে। সংসারের পেছনে সফিককে একা খাটতে হচ্ছিল। এখন সে কিছু সাহায্য করছে, সফিকের সেটা পছন্দ নয়। শুধু সফিক নয়, তার শাশুড়িরও।

প্রথম বেতনের টাকা থেকে এক হাজার টাকা সে মনোয়ারাকে দিতে গেছে, তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, ঐ টাকা তোমার কাছেই রাখ বৌমা। আগে যদি সফিকের টাকায় চলেছে এখনো চলবে। সফিকও বলেছে একই কথা তবে একটু ঘুরিয়ে, রেখে দাও, দরকার হলে নেব।

প্রথমদিকের সেই অবস্থা এখন নেই। মনোয়ারা এখন টাকা নেন। গতমাসে বললেন, সামনের মাস থেকে আরো কিছু বেশী দিতে পার কিনা দেখ তো বৌমা।

নীলু তার নিজের মা'কে প্রতি মাসেই দু'শ টাকা করে দিচ্ছে। তিনি বার বার লিখেছেন, কোন দরকার নেই। যখন দরকার হবে আমি চাইব। তিনি চাইবেন না কোনদিন। তাঁর ধাবণা, মেয়ের টাকায় তাঁর কোন অধিকার নেই। এটা একটা মিথ্যা ধারণা। ছেলের টাকায় মা'র অধিকার থাকলে মেয়ের টাকায়ও থাকবে। কেন থাকবে না?

নীলুর চাকরি কেউ পছন্দ করছে না, কিন্তু তার টাকায় বাড়তি কিছু সুখ কি আসছে না? সে টাকা জমাচ্ছে। মাস তিনেকের ভেতরেই একটি টিভি কেনার মত টাকা জমে যাবে। এটা কম কি—নিশ্চয়ই কম নয়। মশারীর ভেতর কয়েকটা মশা ঢুকে গেছে। গুন গুন করছে কানের কাছে। নীলুর উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে কিন্তু পুরোপুরি ঘুম আসছে না। বিয়ের আগে এরকম হত। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হত। তখন সময়টাও খুব খারাপ ছিল। বিয়ে দেবার জন্যে মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিয়ের কোন প্রস্তাবই আসে না। বড় ভাবী খুব কায়দা করে কাটা কাটা কথা শোনান। তাঁর প্রতিটি কথার তিন চার রকম মানে হয়। এককেবার প্রচণ্ড রাগ হত। কিন্তু কার উপর রাগ করবে? মা'র উপর? যার কেউ নেই, তার উপর রাগ করা যায় না।

টুনী কাঁদতে শুরু করেছে। কোন ভয়ের স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে বোধহয়।

ঃ কি হয়েছে মা, ভয় লাগছে?

ঃ না।

ঃ বাথরুম?

ঃ না।

ঃ পানি খাবে?

ঃ না।

ঃ তাহলে কাঁদছ কেন?

ঃ বাথরুম করব।

নীলু টুনীকে কোলে নিয়ে নামল। টুনী বলল, বাথরুম করব না, দাদুর সঙ্গে ঘুমাব।

ঃ কাল ঘুমিও।

ঃ না, আজ।

নীলু রাতদুপুরে হোসেন সাহেবের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। প্রায় রাতই এখন এরকম হচ্ছে. টুনী ঘুমুতে যাচ্ছে দাদুর সঙ্গে। দাদুকে এখন গল্প বলে বলে ঘুম পাড়াতে হবে। মনোয়ারা বিরক্ত হবেন। খিটিমিটি বাধবে দু'জনের মধ্যে।

রাত নটা।

রহমান সাহেব খেতে এসে দেখেন শারমিন দোতলা থেকে নিচে নামেনি। জমিলার মা বলল, আপা ভাত খাইবেন না।

ঃ কেন?

ঃ কিছু কন নাই। শরীর খারাপ মনে হয়।

রহমান সাহেব বিস্মিত হলেন। শরীর ভাল থাকুক না থাকুক, খাবার সময় শারমিন উপস্থিত থাকে। কিছুদিন থেকে তিনি তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছেন। রহমান সাহেব নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলেন। রাতের খাবার সময়টা তিনি বেশ আনন্দে কাটান। ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে হালকা আলাপ করেন শারমিনের সঙ্গে। অফিসের ব্যাপার নিয়েও কথাবার্তা হয়। আজ তিনি একটি জরুরী ব্যাপার নিয়ে শারমিনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। নাইক্ষ্যংছড়িতে তিনি একটা রাবার চাষের পবিকল্পনা নিতে চাচ্ছেন, এই বিষয়ে মতামত জানা।

রহমান সাহেব খাওয়া শেষ করে শারমিনের দরজায় টুকা দিলেন।

ঃ মা জেগে আছে?

ঃ আছি।

ঃ শরীর খারাপ নাকি ?

ঃ হ্যাঁ।

জবাব না দিয়ে শারমিন দরজা খুলল. রহমান সাহেব চমকে উঠলেন। ফ্যাকাশে মুখ শারমিনের। চোখ লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র কেঁদে উঠেছে।

ঃ এসো আমার ঘরে, গল্প করি।

শারমিন চাদর গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে এল। রহমান সাহেবের মনে হল, মেয়েটি খুব একলা হয়ে পড়েছে। নিঃসঙ্গতার চেয়ে বড় কষ্ট তো আর কিছু নেই। এই কষ্টটার ধরণ তাঁর মত আর কেউ জানে না। তারা দু'জন নিঃশব্দে রহমান সাহেবের প্রকাণ্ড শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঃ খাটে পা তুলে আরাম করে বস তো মা।

শারমিন বসল খাটে। রহমান সাহেব আচমকা প্রশ্ন করলেন, সাব্বিরের সঙ্গে তোমার ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি?

ঃ না, ঝগড়া হবে কেন?

ঃ ফিরে যাবার সময় এয়ারপোর্টে তাকে খুব গম্ভীর দেখলাম।

ঃ পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। অনেক রকম ঝামেলা যাচ্ছে উনাদের। তাঁর মা'রও অসুখ ছিল।

ঃ তুমি কি তাকে দেখতে গিয়েছিলে?

ঃ ঢাকায় নেই তো উনি। জামালপুরে তাঁর মেয়ের কাছে থাকেন।

রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিছুদিন হল আবার শুরু করেছেন। তাঁর মনে হচ্ছিল শারমিন সিগারেটের প্রসঙ্গে কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না।

ঃ সাব্বির তোমাকে চিঠিপত্র লিখেছে তো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ জবাব দাও তো তুমি?

ঃ হ্যাঁ, দেই। দেব না কেন?

ঃ আমি আজ তার একটা লম্বা চিঠি পেয়েছি। সে দেশে চলে আসছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে পড়বে। তোমাকেও নিশ্চয়ই লিখেছে ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি ঠিক করেছি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলব। কি বল তুমি?

শারমিন কিছু বলল না। রহমান সাহেব বললেন--খুব জমকাল একটা উৎসব করতে চাই। তোমার মা'র শখ ছিল জমকাল উৎসবের।

শারমিন এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে কিছু শুনছে না। অন্য কিছু ভাবছে। রহমান সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি আশা করেছিলেন বেশ অনেকক্ষণ গল্প গুজব করবেন। মেয়েটি ক্রমেই কি দূরে সরে যাচ্ছে? বিয়ের পর নিশ্চয়ই আরো দূরে যাবে।

শারমিন মৃদুস্বরে বলল, বাবা, তুমি তোমার কোন কারখানায় একটি চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবে?

রহমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কার চাকরি?

ঃ আমাদের সঙ্গে পড়ত একটা ছেলে। অনেকদিন ধরে চাকরির চেষ্টা করছে। পাশ করবার পর প্রায় দু'বছর হয়ে গেল।

রহমান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যে ছেলে দু'বছর চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না, সে মোটামুটি ভাবে একজন অপদার্থ।

ঃ অপদার্থ হবে কেন? দেশের অবস্থা খারাপ।

ঃ খারাপ ঠিকই কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলেরা এই খারাপ অবস্থার মধ্যেও গুছিয়ে নিতে পারে।

শারমিন কিছু বলল না। রহমান সাহেব বললেন, ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে, আমি দেখব। ও কি প্রায়ই আসে নাকি এখানে?

ঃ না, প্রায়ই আসবে কেন?

ঃ ঠিকানা জান?

ঃ না, জানি না।

বলেই শারমিন চমকে উঠল। এই মিথ্যাটা সে কেন বলল? কোন দরকার ছিল না তো?

ঃ ঠিকানা না জানলে খবর দেবে কি করে?

শারমিন লজ্জিত মুখে বলল, আমি ঠিকানা জানি।

রহমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ বাবা, আমার মাথা ধরেছে, ঘুমুতে যাই।

শারমিন উঠে দাঁড়াল। তার সত্যি সত্যি মাথা ধরেছে। জ্বর আসছে বোধহয়। রহমান সাহেব বললেন, একটু বস। আদা-চা করে দিক, মাথাব্যথা কমবে। তিনি চায়ের কথা বলবার জন্যে উঠে গেলেন। এবং তখনই জানতে পারলেন, আজ বিকেলে মার্টি মারা গেছে। খবরটি দিতে গিয়ে জয়নালের মুখের ভাব এরকম হল, যেন সে নিজেই মার্টিকে মেরেছে।

ঃ আমাকে খবরটা তখন দাওনি কেন?

ঃ আপা নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন ভাত খাওয়ার পরে দিতে।

রহমান সাহেব মার্টিকে দেখতে গেলেন। ঠাণ্ডা মেঝেতে মার্টি এলিয়ে পড়ে আছে। তার গায়ে মোটা একটা কম্বল।

ঃ মারা গেল কিভাবে?

ঃ জানি না। খাওন দিতে গিয়া দেখি এই অবস্থা।

ঃ শারমিন কি খুব কান্নাকাটি করছিল?

ঃ জ্বি না।

ঃ কিছুই বলেনি?

ঃ বলছেন সকাল হইলে মাটি দিতে। বরই গাছের নিচে।

ঃ মার্টির গায়ে কম্বল দিয়ে রেখেছ কেন?

ঃ আমি দেই নাই, আপা দিছেন।

চা-পর্ব সমাধা হল নিঃশব্দে । মার্টি প্রসঙ্গে কোন কথাই হল না । শারমিন বলল, বাবা, আমি যাই?

ঃ যাও মা, ঘুমাও। আর শোন, ঐ ছেলেটিকে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

ঃ দরকার নেই।

ঃ দরকার থাকবে না কেন?

ঃ যারটা সেই করুক। আমার এত মাথাব্যথা নেই।

এসব কি শারমিনের রাগের কথা? কেন সে রাগ করছে? কার উপর রাগ করছে?

শারমিন নিজেই তা বুঝতে পারছে না। সে কি অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে? সব মেয়েই কি এরকম বদলে যায়, না এটা শুধু তার বেলায় হচ্ছে? জানার কোন উপায় নেই, কাকে জিজ্ঞেস করবে?

শারমিনের কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা ঢাকায় আছেন তাঁদের সঙ্গেও কোন রকম যোগাযোগ নেই। কেউ কেউ ঈদের দিনে বেড়াতে আসেন। গেটের ভেতর ঢুকার পর থেকেই তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সেই স্বস্তি বাড়ি থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কমে না। এঁদের অনেককেই শারমিন চেনে না। রহমান সাহেব চেনেন কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখান না। মেয়েকেও কারো বাসায় বেড়াতে যাবার জন্যে বলেন না। যে কোন কারণেই হোক, মেয়েকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। তবু মাঝে মাঝে নিতান্ত অপরিচিত একজন কেউ আসে, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে, যেন দীর্ঘদিনের চেনা। এদের কথার ধরণ থেকেই বুঝা যায় সাহায্যপ্রার্থী।

একবার দুপুরবেলায় ঘোমটা-পরা একজন মহিলা এলেন। সঙ্গে চারটা আনারস,. দু'বোতল আচার। শারমিনকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ কাঁদলেন, আহ্ গো মা, কতদিন পরে দেখলাম। গায়ের রঙটা একটু ময়লা হয়ে গেছে। আগে সোনার পুতুলের মত ছিল। আমাকে চিনছ তুমি?

ঃ না।

ঃ আমি আটপাড়ার। তোমার আব্বার মামাতো বোন।

সেই মহিলা খুব আগ্রহ নিয়ে সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এবং ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। এবং এক সময় জানা গেল তিনি এসেছেন ছ'হাজার টাকার জন্যে। মেয়ের বিয়ে আটকে গেছে। জামাই একটা সাইকেল এবং একটা টু-বেন্ড রেডিও চায়। বিয়েব কথাবার্তা সব পাকা, এখন এই অল্প কিছু টাকার জন্যে বিয়ে আটকে আছে।

শারমিন লজ্জিত স্বরে বলল, আমার কাছে তো এত টাকা থাকে না। আপনি অপেক্ষা করুন, বাবা আসুন। তিনি বিকেলে আসেন।

ঃ তোমার কাছে কত টাকা আছে?

ঃ আমার কাছে খুব অল্পই আছে, এতে আপনাব কাজ হবে না। আপনি বিশ্রাম করুন, বাবা [illegible]।

ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করতে লাগলেন। শারমিন সাধ্যমত তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে চেষ্টা করল। ভাল ব্যবহারের চেষ্টা করাও মুশকিল। তারা দু'জন দুই জগতের মানুষ। এই দু'জগতের ভেতরে কোন বন্ধন নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই শারমিন বিরক্ত হয়ে পড়ল। ভদ্রমহিলা একটির পর একটি আব্দার করেই যাচ্ছেন, ওমা তোমার তো বাক্সভর্তি শাড়ি। দুই একটা আমাকে দিও গো মা। পুরানো চাদর আছে? খুব শীত পড়ে আটপাড়ায়। না গেলে বুঝবা না।

সন্ধ্যাবেলা রহমান সাহেব এলেন। টাকার কথা শুনে বললেন, তোমাকে তো মেয়ের বিয়ের জন্যে তিন মাস আগেই পাঁচ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। বক্কর সাহেব এসে নিয়ে গেছেন।

ঃ সেই বিয়াটা হয় নাই ভাইজান।

ঃ আকদ হওয়া বিয়ে ভেঙ্গে গেছে? বক্কর সাহেব তো বললেন, আকদ হয়ে গেছে। রোসমত আটকে আছে। তিনি তিন হাজার টাকা চেয়েছিলেন, আমি দিয়েছিলাম চার হাজার টাকা।

ভদ্রমহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। বিশ্রী অবস্থা। শারমিন সরে গেল সামনে থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনল বাবা বলছেন, আমার সঙ্গে চাল চালতে যাবে না। তোমাদের চাল বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।

সময় কাটানোই হয়েছে শারমিনের সবচে বড় সমস্যা। সময় পাহাড়ের মত বুকের উপর চেপে বসে থাকে। বই পড়া, গান শোনা এর কোনটাই এখন আর ভাল লাগে না। ছবিআঁকা শেখার কথা একবার মনে হয়েছিল, রং-তুলি কিনে কয়েকদিন খুব রঙ মাখামাখি করা হল, তাও মনে ধরল না।

প্রতিটি কাজ এত বিরক্তিকর।

কোন কোন দিন একা একা ঘুরতে ইচ্ছা করে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে খারাপ লাগে না। সবদিন তো আর তা করা যায় না। পুরানো বান্ধবীদের কারোর ঠিকানা নেই, নয়ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত। অদিতির ঠিকানা ছিল। তাকে পর পর দু'টি চিঠি দিয়েছে, জবাব পাওয়া যায়নি। হয়ত এই ঠিকানায় সে এখন থাকে না কিংবা থাকলেও তার জবাব দেবার ইচ্ছা নেই। শারমিন বন্ধুর জন্যে অতীতে কখনো হাত বাড়ায়নি, তার মূল্য দিতে হচ্ছে এখন, হাত বাড়িয়ে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শারমিন জেগে উঠল খুব ভোরে। চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল। আজকের দিনটি কেমন করে কাটানো যায়। ইউনিভার্সিটিতে গেলে কেমন হয়? পরিচিত কাউকে কি পাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটিতে? সম্ভাবনা খুব কম। এই পরিকল্পনাটা বাদ দিতে হল। রফিকদের বাসায় গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হলে কেমন হয়? শাহানা মেয়েটিকে ঐদিন চমৎকার লেগেছিল। ওর সঙ্গে গল্পগুজব করা যেত। কিন্তু সে নিশ্চয়ই কলেজে। কোন্ কলেজে পড়ে জিগ্যেস করা হয়নি। জানা থাকলে ঐ কলেজে হাজির হলে মন্দ হত না। শাহানাকে বের করে সিনেমা দেখা যেত কিংবা চাইনীজ রেস্টুরেন্টে বসে সময় কাটানো যেত।

কিংবা ঐ ম্যাজিসিয়ান আনিসকে একবার খবর দিয়ে এ বাড়িতে নিয়ে এলে হয়। ছোটখাটো একটা উৎসবের মত করা হবে। ম্যাজিসিয়ান আনিস ম্যাজিক দেখাবে। পরিচিত কিছু মানুষ থাকবে।

চায়ের টেবিলে শারমিন হাসিমুখে বলল, ম্যাজিক তোমার কেমন লাগে বাবা?

ঃ কি ম্যাজিক?

ঃ ট্রিকস। রুমাল ভ্যানিস হয়ে যাবে। শূন্য থেকে তৈরী হবে রক্ত-গোলাপ।

ঃ ভালই লাগে। হঠাৎ ম্যাজিক প্রসঙ্গ কেন?

ঃ আমি একজন ম্যাজিসিয়ানকে চিনি। তাঁকে আমি বাসায় শো করতে বলব।

ঃ বেশ তো, বলবে।

ঃ কবে করলে তোমার সুবিধা হয়?

ঃ যে কোনদিন করতে পার। রবিবারে করা যেতে পারে।

ঃ ঠিক আছে বাবা, রবিবার সন্ধ্যায়।

রহমান সাহেব মেয়ের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। ম্যাজিসিয়ান শ্রেণীর কাউকে তার মেয়ে চেনে এটা বিশ্বাস করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

ঃ বাবা, তাহলে ঐদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

ঃ হ্যাঁ, ব্যবস্থা কর।

ঃ ঐদিন সব রান্না আমি করব, কি বল?

ঃ ভেরি গুড আইডিয়া।

ঃ দেশী রান্না, না চাইনীজ? কোনটা চাও তুমি?

ঃ মিক্সড হলে কেমন হয়?

ঃ ভালই হয়।

শারমিনের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রহমান সাহেবের মনে হল মার্টির শোক শারমিনকে স্পর্শ করেনি। তার জীবনে কি এর চেয়েও কোন বড় শোক আছে?

শারমিন হাসি মুখে বলল, নাশতা খাওয়ার পর আজ সারাদিন আমি ঘুরব।

ঃ ভেরি গুড। কোথায় ঘুরবে?

ঃ ঠিক নেই কোন।

ঃ গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ তো?

ঃ হুঁ।

ঃ তুমি নিজে গাড়ি চালানোটা শিখে নাও না কেন?

ঃ আমার ইচ্ছে করে না।

প্রেসক্লাবের সামনে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। ছোটখাট একটা ভীড় সেখানে। শারমিন বলল, ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থামান।

ড্রাইভার গাড়ি থামাল।

ঃ ঐ কোণায় পার্ক করে রাখুন। তারপর রফিককে ডেকে নিয়ে আসুন। ঐ যে হলুদ পাঞ্জাবি দড়ির ব্যাগ কাঁধে।

রফিক হাসিমুখে এগিয়ে এল, আরে কি ব্যাপার?

ঃ তুমি এই ঠাণ্ডায় শুধু একটা পাঞ্জাবি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

ঃ ইয়েস ম্যাডাম। বেকারদের শীত লাগে না।

ঃ করছ কি এখানে? ভীড় কিসের?

ঃ চাকরির দাবিতে অনশন হচ্ছে। তাই দেখছিলাম। নিজেও ঢুকে পড়ব কিনা ভাবছি।

ঃ উঠে আস।

ঃ কোথায় যাচ্ছ?

ঃ ঠিক নেই।

রফিক উঠে এল। শারমিন বলল, তোমার ঝুলির ভেতর কি আছে?

ঃ কিছুই নেই। যাচ্ছি কোথায় আমরা?

ঃ কোথাও না। শুধু ঘুরব ঢাকা শহরে। তোমার কোন কাজ নেই তো?

ঃ না। দুপুরবেলা ভাবীর অফিসে যাবার একটা প্ল্যান ছিল, সেটা বাতিল করলাম।

ঃ বাতিল করবার দরকার কি? যাবে দুপুরে। আমি বাইরে অপেক্ষা করব। কিংবা আমিও যেতে পারি, তোমার ভাবী যদি রাগ না করেন।

ঃ রাগ করবে কেন? রাগ, হিংসা, দ্বেষ এইসব ভাবীর মধ্যে নেই। শী ইজ এন একসেপশনাল লেডি। তারপর তোমার কি খবর বল?

ঃ কোন্ খবর জানতে চাও?

ঃ ভদ্রলোক কবে আসছেন?

ঃ এপ্রিলে।

ঃ বিয়েটা হচ্ছে কবে?

ঃ মে মাসে।

ঃ মহানন্দে আছ?

ঃ হুঁ। তোমার কি হিংসা হচ্ছে নাকি?

ঃ একটু যে হচ্ছে না তা না। ভাল কথা, তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে?

ঃ কেন?

ঃ যদি থাকে তাহলে এক প্যাকেট দামী সিগারেট কিনে দাও। ফতুর হয়ে গেছি।

শারমিন হেসে বলল, ভিক্ষা?

ঃ হ্যাঁ, ভিক্ষা।

ঃ ভিক্ষাই যখন চাইছ তখন ছোট জিনিস চাইছ কেন? বড় কিছু চাও?

ঃ পাওয়া যাবে না এমন কিছু আমি চাই না।

দুপুরবেলা তারা দু'জন সত্যি সত্যি নীলুর অফিসে উপস্থিত হল। নীলু বেশ অবাক হল। যে মেয়েটির কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হচ্ছে সে একটি ছেলের সঙ্গে এমন সহজভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিভাবে?

ঃ ভাবী কেমন আছেন?

ঃ ভাল। তুমি কেমন আছ? তুমি বললাম, রাগ করনি তো?

ঃ হ্যাঁ, খুব রাগ করেছি।

শারমিন হেসে ফেলল। নীলুর মনে হল, এই মেয়েটি বড় ভাল। কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের সব সময় কাছের মানুষ মনে হয়। এই মেয়েটি সেই দলের।

শারমিন বলল, আসুন ভাবী, আজ দুপুরে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে খাব। নতুন একটা চাইনীজ রেস্টুরেন্ট হয়েছে, খুব ভাল খাবার।

ঃ আজ তো ভাই যেতে পারব না। আমাদের বোর্ড মিটিং আছে। সবাইকে থাকতে হবে। বৎসর শেষ হচ্ছে তো।

ঃ আজ তাহলে আপনি খুব ব্যস্ত?

ঃ হ্যাঁ। অন্য কোনদিন সবাই মিলে একসঙ্গে খাব।

ঃ তার মানে আপনি এখন আমাদের বিদায় হতে বলছেন?

নীলু হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ। আজ আমাদের খুব ঝামেলা।

ঃ কিন্তু আপনাকে এত খুশী খুশী লাগছে কেন?

ঃ আমার একটা সুখবর আছে।

রফিক অবাক হয়ে বলল, কি সুখবর, প্রমোশন হয়ে গেছে নাকি তোমার? চাকরি তো এক বছরও হয়নি?

নীলু কিছু না বলে অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। সে নিজেও তার সুখবর সম্পর্কে কিছু জানে না। সকালবেলা অফিসে আসতেই সালাম সাহেব বলেছেন, আপনার জন্যে সুখবর আছে। বোর্ড মিটিংয়ের পর জানতে পারবেন।

নীলু ভয়ে ভয়ে বলেছে, সুখবরটা কি?

ঃ জানবেন, জানবেন। এত ব্যস্ত কেন? দুঃসংবাদ তাড়াতাড়ি শোনা ভাল, কিন্তু সু-সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করাতেও আনন্দ।

কথাটা ঠিক, নীলুর আনন্দই লাগছে। কি হতে পারে খবরটা? প্রমোশন হবে না, সেটা সম্ভব না, চাকরি এক বছরও হয়নি। কিন্তু এছাড়া আর কি হতে পারে?

শারমিন বাসায় ফিরল সন্ধ্যাবেলা। সমস্তটা দিন বাইরে কেটেছে কিন্তু এতটুকুও ক্লান্তি লাগছে না। বরঞ্চ বেশ ঝরঝরে লাগছে।

রহমান সাহেব বাসায় ছিলেন। তিনি অনেকদিন পর শারমিনের উৎফুল্ল চোখ মুখ দেখলেন। তিনি বললেন, চল মা, বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাই।

ঃ এই শীতের মধ্যে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাবে কি?

ঃ খুব শীত না, চল যাই। চাদর-টাদর কিছু গায়ে দিয়ে নাও।

রহমান সাহেব গোলাপঝাড়ের দিকে এগুলেন। এই বাগানের পেছনে অনেক শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু বাগান প্রাণহীন। প্রচুর গোলাপ গাছ আছে, কিন্তু বেশীর ভাগ গাছই ফুল ফুটাতে পারে না। হয়ত মাটি ভাল না, কিংবা মালী ফুলগাছের কিছু জানে না। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে রহমান সাহেবের একটু মনখারাপ হল।

ঃ কি করলে আজ সারাদিন?

ঃ তেমন কিছু না। ঘুরলাম, কিছু কেনাকাটা করলাম।

ঃ কি কিনলে?

ঃ সুতীর শাড়ি কিনেছি দু'টি। ঘরে পরার, ফ্যান্সি কিছু না।

ঃ ফ্যান্সি কিছু কিনলেই পারতে।

ঃ কিনব এক সময়।

রহমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, তাড়াতাড়িই কেনা উচিত। উৎসবের দিন তো এগিয়ে আসছে।

শারমিন কিছু বলল না।

ঃ শুনেছি অনেকেই বিয়ের শাড়ি-টারি কোলকাতা থেকে কেনে. তুমি যেতে চাও কোলকাতায়?

ঃ না।

ঃ আমি আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি কোলকাতায়, ইচ্ছা করলে তুমি যেতে পার।

ঃ না, অত শখ নেই আমার।

ঃ এটা তো শখেরই বয়স, তোমার শখ নেই কেন?

ঃ ভেতরে চল বাবা, ঠাণ্ডা লাগছে।

রহমান সাহেব হালকা স্বরে বললেন, একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বল শারমিন, সাব্বিরকে বিয়ের ব্যাপারে তোমার মনে কি কোন দ্বিধা দেখা দিয়েছে?

ঃ না, শুধু শুধু দ্বিধা দেখা দেবে কেন?

ঃ আজ তার একটি চিঠি পেলাম। তোমার কাছে চিঠি লিখে লিখে নাকি জবাব পাচ্ছে না।

ঃ মাঝে মাঝে আমার চিঠি লিখতে ভাল লাগে না, আলসী লাগে।

ঃ আজ তাকে চিঠি লিখে দিও।

ঃ হ্যাঁ, দেব।

ঃ আর ঐ ম্যাজিসিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল?

ঃ না।

ঃ রোববারের প্রগ্রামটা ঠিক আছে?

ঃ না।

ঃ না কেন?

ঃ এখন আর ইচ্ছা করছে না।

রহমান সাহেব মেয়ের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। শারমিনকে তিনি বুঝতে পারছেন না। বাবারা হয়ত সব সময় তা পারে না, মা'রা পারে। শারমিনের মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই শারমিনকে বুঝতে পারত। রহমান সাহেব অনেকদিন পর নিজের স্ত্রীর কথা মনে করলেন।

সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল তবু নীলু জানতে পারল না, ভাল খবরটি কি? ম্যারাথন বোর্ড মিটিং হচ্ছে। চারটার পর তিনবার চা দেয়া হয়েছে ভেতরে। ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শেষবারের চা আনতে হল বাইরে থেকে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মিটিং চলবে রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত।

নীলু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বাসায় বলে আসা হয়নি, সবাই নিশ্চয়ই চিন্তা করবে। কিন্তু মিটিংয়ের মাঝখানে চলে যাওয়া যায় না। কেউই যায়নি। আজ বোনাস ঘোষণা হবার কথা। এ বছর কোম্পানী দু'কোটী টাকার কাছাকাছি লাভ করেছে। বড় রকমের বোনাস হবার কথা। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, চার মাসের বেসিক পে বোনাস হিসেবে দেয়া হবে। গুজবটা এসেছে খুব উঁচু লেভেল থেকে, সত্যি হলেও হতে পারে।

সত্যি হলেও অবশ্যি নীলুর কোন লাভ নেই। যাদের চাকরি এক বছরের কম তারা বোনাস পাবে না—নিয়ম নেই। নীলুর চাকরির এক বছর হতে এখনো তিন মাস বাকি।

সবাই বোনাস পাবে, নীলু পাবে না। ভাবতে একটু খারাপ লাগে। টাকাটা পেলে সে টিভি কিনে ফেলত। বাসার সবাইকে দারুণ একটা চমক দেয়া যেত।

রাত আটটায় নীলুর টেলিফোন এল। রফিক টেলিফোন করেছে।

ঃ হ্যালো ভাবী, ব্যাপার কি– এত দেরী?

ঃ বোর্ড মিটিং হচ্ছে।

ঃ বোর্ড মিটিং করবে ডিরেকটররা, তুমি চুনোপুঁটি– তুমি বসে আছ কেন?

ঃ আমি একা না। সবাই অপেক্ষা করছে।

ঃ এত রাতে বাসায় ফিরবে কিভাবে?

এটা নীলু ভাবেনি। বাসায় ফেরা একটা সমস্যা হবে। দশটা পর্যন্ত অবশ্যি বাস চলাচল করে। বাসে করে ফিরে যেতেও ঘণ্টাখানিক লাগবে।

ঃ হ্যালো ভাবী?

ঃ বল।

ঃ তুমি অপেক্ষা কর আমার জন্যে। আমি নিতে আসছি, এক্ষুণি রওনা দিচ্ছি।

ঃ ঠিক আছে। তোমার ভাই এসেছে?

ঃ হ্যাঁ, এসেছে। তুমি এখনো ফেরোনি শুনে ভাম হয়ে আছে। আজ মনে হয় গরম বক্তৃতা দেবে। ভাবী, আমি রাখলাম।

নীলু টেলিফোন নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল মিটিং শেষ হয়েছে। বড় সাহেব মঞ্জুর হোসেন ডেকেছেন সবাইকে।

মঞ্জুর হোসেন সাহেবের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। এই মুখ দেখে ভরসা হয় না কোন ভাল খবর আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি ভাল খবর ছিল। বড় সাহেব নীরস ভঙ্গিতে খবরগুলি দিলেন।

"কোম্পানী এ বছর খুব ভাল বিজনেস করেছে। কোম্পানীর পলিসি মত লাভের একটি ভাল অংশ কর্মচারীদের জন্যে ব্যয় করা হবে। সবাই এবার স্পেশাল বোনাস পাবে। সেটা হচ্ছে চার মাসের বেসিক পে। আমাদের এখানে দু'জন আছেন যাঁদের চাকরির মেয়াদ এক বছর হয়নি। আইন অনুযায়ী তাঁরা বোনাস পেতে পারেন না, তবে এ বছর তাঁদেরকে বোনাস দেবার সুপারিশ করা হযেছে।

কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এবং মেডিকেল এ্যালাউন্স বাড়ানোর সুপারিশও করা হয়েছে। মেডিক্যাল এ্যালাউন্সের ব্যাপারটি যাবে ফাইন্যান্স কমিটিতে।"

তুমুল হাততালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হল। মঞ্জুর সাহেব নীলুকে হাত-ইশারা করে ডাকলেন, আপনি একটু আমার কাছে আসুন। নিশ্চয়ই সুখবরটা বলা হবে। নীলুর বুক টিপ টিপ করতে লাগল।

ঃ বসুন।

নীলু বসল।

ঃ আপনার জন্যে একটা ভাল খবর আছে। কোম্পানী এ বছর আপনাকে সুইডেনে ট্রেনিংয়ের জন্যে সিলেক্ট করেছে। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের উপর ট্রেনিংটা হবে। কাল

সকালে আপনাকে কাগজপত্র দেব। ট্রেনিং পিরিয়াডে থাকা-খাওয়ার খরচ ছাড়াও প্রতি মাসে দু'শ পঞ্চাশ ইউ এস ডলার পাবেন হাতখরচ।

নীলু মৃদুস্বরে বলল—থ্যাংক ইউ স্যার।

ঃ থ্যাংকস দেবার কিছু নেই। সুযোগটা আপনি পেয়েছেন আপনার নিজের যোগ্যতায়। খুব অল্প সময়ে আপনি কাজের নেচার পিক আপ করেছেন এবং চমৎকার ভাবে করেছেন। এ্যানুয়েল রিপোর্টটাও আপনি ভাল তৈরী করেছেন।

আনন্দে নীলুর চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। নীলু নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল, ভদ্রলোকের সামনে কেঁদে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে।

ঃ রাত হয়ে গেছে তো, আপনি যাবেন কিভাবে?

ঃ আমাকে নিতে আসবে স্যার।

ঃ বাসা কোথায় আপনার?

ঃ কল্যাণপুর।

ঃ সে তো অনেক দূর। যাতায়াত করেন কিভাবে?

ঃ বাসে আসি স্যার।

ঃ কোম্পানী শিগগীরই একটা মাইক্রোবাস কিনবে। যাতায়াতের প্রবলেম তখন অনেকটা দূর হবে।

বড় সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ঃ আপনাকে কখন নিতে আসবে?

ঃ কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে স্যাব।

ঃ দরকার হলে আমি একটা লিফট দিতে পারি।

ঃ থ্যাংক ইউ স্যার। আমার দরকাব নেই।

রফিক এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। চোখ বড় বড় করে বলল, বাড়িতে পৌঁছামাত্র আজ একটা 'ফাইটিং চিত্র' হবে। ভাইয়া আগুন খেয়ে লাফাচ্ছে।

ঃ দেরী হয়েছে বলে?

ঃ হুঁ।

ঃ তার দেরী হয় না? সেও তো প্রায়ই রাত এগারোটার দিকে বাড়ি ফেরে।

ঃ পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে না? মহিলাদের বাড়ি ফিরতে হবে সূর্য ডোবার আগে।

ঃ কেন?

ঃ আমি জানি না কেন, এটাই নিয়ম। চল ভাবী, রওনা হওয়া যাক।

নীলু বলল, কিছু মিষ্টি কিনতে চাই রফিক। দেরী যখন হয়েই গেছে, আরেকটু হোক।

ঃ মিষ্টি কেন?

ঃ তোমার ভাইয়ার রাগ কমানোর জন্যে। বলতে বলতে নীলু হেসে ফেলল।

ঃ মাই গড, তোমার প্রমোশন হয়েছে নাকি, বিগ বস?

ঃ না, সেসব কিছু না। বলব তোমাকে, চল রিকশা নেই। নিউ মার্কেট পর্যন্ত রিকশায় যাব। নিউমার্কেট থেকে বেবী-টেক্সী নেব।

দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। হু-হু করে শীতের হাওয়া বইছে। সাড়ে আটটা বাজে কিন্তু রাস্তা-ঘাট জনশূন্য। রফিক বলল, এত বড় শহর ঢাকা, কিন্তু এখনো কেমন গ্রামের ছাপ দেখছ? আটটা না বাজতেই লোকজন বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলু কিছু বলল না, তার কেন জানি বড় ভাল লাগছে।

প্রেস ক্লাবের সামনে এসেই রফিক বলল, এক মিনিট ভাবী, একটু দেখে যাই।

ঃ কি দেখবে?

ঃ কয়েকটি ছেলে চাকরির জন্যে আমরণ অনশন শুরু করেছে, এদের একটু দেখে যাই। তুমিও আস, এক মিনিট লাগবে।

ছ'সাতজন ছিল দিনে, এখন দেখা গেল তিনজনকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। একজনের এর মধ্যে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। ঘন ঘন নাক ঝাড়ছে। আশেপাশে কোন লোকজন নেই। একটি নীল শাড়ি পরা অসম্ভব রোগা মেয়ে টুলের উপর বসে আছে শুকনো মুখে। অনশনকরীদের কারোর স্ত্রী হবে। এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে। রফিক বলল, কি ভাইসব, কেমন আছেন?

কেউ কোন জবাব দিল না।

ঃ আপনি তো দেখি একেবারে সর্দি লাগিয়ে বসে আছেন! দেখেন শেষে নিউমোনিয়া টিউমোনিয়া বাধিয়ে বসবেন!

রোগা মেয়েটি বিড় বিড় করে কি যেন বলল। সে তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি। নীলুর অস্বস্তি লাগছে। রফিক বলল, আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন? সিগারেটে অনশন ভঙ্গ হয় না। খাবেন কেউ? আমার কাছে ভাল সিগারেট আছে।

তিনজনের মধ্যে শুধুমাত্র সর্দিতে কাতর লোকটিই হাত বাড়াল।

তারা বাসায় পৌঁছল রাত ন'টা কুড়িতে। নীলু যেমন ভেবেছিল তেমন কিছুই হল না। সফিক বসার ঘরে বসে পত্রিকা পড়ছিল। চোখ তুলে একবার তাকাল, তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল পত্রিকা নিয়ে।

মনোয়ারা কোন কথাই বললেন না। হোসেন সাহেব শুধু বললেন, এ রকম দেরী হলে আগে থেকে বলে যেও মা। যা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ঢাকা দুষ্ট লোকে ভরে গেছে, রাজধানীগুলোতে যা হয়। সমস্ত দেশ থেকে আজেবাজে লোকেরা ভীড় করে রাজধানীতে।

টুনী ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় ঘুমিয়েছে। শাহানা মশারি খাটাচ্ছে। নীলু নিচু হয়ে টুনীর গালে চুমু খেল। ঘুমের ঘোরেই টুনী হাত দিয়ে ধাক্কা দিল মা'কে। দেরীতে ফিরে আসা মা'কে সে যেন গ্রহণ কবতে পারছে না। শাহানা বলল, টুনী আজ খুব বিরক্ত করেছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ। বিকেল থেকেই খুব কান্নাকাটি শুরু করেছে, মা'ব কাছে যাব-- মা'র কাছে যাব। তারপর ভাইয়া এল। তুমি তখনো ফেরনি দেখে সেও রেগে গেল।

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। শাহানা বল, ভাইয়া বিকেলে চা-টা কিছুই খায়নি। তখন থেকে পত্রিকা নিয়ে বসার ঘরে বসে আছে। আমাকে শুধু শুধু একটা ধমক দিল।

ঃ কেন?

ঃ গ্লাসে পানি ঢালতে গিয়ে পানি ফেলে দিয়েছিলাম।

নীলু বেশ অবাক হল। সফিক কখনো ছোটখাট কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্য কোন কারণে কি তার মেজাজ খারাপ হয়েছে? অফিসে কোন ঝামেলা হয়েছে নাকি?

শাহানা বলল, তোমাকে ভাইয়া কিছু বলেছে?

ঃ না।

ঃ নির্ঘাৎ বলত। কবির মামা এসেছেন তো, তাই নিজেকে চেক করেছে।

ঃ কবির মামা এসেছেন নাকি?

ঃ হুঁ। আটটায় সময় এসেছেন। শুয়ে আছেন, শরীর ভাল না।

ঃ এবারও কি হেঁটে এসেছেন?

ঃ না, হেঁটে আসেননি। রিকশা করেই এসেছেন। তবে কাহিল। কবির মামা বেশীদিন আর বাঁচবে না।

নীলু কাপড় বদলে কবির মামার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি বাতি নিভিয়ে শুয়ে ছিলেন। নীলুকে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।

ঃ কেমন আছেন মামা?

ঃ ভালই আছি রে বেটি। থাক থাক, সালাম লাগবে না। শরীরটা ভাল তো মা?

ঃ জ্বি ভাল। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

ঃ হ্যাঁ পেয়েছি। চিঠিতে তুমি মা দু'টা সাধারণ বানান ভুল করেছ। এটা ঠিক না। বিশদ বানান লিখেছ 'ষ' দিয়ে। তারপর মুহূর্ত বানানও ভুল।

নীলু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

ঃ চিঠিপত্র লেখার সময় হাতের কাছে ডিকশনারী রাখবে। ডিকশনারী আছে না ঘরে?

ঃ আছে মামা।

ঃ গুড। কোনটা আছে— আধুনিক সংসদ অভিধান?

নীলু না জেনেই মাথা নাড়ল। কবির মামা বললেন, রাতে শোবার সময় ডিকশনারীতে বানান দু'টা দেখে নিও মা।

ঃ জ্বি আচ্ছা, দেখব। আপনি খাওয়া-দাওয়া করেছেন?

ঃ না, রাতে আর কিছু খাব না। শরীবটা আগের মত নাই, পরিশ্রম করতে পারি না।

ঃ না খেলে তো শরীর আরো খারাপ করবে।

ঃ এটা ঠিক না। মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করলে শরীরের বিশ্রাম হয়। সবাই তো বিশ্রাম চায়।

নীলু ঘুমুতে গেল অনেক রাতে। সফিক তখনো জেগে। নীলুর জন্যেই অপেক্ষা করছে বোধহয়। শোবার ঘরের প্রাইভেসীতে কিছু কড়া কড়া কথা শুনাবে। নীলু একটা পিরিচে দু'টি সন্দেশ এবং এক গ্লাস পানি নিয়ে ঘরে ঢুকল। মৃদুস্বরে বলল, মিষ্টি খাও।

ঃ না।

ঃ খাও না। একটা অন্ততঃ খাও।

সফিক একটি মিষ্টির খানিকটা ভেঙ্গে মুখে দিল। নীলুকে অবাক করে দিয়ে সহজ স্বরে বলল, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়। রাত হয়েছে।

নীলু বাতি নিভিয়ে দিল। সফিককে কি আজ রাতেই তার সুইডেনের ব্যাপারটা বলা উচিত? দু'জন শুয়ে আছে পাশাপাশি। হাত বাড়ালেই একে অন্যকে ছুঁতে পারে! তবু দু'জন কি দু'প্রান্তেই না বাস করে! নীলু মৃদুস্বরে ডাকল, এ্যাই, ঘুমাচ্ছ?

ঃ না।

ঃ আজ আমাদের বোর্ড মিটিং হল, আমাদের সবাইকে চারটা বোনাস দিয়েছে।

ঃ ভালই তো।

নীলুর মন খারাপ হয়ে গেল। বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই সফিকের গলায়। ভদ্র তো করেও অন্তত দু'একটা কথা বলতে পারত। নীলু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আমার আর একটা ভাল খবর আছে।

ঃ কি?

ঃ আমাকে ওরা ট্রেনিং-এ সুইডেনে পাঠাচ্ছে। ছ'মাসের ট্রেনিং।

ঃ কবে সেটা?

ঃ মার্চে কিংবা এপ্রিলে—আমি ঠিক জানি না।

সফিক আর কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। একজন সুখী মানুষের নিশ্চিন্ত ঘুম। ঘুমের মধ্যেই সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্ন দেখবে সে।

আজ রাতে নীলুরও স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করছে। কোন এক দূর দেশের স্বপ্ন--যে দেশে দুঃখ নেই, অভাব নেই, ক্ষুধা নেই। যেখানে চাকরির জন্যে কেউ আমরণ অনশন করে না। স্ত্রীরা বাড়ি ফিরতে দেরী করলেই স্বামীদের মুখ অন্ধকার হয় না।

সেই দেশের আকাশ এদেশের আকাশের চেয়েও অনেক বেশী নীল। গাছপালা অনেক বেশী সবুজ।

কবির মামা রফিককে নিয়ে বের হয়েছেন।

তাঁর হাতে প্রকাণ্ড জাবদা খাতা। ছাত্রদের নাম ঠিকানা সেখানে লেখা। প্রথমে যাবেন নীলক্ষেতে—ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার। মুকসেদ আলি থাকেন সেখানে। বোটানীর এসোসিয়েট প্রফেসর। রফিকের সঙ্গে যাবার কোন ইচ্ছা ছিল না। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোলার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া কেউ দেবেও না কিছু। নিজেদেরই চলে না, চাঁদা দেবে কি?

কিন্তু তবু সঙ্গে যেতে হল। কবির মামা নিউমার্কেটের বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। রফিক গম্ভীর গলায় বলল, চাঁদা তোলার ব্যাপারটা কি মামা হেঁটে হেঁটে করা হবে?

ঃ হ্যাঁ, আপত্তি আছে?

ঃ আছে।

ঃ তোর জন্যে মোটরগাড়ি লাগবে?

ঃ পেলে ভাল হত, আপাতত একটা রিকশা হলেই চলবে।

ঃ টাকা যেটা উঠবে সেটা তো রিক্সা ভাড়াতেই চলে যাবে।

ঃ রিক্সা ভাড়া আমি দেব।

ঃ তুই দিবি কোত্থেকে? তুই তো এখনো সিন্দাবাদের ভূতের মত ভাইয়ের ঘাড়ে বসে আছিস?

ঃ সেটা নিয়ে এখন কোন আর্গুমেন্টে যেতে চাই না। শুধু এইটুকু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, হাঁটাহাঁটি সম্ভব না।

ঃ যা তুই চলে যা। আমি একাই পারব।

রফিক গেল না। মুখ আমশি করে আসতে লাগল পাশাপাশি। মুকসেদ আলি সাহেবকে বাসায় পাওয়া গেল। ভদ্রলোক স্যারকে দেখে যে পরিমাণে উৎসাহিত হলেন, স্যারের নীলগঞ্জ প্রজেক্টের কথা শুনে ঠিক সে পরিমাণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন।

ঃ আপনি একা কতটুকু করবেন স্যার?

ঃ একা কোথায়? তোমরা সবাই আছ আমার সঙ্গে, আছ না? তাছাড়া পৃথিবীর অনেক বড় বড় কাজ একাই করা হয়েছে।

ঃ বহু টাকা-পয়সার ব্যাপার স্যার।

ঃ টাকা-পয়সার ব্যাপার তো আছেই। তুমি কত দিবে বল? কবির মামা খাতা খুলে ফেললেন। তোমাকে দিয়েই শুরু।

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, মাসের প্রথমদিক ছাড়া তো স্যার আমার পক্ষে সম্ভব না। ইউনিভার্সিটির মাষ্টারদের মাসের প্রথমদিকে কিছু টাকা-পয়সা থাকে, তারপর নুন নাই পান্তাও নাই অবস্থা।

ঃ মাসের প্রথমদিকে আসব?

ঃ আপনার আসার স্যার দরকার নেই। ঠিকানা রেখে যান, আমি কিছু পাঠিয়ে দেব।

ঃ তোমার কথাবার্তা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে না তুমি পাঠাবে। মনে হচ্ছে তুমি চেষ্টা করছ আমাক বিদায় করতে।

মকসুদ আলি সাহেবের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। রফিক দারুণ অস্বস্তিবোধ করল। কবির মামার কথাবার্তার কোন মাত্রা নেই। যা মনে আসছে বলে ফেলছেন। এই যুগে মনের কথা সব সময় বলা যায় না, চেপে রাখতে হয়।

ঃ মকসুদ, আমি উঠলাম। মাসের প্রথমদিকে আবার আসব। আমি হচ্ছি কচ্ছপ, যেটা কামড়ে ধরি, সেটা ছাড়ি না। ইউনিভার্সিটির মাষ্টারদের মধ্যে আমার আর কোন ছাত্র আছে?

ঃ ঠিক বলতে পারলাম না।

ঃ একটু খোঁজ করবে। আর শোন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমার প্রজেকটের কথা বলবে। সবাই তো আর তোমার মত না, কেউ কেউ উৎসাহিত হবে।

ঃ আমি বলব।

নীলক্ষেত থেকে কবির মামা গেলেন মতিঝিল। তিন-চারজন ছাত্রের নাম ঠিকানা আছে, তাদের মধ্যে একজনকে শুধু পাওয়া গেল। সেই ছাত্র স্যারকে দেখে ভূত দেখার

মত চমকে উঠল। স্যারের কথাবার্তা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, এত বড় কাজ কি স্যার প্রাইভেট সেকটরে হয়? সরকারী সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব না।

ঃ প্রথমেই যদি তুমি ধরে নাও সম্ভব না, তাহলে আর সম্ভব হবে কিভাবে?

ঃ আবেগতাড়িত হয়ে স্যার অনেকে অনেক প্রগ্রাম নেয়। সোনার বাংলা করতে চায়। তা কি আর হয়?

ঃ হবে না কেন?

ছাত্রটি মৃদুস্বরে বলল, চা খান স্যার। আপনি রেগে যাচ্ছেন।

ঃ তুমি বেকুবের মত কথা বলবে, আমি রাগতেও পারব না?

ঃ আমি স্যার প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমগুলির দিকে আপনার দৃষ্টি ফেরাতে চাচ্ছি।

ঃ কাজে নামার আগেই তুমি প্রবলেমের কথা ভাবতে শুরু করেছ? আমার ছাত্র থাকা-কালীন তো তুমি এতটা বোকা ছিলে না? সেই সময় তো তোমার কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল!

রফিক কবির মামার কথাবার্তায় স্তম্ভিত। বলে কি এই লোক? ছাত্রটি অবশ্যি মোটামুটি ভদ্র ব্যবহারই করল। চা-কেকটেক আনিযে খাওয়াল এবং ফিরে আসার সময় পাঁচশ' টাকার দু'টি চকচকে নোট দিল। এটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। রফিক ধরেই নিয়েছিল, এই লোকের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। মুখ শুকনো করে বলবে, পরে একদিন আসুন, দেখি কিছু করা যায় কিনা।

সেসব না বলে বলল, সামনের মাসে আসেন একবার, দেখি আর কিছু করা যায় কিনা।

ঃ করা যায় কিনা বললে তো হবে না। করতেই হবে।

রাস্তায় নেমেই রফিক বলল, চল মামা, বাড়ি যাওয়া যাক। একদিনে তো রোজগার ভালই হল।

কবির মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, এখনই বাড়ি যাবি কি?

ঃ আরো ঘুরবে?

ঃ ঘুরব না মানে? কাজটা সহজ ভাবছিস তুই?

ঃ আগামীকাল থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করলে কেমন হয়?

ঃ ঘুরব না মানে? কাজটা সহজ ভবছিস তুই?

ঃ আগামীকাল থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করলে কেমন হয়?

ঃ তোর কাজ থাকলে তুই চলে যা।

ঃ দুপুর হয়ে গেছে, খাওয়াদাওয়া করবে না? তাছাড়া এখন লাঞ্চ টাইম, কাউকে পাবে না। তারচে চল খানাপিনা করা যাক।

ঃ কোথায় খাবি?

ঃ সস্তার একটা হোটেল আছে সেগুনবাগানে, সেখানে যেতে পারি। কিংবা তুমি চাইলে ভাবীর অফিসে গিয়েও খেতে পারি। ভাল ক্যান্টিন আছে।

ঃ চল যাই সেখানে।

ঃ তবে মামা সেখানে না যাওয়াই ভাল।

ঃ কেন?

ঃ আমি তো বলতে গেলে রোজ দুপুরে খাচ্ছি। সেখানে এখন তোমাকে নিয়ে গেলে অফিসের লোকজন ভাববে পুরা ফ্যামিলি এনে পার করে দিচ্ছে!

ঃ চল তাহলে সেগুনবাগানের দিকেই যাই।

ঃ একটা রিক্সা নেয়া যাক, কি বল?

ঃ নে একটা।

সেক্রেটারিয়েটের কাছে এসে রিকশা থেকে নেমে যেতে হল। মিছিল বের হয়েছে একটা। আকাশ ফাটানো গর্জন উঠছে— 'গণতন্ত্র চাই'! কবির মামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের জন্যে মিছিল বের করতে হচ্ছে, এরচে লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে?

রফিক কিছু বলল না। কবির মামা বললেন—মিছিলটা কাদের?

রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, মানুষদের মিছিল, আবার কাদের? তুমি কি মামা মিছিলে ভিড়ে যাবে নাকি? খাবে না?

ঃ হুঁ, খাব।

ঃ তাহলে দাঁড়াও, মিছিল চলে যাক।

ঃ চল খানিকটা যাই। প্রেসক্লাবের সামনে বেরিয়ে পড়লেই হবে।

রফিকের বিরক্তির সীমা রইল না। সে ইচ্ছা করেই পিছিয়ে পড়ল। সিগাবেট খাওয়া দরকার। দীর্ঘ সময় বিনা সিগারেটে চলেছে। বুক ব্যথা করছে এখন। মিছিল আগাচ্ছে খুব শ্লথ গতিতে। লক্ষণ ভাল নয়। নিরীহ ধরণের এইসব মিছিল মাঝে মাঝে ভয়াবহ চবিত্র নেয়। এটিও হয়ত নেবে। রফিক সিগারেটে টান দিয়ে স্লোগানে গলা মিশাল, "বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। বাঁচার মত বাঁচতে চাই।"

কবির মামা ক্লান্ত মুখে প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অনশন করা ছেলে তিনটি এখনো আছে। নীল শাড়ি পরা মেয়েটিও আছে। আশেপাশে আর কেউ নেই। যেন এই ব্যাপারটিতে কারো কোন উৎসাহ নেই।

রফিক কাছে আসতেই কবির মামা বললেন, দেশের কি অবস্থা দেখেছিস? চাকরির দাবিতে অনশন করতে হচ্ছে, কি সর্বনাশের কথা!

রফিক কিছু বলল না।

কবির মামা বললেন, রাথরুমে যাওয়া দরকার।

ঃ বাথরুম কোথায় পাবে এখানে? বসে যাও বাস্তার পাশে।

ঃ কি যে কথাবার্তা তোর!

ঃ তাহলে যাও প্রেসক্লাবে, গিয়ে বল, আমি নীলগঞ্জের প্রভাতী পত্রিকার সম্পাদক। আমাকে একটু পেচ্ছাব করার সুযোগ দিন।

কবির মামা বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন প্রেসক্লাবের দিকে। রফিক গেল নীল শাড়ি পরা মেয়েটির কাছে।

ঃ অনশনের আজ কতদিন?

ঃ ছয়দিন।

ঃ বলেন কি?

বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষ তিনজন চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। মেয়েটি বলল, আপনি কি কাগজের লোক?

ঃ না, আমিও একজন বেকার। শুনেন ভাই, আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন? ভাল সিগারেট আছে আমার কাছে, খেতে পারেন।

মেয়েটি বলল, আপনি বেকার, ভাল সিগারেট পেলেন কোথায়?

ঃ আমার ভাবী প্রেজেন্ট করেছে। আপনি কে?

ঃ আমার নাম রীতা।

ঃ এদের মধ্যে আপনার কেউ আছে?

ঃ আমার ছোট ভাই আছে।

ঃ কোনজন?

মেয়েটি আঙুল দিয়ে দেখাল। এই লোকটিই বোধহয় কাল বাতে সিগারেট নিয়েছিলেন। রফিক বলল, কি নাম ভাই আপনার?

ঃ ফরহাদ।

ঃ কষ্ট হচ্ছে খুব?

লোকটি জবাব দিল না।

ঃ সিগারেট নিবেন?

ঃ না।

কবির মামা আসতে দেরী করছেন। তাঁর বড় বাথরুমে পেয়েছে কিনা কে জানে। রফিক আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীল শাড়ি পরা রোগা মেয়েটি কি কিছু খেয়েছে? রফিক মনে মনে ভাবল মেয়েটিকে যদি বলা হয়, আসুন, আপনি আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খান, তাহলে সে কি আসবে? মনে হয় না; মেয়েদের আত্মাসম্মান খুব বেশী।

সফিক অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। নীলু এসে বলল, এখানে তোমার একটা সই লাগবে।

ঃ কিসের সই?

ঃ আমার পাসপোর্টের দরখাস্তের ফরম। স্ত্রীর দরখাস্তে স্বামীর সিগনেচার লাগে কিন্তু স্বামীর দরখাস্তে স্ত্রীর কোন সিগনেচার লাগে না—অদ্ভুত নিয়ম-কানুন!

সফিক গম্ভীর স্বরে বলল, তোমার সুইডেনের ব্যাপার?

ঃ হ্যাঁ। আমাদের অফিসের একজন কলিগ দশদিনের মধ্যে পাসপোর্ট আনিয়ে দিবে।

ঃ খুব কাজের লোক মনে হয়?

ঃ খুবই কাজের। আমাকে একটা টিভি কিনে দিয়েছেন এক হাজার টাকা কম দামে।

বলেই নীলু জিবে কামড় দিল। টিভির কথাটা এখন সে বলতে চায়নি, এটা ছিল সবার জন্যে একটা সারপ্রাইজ। আজ সন্ধ্যায় ইসমাইল সাহেবের টিভি নিয়ে আসার কথা।

সফিক বলল, টিভি কিনছ নাকি?

ঃ হুঁ।

ঃ কই আগে তো কিছু বলনি!

ঃ তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।

ঃ ঘরে আসবে কবে?

ঃ আজই আসবে। সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসার কথা।

নীলু উজ্জ্বল চোখে হাসল। মনোয়ারা বাইরে থেকে ডাকলেন, শুনে যাও তো বৌমা!

কয়েকদিন ধরেই তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে আছেন। কথাবার্তা বলছেন না। কিন্তু আজ যে কোন কারণেই হোক মেজাজ ভাল।

ঃ কি ব্যাপার মা?

ঃ আজ অফিসে না গেলে হয় না?

ঃ কেন মা?

ঃ আছে একটা ব্যাপার।

মনোয়ারা মুখ টিপে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন। নীলু কিছু বুঝতে পারল না।

ঃ কি মা, না গেলে চলে?

ঃ হ্যাঁ, চলবে না কেন? বীণাদের বাসা থেকে টেলিফোন করে দেব। ব্যাপারটা কি?

ঃ শাহানাকে দেখতে আসবে।

ঃ দেখতে আসবে মানে?

ঃ সাড়ে তিনটার সময় আসবে, ছেলের এক চাচী আর ছেলের মা।

নীলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার শাশুড়ী বিয়ের আলাপ-আলোচনা অনেকদিন থেকেই করছেন। এটাকে সে কখনই গুরুত্ব দেয়নি। মায়েরা মেয়ে একটু বড় হলেই বিয়ে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে। এটাও সে রকমই ভেবেছিল। এখন মনে হচ্ছে, সে রকম নয়। নীলু বলল, কই মা, আমি তো কিছু জানি না!

ঃ জানার মত কিছু হলে তবেই না জানবে। তোমার খিলগাঁয়ের মামাশ্বশুর সম্বন্ধ আনলেন। ওঁরা একজন অল্পবয়েসী মেয়ে চান। তবে সুন্দর চায়, আর কিছু না।

ঃ এখন বিয়ে দিলে তো পড়াশোনা হবে না।

ঃ বিয়ে না দিয়েই যেন কত পড়াশোনা হচ্ছে। কোনমতে ম্যাট্রিক হয়েছে, আই এ পাশ হবে না। তুমি যাও তো, শাহানাকে বলে আস আজ কলেজে যেতে হবে না।

ঃ ছেলে কি করে?

ঃ ছেলে রাজপুত্রের মত। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা রিটায়ার্ড ডিসট্রিক্ট জজ। বিরাট বড়লোক। ছেলের ছবি আছে আমার কাছে, দেখবে?

নীলু মন থেকে কোন আগ্রহ দেখাতে পারছিল না, কিন্তু আগ্রহ না দেখালে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। নীলু দেখতে গেল। ছবি দেখে স্বীকার করতেই হল, ছেলেটি অত্যন্ত সুপুরুষ। যাদের দেখলেই মনে হয়, আহ্, না জানি কোন্ মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ে হবে!

মনোয়ারা বললেন, ছবি কেমন দেখলে মা?

ঃ ভাল।

ঃ শুধু ভাল?

ঃ ছেলে তো খুবই সুন্দর, করে কি?

মনোয়ারা গাল ভর্তি করে হাসলেন। নীলু আবার বলল—ছেলে কি করে?

ঃ তোমার ধারণা ছেলে যখন এত সুন্দর, তখন নিশ্চয় মাকাল ফল। আমারও সে রকম ধারণা ছিল। ছেলে কিন্তু খুব ভাল। ওকালতি করছে, খুব ভাল প্র্যাকটিস।

ঃ বয়স তো তাহলে অনেক বেশী।

ঃ না, বয়স বেশী না। এ বছরই বারে জয়েন করেছে। তুমি যাও তো বৌমা, শাহানাকে কলেজে যেতে নিষেধ কর। ওকে কিছু বলবে না, জানতে পারলে কান্নাকাটি চেঁচামেচি শুরু করবে।

শাহানা কলেজে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। নীলুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুমি আজ অফিসে যাওনি ভাবী?

ঃ না।

ঃ কেন?

ঃ ভাল লাগছে না।

ঃ তাহলে আমিও আজ কলেজে যাব না।

ঃ ঠিক আছে না গেলে।

ঃ মা বকাবকি করবে।

ঃ তা হয়ত করবেন।

ঃ করলে করুক। আমি কলেজে যাব না আজ। তুমি মাকে একটু বলে আস, আমার মাথা ধরেছে কিংবা কিছু একটা হয়েছে।

শাহানা হৃষ্টচিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কলেজে যেতে হচ্ছে না এতে সে দারুণ খুশী। তার ধারণা ছিল মা কিছু বলবেন কিন্তু তিনি কিছু বলছেন না। এ রকম সৌভাগ্য তার খুব বেশী হয় না। সে টুনীকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে বেড়াতে গেল।

আনিসের ঘরের দরজা খোলা। শাহানা উঁকি দিল।

ঃ কি করছেন আনিস ভাই?

ঃ তেমন কিছু না। এসো ভেতরে।

শাহানা ভেতরে ঢুকল না। আনিস হাসি-মুখে বলল, নতুন একটা চাইনীজ ট্রিক শিখেছি, দেখবে?

ঃ না।

শাহানা দরজার সামনে থেকে সরে এল। আনিস বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

ঃ এই যে শাহানা, তাকাও এদিকে! কি আছে হাতে? আহ্, চুপ করে আছ কেন, বল?

ঃ কিছু নেই।

ঃ গুড। এই দেখ হাত বন্ধ করলাম।

আনিস মুঠি খুলল। চমৎকার একটি গোলাপ তার হাতে। শাহানা রাগী গলায় বলল, আবার আপনি আমাদের টবের গোলাপ ছিঁড়েছেন?

ঃ গোলাপ ছিঁড়েছি কি না ছিঁড়েছি সেটা পরে, আগে বল ম্যাজিকটা কেমন?

ঃ এই ম্যাজিকটা শেখার পর আপনি আমাদের টবের সবগুলি গোলাপ নষ্ট করেছেন। এটা ছিঁড়েছেন আজ সকালে। কেমন মানুষ আপনি বলেন তো?

ঃ আচ্ছা যাও, আর ছিঁড়ব না– কথা দিচ্ছি।

ঃ গোলাপ কি আর আছে যে ছিঁড়বেন? সবই তো শেষ করে ফেলেছেন। আপনার একটু মায়াও লাগে না, না?

আনিস লজ্জা পেয়ে গেল। গোলাপ গাছগুলি শাহানার খুব প্রিয়। সব তুলে ফেলা ঠিক হয়নি। শাহানার যা রাগ, পড়তে সময় লাগবে। আনিস মৃদুস্বরে বলল, গোলাপটা নাও শাহানা।

ঃ আমার দরকার নেই।

টুনী হাত বাড়াল। শাহানা তাকে একটা ধমক দিল। কড়া গলায় বলল, এদিকে আয়, নিতে হবে না। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনোয়ারা ডাকছেন শাহানাকে। শাহানা আষাঢ়ের আকাশের মত মুখ করে নিচে নেমে গেল।

আনিস গোলাপ নিয়ে প্র্যাকটিস চালাল খানিকক্ষণ। ফুলটা প্রকাণ্ড। একে ঠিকমত 'পাম' করা মুশকিল। কিন্তু প্র্যাকটিসের একটা মূল্য আছে, হাত অভ্যস্ত হয়ে আসছে। এখন সে অনায়াসে ফুলটি লুকিয়ে রাখতে পারে। গোলাপ তৈরীর ম্যাজিকে সে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হতে চায়। যেখানেই সে হাত দেবে সেখানেই তৈরী হবে একটি রক্ত-গোলাপ।

দশটার মত বাজে। আনিসের তেমন কিছু করার নেই। শরাফ আলির কাছে গেলে কেমন হয়? ফুলের এই ম্যাজিকটা শরাফ আলির কাছ থেকে শেখা। তাকে অবশ্যি কখনোই পাওয়া যায় না। তাকে ধরার একমাত্র কৌশল হচ্ছে বার বার যাওয়া। কিন্তু শরাফ আলি যে জায়গায় থাকে সেখানে বার বার যাওয়া সম্ভব নয়। এবং যাওয়া ঠিকও নয়।

প্রথমবার গিয়েছিল বদরুলের সঙ্গে। নওয়াবপুর রোডের এক গলিতে বদরুল ঢুকে পড়ল। নর্দমার পাশ দিয়ে যাবার রাস্তা। পচা গন্ধে গা গুলাতে শুরু করল। গলির ভেতর তস্য গলি। নবাবী আমলের বাড়িঘর সেদিকে। যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ার কথা কিন্তু ভেঙ্গে পড়ছে না। অধিকাংশ বাড়িরই জানালা নেই। মোটা চট ঝুলছে। দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার-অন্ধকার ভাব।

আনিস ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কোথায় নিয়ে এলেন বদরুল ভাই?

ঃ আসল জায়গা।

ঃ আসল জায়গা মানে?

ঃ সন্ধ্যা না হলে বুঝবে না। ঢাকা শহরের এটা খুব একটা খান্দানী অঞ্চল। তারা একটি দোতলা জরাজীর্ণ লালইটের দালানের সামনে দাঁড়াল। বদরুল গলা উঁচিয়ে ডাকতে লাগল, শরাফ আলি ভাই আছেন, শরাফ আলি ভাই? কেউ কোন সাড়া দিল না। বদরুল নিচু গলায় বলল, পামিংয়ের আসল লোক। ওস্তাদ আদমী। তবে শালা মারাত্মক খচ্চর।

বহু ডাকাডাকির পর নীল লুঙ্গী পরা বুড়োমত একজন লোক বেরিয়ে এল। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তাকাচ্ছে চোখ লাল করে। বদরুল দাঁত বের করে বলল, শরাফ ভাই, ভাল আছেন।

ঃ হুঁ।

ঃ ঘুমাচ্ছিলেন নাকি?

ঃ হুঁ।

ঃ আনিসকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে। বলেছিলাম তো তার কথা আপনাকে। খুব বড়ঘরের ছেলে। আপনার কাছ থেকে দু'একটা কৌশল শিখতে চায়। সাধ্যমত টাকা পয়সা খরচ করবে। কয়েকটা পামিং যদি ....

ঃ আরেকদিন আসেন।

ঃ আপনাকে তো শরাফ ভাই পাওয়া যায় না। আসছি যখন একটু বসি, আলাপ-পরিচয় হোক।

ঃ আরেকদিন আসেন, শইল ভাল না।

শরাফ আলি দ্বিতীয় কোন কথার সুযোগ না গিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বদরুল আরো খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করল কিন্তু লাভ হল না। শরাফ আলির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়।

ফিরবার পথে বদরুল বলল, এই লোক অনেক কিছু জানে। ম্যাজিক শিখতে হলে এর সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। জায়গাটা খারাপ, তোমাকে ঘন ঘন এখানে আনা ঠিক না, তবে গরজটা যখন তোমার।......

ঃ লোকটা কেমন?

ঃ শরাফ মিয়ার কথা বলছ? এই শ্রেণীর লোক যতটা ভাল হতে পারে ততটাই। বেশীও না, কমও না।

শরাফ মিয়াকে আনিসের মনে ধরল। অসাধারণ পামিং জানে লোকটা। চোখের পলকে সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেলল। হাত উল্টেপাল্টে দেখাল, হাতে সিগারেটের প্যাকেট নেই। কিন্তু হাতেই আছে, দর্শকের চোখে পড়ছে না। অপূর্ব কৌশল। আনিসের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার পক্ষে কি শেখা সম্ভব?

শরাফ মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, সম্ভব না।

ঃ কেন, সম্ভব না কেন?

ঃ এসব ভদ্রলোকের কাজ না— ছোটলোকের কাজ। ভদ্রলোকের হাতের তালু ইচ্ছামত নরম হয় না।

ঃ চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ঃ হুঁ, তা পারেন।

প্রথমদিনেই গোলাপ লুকিয়ে রাখার কৌশল শিখিয়ে দিল। ভারী গলায় বলল, ফুলের বোঁটাটা ধরতে হয় আঙুলের ফাঁকে। ফুলটা একবার থাকবে হাতের তালুর দিকে, একবার থাকবে পিঠের দিকে। এইটা করতে হয় চোখের পাতি ফেলতে যত সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে।

ঃ কতদিন লাগবে শিখতে?

ঃ তিন-চাইর বছর। এর বেশীও লাগতে পারে।

ঃ বলেন কি?

ঃ ম্যাজিক ভদ্রলোকের কাজ না, ছোটলোকের কাজ।

আনিস অবশ্যি চার মাসের মাথাতেই ব্যাপারটা মোটামুটি ধরে ফেলল। শরাফ মিয়া নির্লিপ্ত স্বরে বলল, আপনার হইব। কিন্তু কি করবেন এইসব শিইখ্যা? লাভ কি?

: কোন লাভ নেই?

: কোন লাভ নাই। এক সময় রাজা-বাদশারা ছিল, এরা এইসব জিনিসের কদর করত। এখন রাজাও নাই, বাদশাও নাই— সব ফকির। ফকিরের দেশে ম্যাজিক চলে না।

এই গলির ভেতর ঢুকতে আনিসের সব সময় একটু গা ছমছম করে। সব সময় মনে হয় সবাই বোধহয় বিশেষ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। একবার ঢুকে পড়লে এই অস্বস্তিটা কেটে যায়, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অস্বস্তি লাগে। অনেকদিন ধরে সে আসা-যাওয়া করছে এদিকে তবু অস্বস্তির ভাবটা কাটছে না।

পানের দোকানের বেঁটে বুড়োটি আনিসকে দেখে পরিচিত ভঙ্গিতে হাসল, ভাল আছেন ভাইসাব?

: ভাল।

: শরাফ ভাইয়ের কাছে যান?

: হুঁ।

: আচ্ছা যান। নিশ্চিন্তে যান। কেউ আপনেরে কিছু কইব না। বলা আছে সবেরে।

শরাফ মিয়াকে পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর রেশমা জানালা খুলে বলল, বাসায় নাই।

: কখন আসবেন?

: জানি না।

মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দিল। আনিস দাঁড়িয়ে রইল। শরাফ মিয়া অনেক সময় ঘরে থেকেও বলে দেয় বাসায় নাই। ঘণ্টাখানিক বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করলে এক সময় নিজেই বের হয়ে আসে। চক্ষুলজ্জায় পড়েই আসে সম্ভবত।

আনিস সিগারেট ধরাল।

জানালা খুলল আবার। রেশমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, একবার তো কইলাম নাই! বাড়িতে যান, কেন খালি ঝামেলা করেন?

আর দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হয় না। আনিস হাঁটতে শুরু করলো। রেশমা খুব সম্ভব শরাফ মিয়ার মেয়ে। অবশ্যি এই অঞ্চলে সম্পর্কের ব্যাপারটা খুব জোরালো নয়, মেয়ে নাও হতে পারে। রেশমার চেহারার সাথে কোথায় যেন শাহানার ছাপ আছে। তবে শাহানার মুখ গোল, এই মেয়েটির মুখ লম্বাটে। আনিস লক্ষ্য করেছে এই মেয়েটি তাকে সহ্যই করতে পারে না। কিংবা কে জানে এ অঞ্চলের কোন মেয়েই হয়ত পুরুষ সহ্য করতে পারে না। সহ্য করতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

পানের দোকানের সামনে আসতেই বুড়ো লোকটি বলল, শরাফ ভাইরে পাইছেন?

: না। বাসায় নাই।

: বাসাতেই আছে। আবার যান।

আবার যেতে ইচ্ছে করছে না। আর গেলেও কোন লাভ হবে না। রেশমা বিরক্ত স্বরে চেঁচাবে, বাসাতে নাই।

শীতের দিনের রোদে এক ধরণের তীক্ষ্নতা আছে। দুপুরের দিকে এই রোদ গায়ে সুঁচের মত বিঁধতে থাকে। আনিসের রোদে হাঁটতে ইচ্ছা করছিল না। রিক্সা নিয়ে গুলিস্তান চলে যেতে ইচ্ছা করছে। সেখান থেকে কল্যাণপুরের বাস ধরা যাবে। কিন্তু পকেটের অবস্থা ভাল না। এই অবস্থায় বিলাসিতা প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাছাড়া হেঁটে যাবার জন্য একটা মজা আছে। হঠাৎ দু'একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসিয়ানের সাক্ষাত পাওয়া যায়, যেমন একদিন কুদ্দুসকে পাওয়া গেল।

কুদ্দুস পুরানো ঢাকা অঞ্চলে খুঁজলি বিখাউজ এবং কান পাকার অষুধ বিক্রি করে। সবক'টি অষুধ স্বপ্নে পাওয়া এবং অসুধগুলি দেয়া হয় বিনামূল্যে। কারণ যিনি এই অষুধ স্বপ্নে পেয়েছেন তিনি বিক্রি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তবে নামমাত্র হাদিয়া নেয়া হয়, ওষুধ তৈরীর খরচ জোগাড় করার জন্যেই। অন্য কোন কারণে নয়। কুদ্দুস ওষুধ বিক্রির আগে লোক জড় করবার জন্যে ম্যাজিক দেখায়। অসাধারণ সে সব ম্যাজিক। প্রথম শ্রেণীর 'পামিংয়ে'র কৌশল। একটি লোককে চারদিক থেকে সবাই ঘিরে আছে এবং সে এর মধ্যেই একের পর এক দেখিয়ে যাচ্ছে—দড়ি কাটার খেলা, পিংপংয়ের খেলা, চমৎকার সব তাসের খেলা। একটি খেলা তো বার বার দেখার মত। কুদ্দুস একটি হরতনের বিবি নেয় হাতের মুঠোয়, কুদ্দুসের সহকারী ন'বছরের ফজল ঘন ঘন ডুগডুগী বাজায়। কুদ্দুস তার ভাঙ্গা গলায় বলে, দেখেন ভাই দেখেন, বিবি সাবরে দেখেন। রাজার ছিল চাইর বিবি। এই বিবির কদর নাই। খাওন পায় না। মনে দুঃখু। দিন যায় আর বিবি দুবলা পাতলা হয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হরতনের বিবির তাসটা ছোট হতে শুরু করে। ফজল ডুগডুগি বাজায় প্রচণ্ড শব্দে। তাস ছোট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যায়। অপূর্ব একটি খেলা কত সহজেই না দেখাচ্ছে লোকটি!

আনিস অনেকদিন ধরেই খুঁজছে কুদ্দুসকে। আগে তাকে প্রায়ই পুরানো ঢাকায় দেখা যেত, এখন দেখা যাচ্ছে না। জায়গা বদল করেছে বোধহয়। এই শ্রেণীর লোকরা যাযাবর শ্রেণীর হয়। এক জায়গায় থাকতে পারে না বেশীদিন।

আনিস নিজেও কি একদিন তাদের মত হবে? রাস্তার পাশে তাকে ঘিরে থাকবে লোকজন, ছোট্ট একটি অপুষ্ট শিশু চোখে পিঁচুটি নিয়ে প্রাণপণে ডুগডুগি বাজাবে এবং সে দেখাবে তার বিখ্যাত গোলাপ তৈরীর খেলা। খেলা শেষ হবার পর বিক্রি করবে—কালিগঞ্জের বিখ্যাত দাঁতের মাজন। যা নিয়মিত ব্যবহার করলে মুখে দুর্গন্ধ, মাড়ি ফোলা, দাঁতের পোকা কিছুই থাকবে না। আসেন ভাইসব, ব্যবহার করে দেখেন—কালিগঞ্জের বিখ্যাত দন্ত-বান্ধব নিম টুথ পাউডার।

মনোয়ারা দুপুরের পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। নীলু মনে মনে বেশ বিরক্ত হল। শাহানাকে বিয়ে দিতে কোন রকম সমস্যা হবার কথা নয়, তার মত রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ভাল ভাল সম্বন্ধ আসবে। কিন্তু মনোয়ারা এমন করছেন যেন মেয়ে গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। আজ সাড়ে তিনটায় সেই কাঁটা সরানোর প্রথম ধাপটি শুরু হবে।

ঃ বৌমা, শাহানাকে দেখলাম কামিজ পরে ঘুরঘুর করছে। ওকে একটা শাড়ি পরতে বল।

ঃ শাড়ি পরার দরকার কি মা? ওবা তো আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে আসছে না?

মনোয়ারা রেগে গেলেন—যা করতে বলছি কর। ওকে ভাল দেখে একটা শাড়ি পরাও, চুলে তেল দিয়ে চুল বেঁধে দাও।

ঃ এসব করতে গেলেই শাহানা সন্দেহ করবে।

ঃ সন্দেহ করলে করবে।

ঃ তারপর ধরুন মা, কোন কারণে ওদের পছন্দ হল না তখন তো শাহানা খুব শক পাবে।

মনোয়ারা বিরক্ত স্বরে বললেন, চাকরি নেবার পর থেকে তুমি বৌমা বড় বেশী কথা বলছ। তুমি গিয়ে ওকে শাড়ি পরতে বল। তুমি না বললে আমি বলব।

নীলু শাহানার খোঁজে গেল। শাহানা নিজের ঘরে গল্পের বই নিয়ে বসেছে এবং ঘন ঘন চোখ মুছছে। ভাবীকে দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

ঃ টুনী কোথায় শাহানা ?

ঃ বাবার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। কত বললাম আমার সঙ্গে এসে ঘুমাতে, তা ঘুমাবে না।

ঃ তুমি একটু উঠ তো শাহানা। আমার সঙ্গে যাবে এক জায়গায়।

ঃ কোথায় ?

ঃ ছবি তুলব।

ঃ তোমার সেই পাসপোর্টটির ছবি?

ঃ না, পাসপোর্টের ছবি তোলা হয়েছে। তুমি আর আমি দুজনে মিলে তুলব। কালার ছবি।

কেন ?

ঃ স্মৃতি রাখবার জন্যে। দু'দিন পর বিয়ে হয়ে কোথায় কোথায় চলে যাবে!

ঃ সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।

ঃ উঠ শাহানা। ভাল দেখে একটা শাড়ি পর।

ঃ জামদানীটা পরব?

ঃ না, জামদানী ফুলে থাকবে। সিল্কের শাড়ীটা পর।

শাহানা খুশী মনে উঠে এল। শাড়ি পরল। চুল বাঁধল। সবুজ রঙের ছোট্ট একটা টিপ পড়ল কপালে। আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

ঃ ভাবী, চোখে কাজল দেব?

ঃ কাজলের তোমার দরকার নেই।

ঃ কেমন লাগছে আমাকে ?

ঃ তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সেরা রূপসীদের একজন। কোন ছেলে তোমাকে একবার দেখলে সারারাত বিছানায় ছটফট করবে।

ঃ তুমি ভাবী খুব অসভ্যের মত কথা বল। ভাল লাগে না।

সাজগোজ সারতে সারতেই মেহমানরা এসে পড়লেন। দুজন বয়স্কা মহিলা। তাঁরা থাকলেন খুব অল্প সময়। চা-টা কিছুই খেলেন না। কথা-বার্তাও কিছু বললেন না। কালোমত মহিলাটি নীলুকে বললেন, তোমাকে মা আমি আগে দেখেছি, গুলশান মার্কেটে বিছানার চাদর কিনছিলে।

কথাটা ঠিক না। নীলু কখনও গুলশান মার্কেটে যায়নি। কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করল না। শাহানার সঙ্গে তাঁদের তেমন কোন কথাবার্তা হল না। ফর্সা এবং অসম্ভব ধরণের মোটা মহিলাটি বললেন, খুব সাজগোজ করেছ দেখি!

ঃ আমরা ছবি তুলতে যাচ্ছি।

ঃ কোন স্টুডিওতে যাচ্ছ? অ্যালিফেন্ট রোডের দিকে গেলে চল আমি নামিয়ে দেব।

ঃ জ্বি না। আমরা এই কাছেই যাব, হেঁটে যাওয়া যায়।

ভদ্রমহিলার আচার-আচরণ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। সাড়ে চারটায় তাঁদের এক জায়গায় দাওয়াত আছে, তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন। মনোয়ারার মন খারাপ হয়ে গেল। মেয়ে ওদের পছন্দ হয়নি। পছন্দ হলে চলে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠত না। চা দেয়া হয়েছিল কিন্তু কাপে চুমুক পর্যন্ত দিল না। ভদ্রতা করে হলেও কাপে একটা চুমুক দেবার দরকার ছিল। কালো মহিলাটি সারাক্ষণই নাক উঁচু করে ছিল। কপাল কুঁচকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিল।

নীলু শাহানাকে নিয়ে ছবি তুলতে গেল সন্ধ্যার আগে আগে। দু'টি ছবি তোলা হল। একটিতে নীলু এবং শাহানা। অন্যটিতে শুধু শাহানা। অনেকগুলি টাকা খরচ হল শুধু শুধু। ছবি ভাল আসবে কিনা কে জানে। স্টুডিওর মালিক একজন বুড়ো লোক, সে চোখেই দেখে না– ছবি তুলবে কি!

ফিরবার পথে শাহানা বলল, চল ভাবী, ফুচকা খাই। এখানে একটা ফুচকার গাড়ি আছে।

ঃ কোথায় ?

ঃ আরেকটু সামনে যেতে হবে, চল যাই। ফুচকা খাবার পর আমরা একটু হাঁটব, কি বল?

ঃ সন্ধ্যাবেলা শুধু শুধু হাঁটব কেন? আর এখানে হাঁটার জায়গা কোথায়?

ঃ তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে ভাবী। হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলব।

ঃ এখনই বল।

শাহানা শান্ত স্বরে বলল, তুমি ভাবী খুব কায়দা করে শাড়ি পরিয়েছ, সাজগোজ করিয়েছ। ঐ মহিলা দু'টি আমাকে দেখতে এসেছিলেন– ঠিক কিনা বল।

ঃ ঠিক।

ঃ আমি তো ভাবী তোমার মত বুদ্ধিমান নই, সহজে কিছু বুঝতে পারি না। ওরা যে আমাকে দেখতে এসেছিলেন সেটা বুঝলাম এই অল্প কিছুক্ষণ আগে।

নীলু হাসল, কিছু বলল না। শাহানা বলল, তোমরা আমাকে বিয়ে দেবার যত চেষ্টাই কর কোন লাভ হবে না।

ঃ তুমি বিয়ে করবে না ?

ঃ যদি করি, করব আমার পছন্দমত ছেলেকে।

ঃ এমন কেউ কি পছন্দের আছে?

শাহানা জবাব দিল না। তার ফর্সা গাল লাল হয়ে উঠছে। শেষ সূর্যের আভায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। নীলু বলল, ছেলেটা কে শাহানা?

শাহানা মাথা নীচু করে বলল, আমি যাকে বিয়ে করব সে খুবই সাধারণ একজন মানুষ। তোমরা কেউ তাকে পছন্দ করবে না।

ঃ আমরা পছন্দ করব না এমন কাউকে তুমি কেন বিয়ে করবে?

ঃ কারণ আমি তাকে পছন্দ করি।

ঃ ছেলেটি কে—আনিস?

শাহানা জবাব দিল না। তার ভাসা ভাসা ঘন কালো চোখে জল চিক চিক করতে লাগল। নীলু হালকা গলায় বলল, নিয়ে চল তোমার ফুচকার গাড়িতে। বেশী দূর নাকি?

পরবর্তী এক সপ্তাহে খুব দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটল।

সোমবার

বাসায় টিভি এল। বার ইঞ্চি চমৎকার একটা টিভি। হোসেন সাহেব শিশুদের মত হৈ-চৈ শুরু করলেন। সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত টিভির সামনে থেকে নড়লেন না। মনোয়ারা কয়েকবার বললেন, এরকম করছ যেন টিভি কোনদিন চোখে দেখ নাই!

প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল টিভি আনার ব্যাপারটা মনোয়ারা ঠিক পছন্দ করছেন না। কিন্তু ফিরোজা বেগমের গানের সময় তিনিও খুব আগ্রহ করে সামনে বসলেন। শুধু সফিক এল না। হোসেন সাহেব রাত দশটার খবরের সময় উঁচু গলায় ডাকলেন, আস সবাই, খবর হচ্ছে— খবর। যেন খবরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এটা শুনতেই হবে। সফিক তখনই শুধু বসল খানিকক্ষণ। হোসেন সাহেব সারাক্ষণই বলতে লাগলেন, এত সুন্দর রিসেপশন আমি কোন টিভিতে দেখি নাই। আর কি সুন্দর সাউণ্ড!

মঙ্গলবার

মনোয়ারাকে অবাক করে দিয়ে ফর্সা ও মোটা মহিলাটি বুড়ো এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সকালবেলা উপস্থিত হলেন। তাঁরা দীর্ঘ সময় কথা বললেন হোসেন সাহেবের সঙ্গে। সফিকের অফিসে যাওয়া হল না। তাঁদের কথাবার্তায় নীলুর ডাক পড়ল না। মনোয়ারা শুধু অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে গেলেন, ওঁদের শাহানাকে পছন্দ হয়েছে। সেদিনই বিকেলে একটি বিশেষ সময়ে নীলুকে যেতে হল নিউমার্কেটে। নীলুর সঙ্গে শাহানা। নীলুর ভান করতে হল যে সে বই কিনছে। শাহানা সারাক্ষণই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রইল এবং এক সময় বলল, যার আমাকে দেখার কথা সে কি দেখেছে?

নীলু অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, দেখাদেখির কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই। বই কিনতে এসেছি, বই কিনে চলে যাব।

ঃ কেন আমাকে মিথ্যা কথা বলছ ভাবী ? কালো স্যুট পরা লোকটি এসেছিল আমাকে দেখতে।

ঃ খুব সুন্দর না ছেলেটা ?

শাহানা জবাব দিল না। নীলু বলল, এমন চমৎকার ছেলের কথা শুধু গল্প-উপন্যাসেই পড়া যায়।

শাহানা গম্ভীর হয়ে রইল। সে রাতে ভাত খেল না। তার নাকি মাথা ধরেছে।

নীলুর মনে হল, বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোনো ঠিক না। কিন্তু ঘটনাগুলি ঘটছে খুব দ্রুত। এক সময় আর ফেলা যাবে না। রাতের বেলা সে সফিককে বলল, শাহানার এই বিয়েতে মত নেই।

সফিক বিরক্ত হয়ে বলল, ওর মতামতটা চাচ্ছে কে ?

ঃ যে বিয়ে করবে তার কোন মতামত থাকবে না?

ঃ শাহানার মতামত দেয়ার বয়স হয়নি।

ঃ ধর যদি অন্য কোন ছেলের প্রতি তার কোন দুর্বলতা থাকে, তখন?

ঃ কি যে বাজে কথা বল।

ঃ ও যে রকম মেয়ে, কোন একটা কাণ্ডটাণ্ড করে বসতে পারে।

ঃ কিছুই করবে না। আমি কথা বলব ওর সাথে।

ঃ কখন ?

ঃ এখনই ডাক। কথা বলছি।

ঃ থাক, আজ না বললেও হবে।

ঃ আজ অসুবিধাটা কি?

ঃ মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে।

ঃ তুমি বল, আমি ডাকছি।

ঃ প্লীজ, আজ না। যা বলার অন্য একদিন বলো।

বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যাবেলা ফর্সা মোটা মহিলাটি অনেককে নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে প্রচুর মিষ্টি। তারা শাহানার হাতে হীরে বসানো একটি আংটি পরিয়ে দিলেন। মনোয়ারা বললেন, মা, ইনাকে সালাম কর।

শাহানা বাধ্য মেয়ের মত সালাম করল।

সেই রাতেই সফিক শাহানার সঙ্গে অনেক সময় ধরে কথা বলল, নীলু সেই আলোচনায় থাকল না। কিন্তু লক্ষ্য করল, শাহানার মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অন্ধকার ভাবটা আর নেই।

সহজভাবে টিভির সামনে এসে বসল। গানের ভুবন অনুষ্ঠানটি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখল। সেখানে একজন শিল্পীকে একটি মাছি বড় বিরক্ত করছে, বার বার মাছিটি গিয়ে বসছে তার নাকে। শিল্পী নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। দৃশ্যটি দেখে শাহানা অন্য সবার মতই হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ল। নীলুর মনে হল, শাহানাকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। এই বিয়েতে সে সুখীই হবে।

অনেক রাতে শাহানা নীলুকে বলল, ভাবী, আঙটিটা কি পরে থাকব, না খুলে বাক্সে তুলে রাখব?

ঃ বাক্সে তুলে রাখার দরকার কি?

ঃ এত দামী আঙটি হাত থেকে খুলে পড়ে যায় যদি?

ঃ না, পড়বে না। আঙটিটা তোমার পছন্দ হয়েছে শাহানা?

শাহানা কিছু বলল না। নীলু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যাক, তোমার কল্যাণে হীরা দেখা হল। আমি হীরা আগে দেখিনি।

সফিক অফিসে এসে শুনল, বড় সাহেব সকাল আটটায এসেছেন, কয়েকবার সফিকের খোঁজ করেছেন। তাঁর মেজাজ অবশ্যি ভাল, অন্যদিনেব মত চেঁচামেচি করছেন না। সফিক ঘড়ি দেখল, দশটা চল্লিশ। আজ তাব অফিসে আসতে দেরি হল, এটা সে কখনো করে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যেদিন সে দেবী কবে আসে, বেছে বেছে স্যুরেনসেন ঠিক সেদিনগুলিতেই আসে।

ঃ স্যার, মে আই কাম ইন?

ঃ কাম ইন। কেমন আছ সফিক?

ঃ ভাল।

ঃ আজকের ওয়েদার কেমন চমৎকার লক্ষ্য করেছ? ব্রাইট সানশাইন। কুল ব্রীজ।

সফিক ব্যাপার কিছু বুঝতে পারল না। বাতাসে কোন মিষ্টি গন্ধ নেই, কাজেই বড় সাহেব প্রকৃতিস্থই আছেন। সকালবেলার চমৎকার ওযেদার নিয়ে তাঁর কাব্যভাবের কোন কারণ নেই। আজকের সকাল অন্যদিনের সকালের মতই, আলাদা কিছু নয়।

ঃ সফিক !

ঃ বলুন স্যার।

ঃ তুমি কি আমার প্রসঙ্গে কোন গুজব শুনেছ? আমাকে নিয়ে দুটি গুজব প্রচলিত। একটি হচ্ছে, তোমাদেব অফিসের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলছি। আমি এই গুজবটিব কথা বলছি না, আমি বলছি অন্য গুজবটির কথা।

ঃ না স্যার, আমি কিছু শুনিনি।

ঃ ঠিকই শুনেছ, এখন প্রিটেণ্ড করছ। তাতে অবশ্যি কিছুই যায় আসে না।

সফিক চুপ করে হইল। বড় সাহেবের কথাবার্তা হেঁয়ালিব মত লাগছে।

ঃ আমার হেড অফিস জানিয়েছে যে, তারা মনে করছে আমি এখানকার কাজকর্ম ঠিকমত চালাতে পারছি না। কাজেই তারা আমার একজন রিপ্লেসমেন্ট পাঠাচ্ছে।

ঃ কবে ?

ঃ এই সপ্তাহেই। তোমার জন্যে যে সুপারিশ আমি করেছিলাম সেটিও বাতিল হয়েছে। কাজেই তুমি ফিরে যাবে তোমার আগের জায়গায়।

সফিক সিগারেট ধরাল। স্যারেনসেন শান্ত স্বরে বলল, আমার ব্যাপারে ওদের ডিসিশন ঠিকই আছে। আমি মোটামুটি একটি অপদার্থ। কিন্তু তোমার ব্যাপারে ওরা ভুল করল। আমি খুবই দুঃখিত। ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমি চার্জ হ্যাণ্ডওভার করব, তার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করতে সাহায্য কর।

সফিক দীর্ঘ সময় তার ঘরে চুপচাপ বসে রইল। স্যারেনসেনের বদলে অন্য কেউ এলে ভাল হবারই কথা। এখানকার এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অত্যন্ত দুর্বল। প্রায় এগারোটার মত বাজে, এখনো অফিসের সব কর্মচারী এসে উপস্থিত হয়নি। কর্মচারীদের আনা-নেয়ার জন্যে কোন গাড়ি নেই, অথচ গাড়ীর স্যাংশন হয়ে আছে দু'বছর আগে। অত্যন্ত জরুরী ছাপ মারা ফাইলগুলিই সে ফেলে রাখবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ--তার মুড আসছে না কিংবা মাথা ধরেছে, কিংবা এই ব্যাপারটি নিয়ে সে আরো চিন্তা-ভাবনা করতে চায়।

কিন্তু তবুও স্যারেনসেন একজন ভাল মানুষ। জগতের বেশির ভাগ অপটু মানুষরা সাধারণতঃ ভাল মানুষ হয়ে থাকে। এর কারণ কি? নিজের অক্ষমতাকে ভালমানুষী দিয়ে আড়াল করে রাখার চেষ্টা কি?

সিদ্দিক সাহেব এসে ঢুকলেন। হাসি হাসি মুখ। যেন এইমাত্র মজার কিছু ঘটে গেছে।

ঃ কি সফিক সাহেব, সকালবেলাতেই মুখ এমন গম্ভীর কেন? বড় সাহেবের খবরে আপসেট নাকি ?

ঃ কিছুটা তো আপসেট বটেই।

ঃ যাকে নিয়ে আপসেট, সে কিন্তু সুখেই আছে। সকালে এসে গুন গুন করে গান গাইছে। আসলে বাংলাদেশ থেকে বেরুতে পেরে ব্যাটা খুশী।

ঃ তাই কি ?

ঃ তাই। নয়ত এতটা ফুর্তি হবার কথা না। বেল টিপুন, চা দিতে বলুন। আপনি কি অফিসিয়াল অর্ডার পড়ে দেখেছেন?

ঃ না।

ঃ আছে আমার সঙ্গে। চা খাবার পর পড়ে দেখবেন।

সফিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। অফিস অর্ডার সিদ্দিক সাহেবের কাছে যাবে কেন?

ঃ বুঝলেন সফিক সাহেব, এবার আমরা অফিস এ্যাডমিনিসট্রেশন টাইট করব। আপনার ফুল কো-অপারেশন দরকার। আমাদের নিজেদের সারভাইভেলের জন্যেই এটা দরকার। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এতে কোম্পানী বিজনেস গুটিয়ে ফেলবে। বিদেশী কোম্পানীগুলি এদেশে আসে কাঁচা পয়সা নিতে, ভ্যাকেশন কাটাতে তো আসে না। এদের পয়সা তৈরির সুযোগ করে দিতে না পারলে তো আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, কি বলেন?

সফিকের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। হেড অফিস সিদ্দিক সাহেবকে প্রমোশন দিয়েছে। অফিস অর্ডার তাঁর কাছে যাবার রহস্য হচ্ছে এই।

ঃ সফিক সাহেব।

ঃ বলেন।

ঃ বড় সাহেবকে একটা জমকাল ফেয়ারওয়েল দেবার ব্যবস্থা করা যাক। এই দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। ছোটখাট একটা ফাংশান, তারপর ডিনার। ফাংশানে সবাই এ্যাটেণ্ড করবে, ডিনার শুধুমাত্র অফিসারদের জন্যে। এবং সবার তরফ থেকে তাঁকে আমরা একটা গিফটও দিতে চাই। কি দিলে ভাল হয়, সেটা নিয়েও একটু চিন্তা করবেন। বাংলাদেশের ল্যাণ্ডস্কেপের উপর একটা ওয়েল-পেইন্টিং পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। আপনার চেনা-জানা কেউ আছে আর্টিস্ট?

ঃ না।

ঃ আমি অবশ্যি দু'একজনকে চিনি। দেখব কি করা যায়।

সিদ্দিক সাহেব প্রায় এক ঘণ্টার মত বসলেন। তিনি সম্ভবত এই হঠাৎ আসা প্রমোশনের খবরে সফিকের কাছে লজ্জিত বোধ করছিলেন, লজ্জা ঢাকার জন্যেই বসা।

শাহানাদের কলেজ আজ দুপুরবেলা ছুটি হয়ে গেল। ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ে কুমিল্লা যাচ্ছিল বাবা-মা'র সঙ্গে, এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মারা গেছে তিনদিন আগে খবর পাওয়া গেছে আজ। সেজন্যেই ছুটি এবং শোকসভা।

শোকসভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হল। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বক্তৃতা দিলেন। যার ভাবার্থ হচ্ছে সংসার অনিত্য, জন্মিলে মরিতে হবে। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের লম্বা বক্তৃতা দেয়ার বদঅভ্যাস আছে। সুযোগ পেয়ে তিনি প্রায় পঞ্চাশ মিনিট কথা বললেন। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

শাহানার সবচে প্রিয় বান্ধবী মিলি, ফিস ফিস করে বলল, আগে ছুটি হয়ে লাভটা কি হল? সেই তো সাড়ে বারটা বাজিয়ে ফেলেছে।

শাহানা বলল, এখন দেখবি লীনা আপা বক্তৃতা দিবে।

ঃ সর্বনাশ হবে তাহলে, লীনা আপা ঝাড়া দু'ঘন্টা বলবে।

ওদের আজ নিউমার্কেটে যাবার কথা। লীনা আপা ডায়াসে গেলে সেটা সম্ভব হবে না।

শাহানা অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সম্ভবত আজ আপা কিছু বলবে না, ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। তাঁরো নিশ্চয়ই কোথাও যাবার কথা। হলভর্তি ছাত্রী মুখ শুকনো করে বসে আছে। শোকসভা না হয়ে অন্য কিছু হলে এতক্ষণে স্যাণ্ডেল ঘষাঘষি শুরু হত। আজ তা করা যাচ্ছে না– দুঃখী দুঃখী মুখ করে সবাই বসে আছে।

শাহানার মন খারাপ করিয়ে লীনা আপা বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতার নাম.....

শাহানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সূচনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা লম্বা ব্যাপার হবে। অথচ যে মেয়েটি মারা গেছে তাকে এই আপা হয়ত চেনেনও না। কিন্তু কত ভাল ভাল কথা বলা হবে। এমনভাবে সবাই বলবে যেন ঐ মেয়েটির মত ভাল মেয়ে পৃথিবীতে জন্মায়নি এবং তার মৃত্যুতে সবার একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। কোন মানে হয়? শাহানার ঐ মেয়েটির উপর রাগ লাগতে লাগল। কি দরকার ছিল তার কুমিল্লা যাবার?

শাহানা সময় কাটানোর জন্যে অন্যকিছু ভাবতে চেষ্টা করল। এই কাজটা সে খুব ভাল পারে। ক্লাসে কোন লেকচার যখন তার পছন্দ হয় না, তখন স্যারের দিকে তাকিয়ে থেকে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। বেশ লাগে তার। শাহানা ভাবতে লাগল বাসায় ফিরে গিয়ে কি করবে? করার কিছুই নেই, এমন নিরানন্দ জীবন। কিছুক্ষণ পড়াশোনা, টিভি দেখা, রাতের পর ঘুমানো, ব্যাস। দিনের পর দিন একই রুটিন। এতটুকুও ভাল লাগে না। প্রায়ই ইচ্ছা করে কোথাও পালিয়ে যেতে। ছেলে হয়ে জন্মালে সে নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত। মেয়ে হয়ে পালিয়ে যাওয়াও সম্ভব না। পত্রিকা খুললেই মেয়েদের নিয়ে এমন সব আজেবাজে খবর ছাপা হয়। এসব খবর শাহানার পড়তে ভাল লাগে না, কিন্তু মা আবার বেছে বেছে সেই খবরগুলিই ভাবীকে পড়ে শুনাবেন।

ঃ বৌমা, শুনে যাও—কি লিখেছে। মানুষ আর মানুষ নাই, জানোয়ার হয়ে গেছে। 'ফরিদপুরের নবগ্রামে তিনজন যুবক কর্তৃক এগারো বৎসব বয়েসী কুলসুমকে....'

এসব খবর কি জোরে জোরে পড়ে শুনানোর জিনিস? কিন্তু মাকে বলবে কে? যতই দিন যাচ্ছে, মা ততই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কি বাজে স্বভাব যে তাঁর হচ্ছে। অবশ্যি এখন তার সঙ্গে মা খুব ভাল ব্যবহার করছে। যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, তার সঙ্গে হয়ত খারাপ ব্যবহার করার নিয়ম নেই। আগে টুনীকে নিয়ে ছাদে গেলে একশবার জবাবদিহি করতে হত।

ঃ ছাদে গিয়েছিলি কেন?

ঃ দিনের মধ্যে দশবার ছাদে যাওয়া লাগে কেন ?

ঃ খবরদার আর যেন না দেখি। এতবড় মেয়ে ছাদে ঘুর ঘুর করবে কেন? ছাদ কি হাওয়া খাবার জায়গা?

এখন মা কিছুই বলে না। কয়েকদিন আগে কলেজ থেকে ফেরবার সময় গলির মাথায় আনিস ভাইয়ের সঙ্গে দেখা, দুজনে কথা বলতে বলতে আসছে, মা ব্যাপারটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল—এই নিয়ে কিছুই বলল না। অন্য সময় হলে এক লক্ষ প্রশ্ন করত।

ঃ কি কথা হল আনিসের সাথে? হাত নেড়ে নেড়ে এমন কি কথা?

ঃ তোকে কতবার বলব, আগ বাড়িয়ে আলাপ জমাতে যাবি না।

ঃ হাসতে হাসতে দেখি ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছিলি! রাস্তার মধ্যে কেন এমন হাসাহাসি? ভদ্রলোকের মেয়ে না তুই?

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার কিছু ভাল দিকও আছে। স্বাধীনতা আসে। কতদিন থাকবে এই স্বাধীনতা কে জানে? বিয়ের পর কি হবে এসব নিয়ে শাহানা কখনো ভাবে না। ভাবতে ভাল লাগে না। যা হবার হোক, তখন দেখা যাবে। তবে শাহানা নিশ্চিত, যে লোকটির সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে ভালই হবে—ছ্যাবলা ধরণের হবে না। সে রকম হলে শাহানার সঙ্গে বার বার দেখা করত। চিড়িয়াখানায় নিতে যেতে চাইত। চাইনীজে নিয়ে যেত। প্রেম প্রেম একটা খেলা চলত। সবকিছু ঠিকঠাক করবার পর প্রেমের অভিনয়। এই ছেলে এসব কিছুই করেনি। এই একটি কারণে শাহানা তার উপর কৃতজ্ঞ। শাহানা ঠিক করে রেখেছে বিয়ের প্রথম রাতেই এজন্যে সে তার স্বামীকে ধন্যবাদ দেবে।

ওদের বাড়ি থেকে একবার বিরাট এক গাড়ি এসে উপস্থিত। বাচ্চারা সবাই চিড়িয়াখানায় যাবে। তাদের ইচ্ছা শাহানাকে নিয়ে যেতে। শাহানা কি পারবে যেতে? তার যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। মার জন্যে যেতে হল। সাজসজ্জা করতে হল, চুল বাঁধতে হল। শাহানা ধরেই নিয়েছিল চিড়িয়াখানাটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে ও তার সঙ্গে ঘুরতে টুরতে চায়। কিন্তু ও ছিল না, বাচ্চারাই গিয়েছে দল বেঁধে।

মাঝে মাঝে শাহানার মনে হয়, ওর মধ্যে শাহানার প্রতি একটা অবহেলার ভাব আছে। নয়ত বিয়ে ছ'মাস পিছিয়ে দেবার প্রস্তাবে ছেলের আত্মীয়-স্বজনরা কেউ রাজি হল না, কিন্তু ছেলে রাজি হয়ে সবাইকে রাজি করাল। এসব খবর অবশ্যি খিলগাঁর মামার কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর সব খবর বিশ্বাসযোগ্য নয়, তিনি বানিয়ে বানিয়ে প্রচুর কথা বলেন।

লীনা আপার বক্তৃতা প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনি আধঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। দুই মিনিট পর পর রবীন্দ্রনাথ এই বলেছেন--মহামতি বালজাক এই বলেছেন। আগে জানলে সে আসত শোকসভায়?

শাহানার বাসায় ফিরতে ফিরতে তিনটা বেজে গেল। বাসায় কেউ নেই, শুধু সফিক বসে আছে বসার ঘরে।

ঃ ওরা কোথায় ভাইয়া ?

ঃ খিলগাঁয়।

ঃ তুমি আজ এত সকাল সকাল যে?

ঃ এসে পড়লাম একটু আগে আগে।

ঃ শরীর খারাপ নাকি?

ঃ না, শরীর ভালই আছে।

ঃ আজ আমাদেরও সকাল সকাল ছুটি হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়ে মারা গেছে – এজন্যে ছুটি।

ঃ কিভাবে মারা গেল?

ঃ জানি না--এ্যাকসিডেন্ট না কি যেন হয়েছিল।

শাহানা কাপড় বদলাতে গেল। বাড়িটা ফাঁকা বলেই কেমন অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে অন্য কোন মানুষের বাড়ি। আর খিলগাঁয় যখন গিয়েছে তখন রাত দশটা এগারোটার আগে ফিরবে না। শাহানার দারুণ মনখারাপ হয়ে গেল।

ঃ শাহানা, শাহানা!

ঃ কি ভাইয়া?

ঃ চা বানাতে পারিস?

ঃ পারব না কেন, তুমি আমাকে কি ভাব?

ঃ বানা এক কাপ চা।

শাহানা অত্যন্ত উৎসাহে চা বানাতে গেল। রান্নাঘরে যাবার সে কোন সুযোগ পায় না, মনোয়ারার কঠিন নিষেধ আছে। বিয়ের আগে রান্নাঘরে যাওয়া যাবে না, আগুনের আঁচে গায়ের রঙ নষ্ট হয়। রান্না-বান্না যা শেখার বিয়ের পর শিখলেই হবে।

সফিক চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শাহানা এল তার পিছু পিছু।

ঃ তোর গোলাপ গাছে অনেক ফুল ফুটেছে রে শাহানা।

শাহানা হাসল। গাছের প্রসঙ্গে কেউ কোন কথা বললেই শাহানার বড় ভাল লাগে।

ঃ তোর গাছগুলি তুই শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবি, না রেখে যাবি আমাদের জন্যে?

ঃ কি যে তুমি বল ভাইয়া!

শাহানার লজ্জা করতে লাগল। ভাইয়া গম্ভীর ধরণের মানুষ, ঠাট্টাতামাশা কখনো করে না। কিন্তু শাহানা লক্ষ্য করেছে, বিয়ের প্রসঙ্গে সে মাঝে মাঝে হালকা কথাবার্তা বলে।

কয়েকদিন আগে তারা খেতে বসেছে—খাবার তেমন কিছু নেই, ভাইয়া হঠাৎ বলল—এতবড় লোকের স্ত্রী একজন খেতে বসেছে, আর এই খাওয়া?

শাহানার লজ্জায় মরে যাবার মত অবস্থা। সবাই খুব হাসাহাসি করল। বাবার হাসি তো আর থামেই না। শেষটায় বিষম খেয়ে ফেললেন।

আজ সফিকের মুখ অন্ধকার হয়ে আছে। একটু আগে সে ঠাট্টা করেছে, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। সফিক বলল, তোর ভাবী কখন আসে?

ঃ পাঁচটার মধ্যে এসে পড়ে। চারটা পর্যন্ত অফিস। ওদের গাড়ি এসে দিয়ে যায়।

ঃ গাড়ি এসে দিয়ে যায়! জানতাম না তো। আমাকে তো কিছু বলেনি।

ঃ এই মাস থেকেই নিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে।

শাহানার মনে হল, সফিক আরো গম্ভীর হয়ে গেছে। এতে তো খুশী হবার কথা, গম্ভীর হবে কেন? শাহানা বলল, ভাইয়া, আমি একটু ঘুরে আসি।

ঃ কোথায় যাবি ?

ঃ ছাদে।

ছাদ ফাঁকা। শাহানার মনে হচ্ছিল আনিস ভাইকে তার ঘরে পাওয়া যাবে, কিন্তু ঘর তালাবন্ধ। কাপড় শুকুবার দড়িতে ধবধবে সাদা রঙের কয়েকটা কবুতর। এদের পোষ মানানো হচ্ছে। ম্যাজিকে লাগবে। শাহানা কবুতরের খাঁচায় হাত রাখতেই একটি কবুতর ঘাড় বাঁকিয়ে তার হাতে ঠোকর দিল। এই বুঝি পোষমানা কবুতরের নমুনা?

শাহানা একা একা ছাদে হাঁটতে লাগল। শীত লাগছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। কেমন মন খারাপ করিয়ে দেবার মত একটা সন্ধ্যা নামছে। কোন রকম কারণ ছাড়াই শাহানার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। খাঁচার কবুতরগুলি আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে।

ছাদ থেকেই দেখা গেল রফিক আসছে। সে চারদিনের জন্যে যশোর গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল কাউকে বলে যায়নি। চাকরির কোন ব্যাপার হবে বোধ হয়। আজকাল চাকরির ব্যাপারে সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। শাহানা নিচে নেমে এল। রফিক তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কেমন রোগা লাগছে রফিককে।

ঃ কেমন আছেন শাহানা বেগম?

ঃ ভাল আছি। তুমি কেমন?

ঃ ভালই।

ঃ কেমন খুশী খুশী লাগছে তোমাকে। চাকরি-টাকরি কিছু হয়েছে?

ঃ না। আমার ঐসব হবে না। বিজনেস করব ঠিক করেছি। বাসায় কেউ নাই নাকি?

ঃ না, খিলগাঁয়ে গিয়েছে। ভাবী এখনো ফেরেনি।

ঃ চট করে চা বানা। খুব কড়া করে। হাই-পাওয়ারড টি দরকার। কেউ কি আমার খোঁজ করেছিল?

ঃ না। কারোর খোঁজ করার কথা?

ঃ উহুঁ।

নীলু আজও ফিরতে দেরী করছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সাড়ে ছ'টা বাজে। এতটা দেরী করার কথা না। সফিক শাহানাকে বলল, তোর ভাবী কি দেরী হবার কথা কিছু বলে গেছে?

ঃ না।

ঃ প্রায়ই কি সন্ধ্যা পার করিয়ে আসে?

ঃ না। বীণাদের বাসা থেকে অফিসে টেলিফোন করে দেখব?

ঃ দরকার নেই।

শাহানা বলল, আরেক কাপ চা বানিয়ে দেব ভাইয়া?

ঃ না।

সফিকের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে। কোন কাজের মানুষ নেই বাড়িতে, রফিককে বললে সে এনে দেবে, বলতে ইচ্ছা করল না। সফিক নিজেই চাদর গায়ে দিয়ে বেরুল। শাহানা বলল, যাচ্ছ কোথায় ভাইয়া?

ঃ সিগারেট কিনব।

ঃ আমিও আসি তোমার সাথে?

ঃ আয়।

সারাটা পথ শাহানা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, সফিক হাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। শাহানা কি বলছে কানে যাচ্ছে কিনা সন্দেহ। সে অবশ্যি হ্যাঁ হুঁ দিয়ে যাচ্ছে।

ঃ ভাবীর সঙ্গে তুমিও চলে যাও না কেন সুইডেনে? সে যা এ্যালাউন্স পাবে তাতে তোমরা দু'জন দিব্যি থাকতে পারবে। আমরা রাখব টুনীকে। কোনই অসুবিধা হবে না। তাছাড়া টুনী তো রাতে থাকে বাবার সাথে। তোমাদের জন্যে সে খুব কাঁদবে-টাদবে বলে মনে হয় না। আসবার সময় তার জন্যে একগাদা খেলনা নিয়ে আসবে। শোন ভাইয়া, বিদেশে ডল হাউস বলে একটা খেলনা পাওয়া যায়। যা সুন্দর ! চমৎকার একটা বাড়ি। সব রকম আসবাবপত্র আছে, এমন কি বাথরুমে বেসিন, কমোড সব আছে। ঐ একটা নিয়ে আসবে।

সফিকের মনে হল-শাহানা মানসিক দিক দিয়ে এখনো বড় হয়নি, ছোটই রয়ে গেছে। হুট করে তার বিয়ে ঠিক করাটা বোধহয় ভাল হয়নি। মানসিক প্রস্তুতির জন্যে সময় দেয়া দরকার ছিল।

ঃ ভাইয়া, সিগারেট কিনেই কি তুমি বাসায় চলে আসবে?

ঃ হ্যাঁ, কেন?

ঃ চল না, ঐ বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাই।

ঃ সেখানে কি?

ঃ ভাবীর মাইক্রবাস সেখানে থামে। ভাবী বাস থেকে নেমেই আমাদের দেখবে, খুব অবাক হবে। যাবে ভাইয়া?

ঃ চল যাই।

দুজনে হাঁটতে শুরু করল। শাহানা মৃদুস্বরে বলল, তোমাকে একটা গোপন খবর দিতে পারি ভাইয়া।

ঃ কি খবর?

ঃ খুবই গোপন। কাউকে কিন্তু বলতে পারবে না।

ঃ গোপন খবর হলে না বলাই তো ভাল। গোপন খবর তো বলে দেয়ার জন্যে না।

শাহানা চুপ করে গেল। ভাইয়ার সঙ্গে অন্য কোন মানুষের কোন মিল নেই। অন্য কেউ হলে বলতো, কাউকে বলব না, খবরটা কি বল? ভাইয়া সেটা বলবে না। শাহানার খুব ইচ্ছা করছে খবরটা বলে। ভাবী সতেরশ' টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি কিনেছে সফিকের জন্যে, ম্যারেজ এ্যানিভারসারি উপলক্ষে সেটা সফিককে দেয়া হবে—এই হচ্ছে খবর।

ঘড়ি কেনার সময় নীলু শাহানাকে নিয়ে গিয়েছিল। শাহানা অবাক হয়ে বলেছিল, এত দাম দিয়ে ঘড়ি কিনবে?

নীলু লাজুক হেসে বলেছে, ওকে ভাল কিছু দিতে চাই।

ঃ কিন্তু ভাইয়া তো তোমাকে কখনো কিছু দেয়নি।

ঃ কোত্থেকে দেবে? ওর কি টাকা আছে?

ঃ টাকা থাকলেও দিত না। এসব দিকে তার কোন নজরই নেই।

কথাটা খুবই সত্যি। গত ম্যারেজ এ্যানিভারসারীতে নীলু দুপুরবেলা সফিকের অফিসে উপস্থিত হল, সফিক অবাক হয়ে বলল—কি ব্যাপার, তুমি?

নীলু হেসে বলেছে, এমনি দেখতে এলাম। কি করছ?

ঃ শুধু শুধু আসবে কেন, নিশ্চয়ই কোন কাজ আছে। টুনীকে কার কাছ রেখে এসেছ?

ঃ কার কাছে আর রাখব, মা'র কাছে। তুমি কি আজ ছুটি নিতে পার?

ঃ কেন?

ঃ খিদে লেগেছে খুব। কোন একটি রেস্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ খাওয়া যেত। আজকের তারিখটা তোমার মনে নেই, তাই না?

তারা প্রায় আধঘন্টার মত দাঁড়িয়ে রইল। নীলুর বাস এল না। সফিক বলল, চল যাই, ঠাণ্ডা লাগছে।

ঃ একটু দাঁড়াও ভাইয়া, এসে পড়বে।

সফিক কোন জবাব না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। শাহানা বলল, আর একটুখানি থাকি না ভাইয়া। আমার মনে হচ্ছে, পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।

ঃ আসুক। দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।

নীলু এল নটার একটু আগে। তাদের এক কলিগ অফিস ছুটির আগে আগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অফিসের মিনিবাসে করে তাকে শেরে বাংলা হাসপাতালে নেয়া

হয়েছে। অন্য সবাইও গিয়েছে সেখানে। ডাক্তাররা বললেন, হার্ট-এ্যাটাক। ভদ্রলোকের এখনো জ্ঞান ফেরেনি। তার স্ত্রী এবং দুটি ছেলে হাসপাতালে এসে খুব কান্নাকাটি করছে।

সফিক কোন রকম উৎসাহ দেখাল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, খবর তো দেবে।

ঃ কিভাবে দেব খবরটা? সারাক্ষণ তো হাসপাতালে ছিলাম।

ঃ তুমি তো হাসপাতালে থেকে কিছু করতে পারছিলে না। শুধু শুধু আমাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেললে।

ঃ একজন কলিগের এতবড় দুঃসময়ে আমি যাব না?

সফিক গম্ভীর গলায় বলল, তর্ক পরে করবে, এখন দেখ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। রান্নাবান্না কিছুই তো হয়নি।

নীলুর প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। সে মাথা-ধরা নিয়েই রান্নাঘরে ঢুকল। শাশুড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরবেন কিনা কে জানে।

দুপুরের তরকারী কিছুই নেই। রাতের বেলার জন্যে কি রাঁধবে নীলু ভেবে পেল না। রফিককে ডিম কিনে আনার জন্যে পাঠাতে হবে।

রফিক ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। নীলু ডাকতেই সে ক্লান্তস্বরে বলল, ভাবী, আমার জ্বর। হঠাৎ করে জ্বর এসে গেছে। বিশ্বাস না হলে কপালে হাত দিয়ে দেখ।

নীলু আনিসের খোঁজে ছাদে গেল। আনিস ছিল না। নীলু ফিরে এল মনখাবাপ করে। ডাল-ভাতই খেতে হবে। রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। খুব ক্লান্তি লাগছে। নীলু শাহানাকে ডেকে বলল, তুমি রফিকের পাশে বস, মাথায় হাত-টাত বুলিয়ে দাও—ওর জ্বর।

শাহানার ইচ্ছা করছিল নীলুর সঙ্গে গল্প-টল্প করে। কিন্তু সে গেল রফিকের ঘরে। জ্বরে সত্যি সত্যি রফিকের গা পুড়ে যাচ্ছে। শাহানা বলল, চুল টেনে দিব?

রফিক বলল, চুল ধরে টানাটানি করার কোন দরকার নাই। তুই নিজের কাজে যা।

জ্বরের সময় কোন একটা কথা কানে গেলে সেটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। চুল টানার ব্যাপারটা রফিকের মাথায় ঘুরতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, তিন-চারজন অল্পবয়সী মেয়ে একঘেয়ে গলায় তার কানের কাছে চেঁচাচ্ছে ......

চুল টানা, বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
সাহেব বলেছে যেতে
পান সুপারি খেতে
পানের ভেতর মৌরি বাটা।
ইসক্রুপের চাবি আঁটা।।
চুল টানা বিবিয়ানা
চুলটানা বিবিয়ানা।

হোসেন সাহেবরা এলেন রাত এগারোটায়। সে সময় রফিকের মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। গ্রীণ ফার্মেসীর ডাক্তার অজয়বাবু চিন্তিতমুখে বসার ঘরে বসে আছেন। আনিস

আছে, রশিদ সাহেব আছেন। জ্বর উঠেছে একশ পাঁচ পর্যন্ত। রফিক বিড় বিড় করে ছড়া জাতীয় কি যেন বলছে। শাহানার বুক ধড়ফড় করছে। এ কি কাণ্ড! সুস্থমানুষ? এসে চা খেল, গোসল করল আর ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আকাশ-পাতাল জ্বর। মনোয়ারা কাঁদতে শুরু করলেন। হোসেন সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অজয়বাবু বললেন, ভয়ের কিছু নাই, জ্বর রেমিশন হবে। অস্থির হবার কিছু নাই।

রাত তিনটার দিকে রফিকের জ্বর অনেকখানি কমল। সে উঠে বসে সহজ স্বরে বলল, কিছু খেতে-টেতে দাও ভাবী। মুড়ি ভেজে আন ঝাল দিয়ে।

নীলু ঘুমুতে গেল রাত চারটার দিকে। সফিক তখনো জেগে আছে। নীলু ক্লান্তস্বরে বলল, ঘুমুবে না?

ঃ রাত তো বেশী বাকি নেই, ঘুমিয়ে কি হবে?

ঃ আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

ঃ শুয়ে পড়।

নীলু শুয়ে পড়ল। টুনী আজ তাদেব সঙ্গে ঘুমিয়েছে। অনেক বড় হয়ে গেছে মেয়েটা। দেখতে দেখতে কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে। নীলু টুনীকে বুকের কাছে টেনে আনল। টুনী ঘুমের মধ্যেই মাকে জড়িয়ে ধরল। আহা, সারাদিন দেখা হয়নি মেয়েটিকে। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করেছে কিনা কে জানে? কেমন রোগা রোগা লাগছে হাত পা। কপালের কাছে লাল একটা দাগ, ফুলে উঠেছে। পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে নিশ্চয়ই। নীলু চুমু খেল কপালের কাটা দাগে।

সফিক বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে এল। নীলু বলল, টুনী কেমন ব্যথা পেয়েছে, দেখেছ? কপাল ফুলে উঠেছে।

সফিক কিছু বলল না। নীলু বলল, আবেকটু হলে চোখে লাগত।

ঃ যাদের বাবা-মা দু'জনেই ব্যস্ত, তাদেব ছেলেমেয়েবা অবহেলার মধ্যেই বড় হবে। এটা নিয়ে দুঃখ করা ঠিক না, তুমি ঘুমাও।

নীলু মৃদুস্বরে বলল—আমার চাকরিটা তোমার পছন্দ না, তাই না?

সফিক চুপ করে রইল।

ঃ বল, তোমার কি ইচ্ছা না আমি চাকরি করি?

সফিক শান্ত স্বরে বলল, আমার কাছে মনে হয় পরিবারের মধ্যে প্রতি মেয়েদের দায়িত্ব অনেক বেশী।

ঃ সেই দায়িত্ব আমি পালন করছি না?

ঃ রাতদুপুরে এ নিয়ে তর্ক করতে ভাল লাগছে না।

ঃ তর্ক না, তোমার মতামতটা শুনি।

ঃ মতামত তো দিলাম। টুনী বড় হচ্ছে অযত্নে অবহেলায়, যার ফলশ্রুতি হিসেবে তার মানসিক বিকাশ অন্য সব শিশুদের মত হবে না।

ঃ টুনীর মানসিক বিকাশ হচ্ছে না?

ঃ আমি ইন জেনারেল বলছি। চাকরিজীবী মহিলার কাছে ঘর-সংসারের চেয়ে তাদের ক্যারিয়ারই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। অফিসের একজন কলিগের অসুস্থতা তার কাছে বিরাট

ব্যাপার মনে হয় যেমন তোমার উদাহরণটাই ধরা যাক।

: আমার কি উদাহরণ?

: সুইডেনের ব্যাপারটায় তুমি কি রকম উল্লসিত হয়ে উঠলে। একবারও ভাবলে না এই ছয় মাস টুনী কিভাবে থাকবে?

: ভাবিনি তোমাকে কে বলল?

: ভাবলেও সেটাকে তেমন গুরুত্ব দাওনি। পাসপোর্ট করা, এই করা, সেই করাতেই ব্যস্ত।

: তুমি চাও না আমি যাই?

সফিক জবাব দিল না।

: বল তুমি চাও না?

: না।

: চাকরি করি তাও চাও না?

: আমি না চাইলেই তুমি ছেড়ে দেবে? তা পারবে না। একবার যখন ঢুকেছ সেখান থেকে কিছুতেই বেরুতে পারবে না। সংসার যদি ভেসেও যায় তাতেও না।

: এতটা নিশ্চিত হয়ে কথা বলছ কি ভাবে?

: নিশ্চিত হয়ে বলছি, কারণ আমি জানি। যে মেয়ে চাকরি করে সে কিছু পরিমাণে স্বাধীন। সেই স্বাধীনতা কোন মেয়েই ছাড়বে না। সে সংসার ছেড়ে দেবে, কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়বে না।

: মেয়েরা স্বাধীন হোক সেটা তুমি চাও না?

সফিক বলল, যথেষ্ট তর্ক হয়েছে, এখন ঘুমুতে যাও।

নীলু ঘুমুতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান শুনা গেল। শুরু হচ্ছে আরেকটি দিন। এই দিন অন্য সব দিনের মত নয়। এটি একটি বিশেষ দিন। এই দিনে সাত বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল।

বৈশাখ মাস।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। ধরণ দেখে মনে হয়, কালবৈশাখী হবে। পাখিরা অস্থির হয়ে ওড়াউড়ি করছে। ওরা টের পায়। কবির মাষ্টার দ্রুত পা চালাচ্ছেন। তার সঙ্গে আছে শওকত। শওকতের মাথায় বিছানার চাদর দিয়ে বাঁধা গাদাখানিক বই। বইগুলি যোগাড় হয়েছে নীলগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর জন্যে। পাবলিক লাইব্রেরী আপাতত তাঁর শোবার ঘরে। খুব শীগগীরই ঘর তোলা হবে। জমি খানিকটা পেলেই হয়। জমি পাওয়া যাচ্ছে না।

কবির মাষ্টার আকাশের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললেন, তাড়াতাড়ি পা চালা শওকত। তুই দেখি বইগুলি ভিজানোর মতলব করছিস।

ঃ আর কত তাড়াতাড়ি যাইতাম? আমি তো আর ঘোড়া না? মাথার উপরে আছে তিন মুনি বোঝা।

ঃ লম্বা লম্বা পা ফেল রে বাবা। বই ভিজলে সর্বনাশ।

লম্বা লম্বা পা ফেলেও রক্ষা হল না। কালী মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই চেপে বৃষ্টি এল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। তারা ছুটতে ছুটতে কালী মন্দিরে উঠল। মন্দিরটি জরাজীর্ণ। পূজা টুজা হয় না দীর্ঘদিন। কালী মূর্তির মাথা নেই। মন্দিরের চাতাল গোবরে ভর্তি। কবির মাষ্টারের এক পা গোবরে ডুবে গেল।

ঃ এই কি কাণ্ডরে শওকত!

পাকা দালানের বাড়ি। ছাদ ফেটে গেছে। পানি আসছে ভাঙ্গা ছাদ থেকে। শওকত বলল, হাততালি দেন স্যার।

ঃ কেন?

ঃ জায়গাটা সাপে ভর্তি।

ঃ বলিস কি?

ঃ দুইটা ছাগল মরল সাপের কামড়ে।

ঃ আরে ব্যাটা, আগে বলবি তো?

কবির মাষ্টার এই একটি প্রাণীকে ভয় করেন। এই প্রাণীটির সঙ্গে কেন যেন তাঁর বার বার দেখা হয়।

ঃ শওকত!

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ চল রওনা দেই।

ঃ এই তুফানের মইধ্যে কই যাইবেন? জবর তুফান হইতেছে।

বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের দরজা জানালা কিছু নেই। বৃষ্টির ঝাপটায় দু'জনেই কাক-ভেজা হয়ে গেল। কবির মাষ্টার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এককালে কত জাঁকজমক ছিল মন্দিরের। প্রতি অমাবস্যায় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা হত। এখন কিছুই হয় না। গরু ছাগল চরে বেড়ায়। বিত্তশালী হিন্দুদের কেউই নেই।

সবার ধারণা হয়েছে, সীমান্ত পার হতে পারলেই মহা সুখ।

পালবাবুরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর একটি ছেলে মারা গেল। পালিয়ে যাবার সময় তাঁর বড় ছেলের বউ বরুণা রহস্যময়ভাবে মিলিটারীদের হাতে পড়ল। তার আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

পালবাবু প্রায় জলের দরে বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করলেন। সবাই বলল, এখন আর ভয় কি? এখন কেন যাবেন? পালবাবু থাকলেন না। দেশ ছাড়ার আগে কবির মাষ্টারকে বলে গেলেন, মাষ্টার, বসতবাড়ি আর দশ বিঘা ধানী জমি বিক্রি করি নাই। এইগুলি আমি তোমারে দিয়া যাইতেছি।

কবির মাষ্টার অবাক হয়ে বললেন, কেন?

ঃ আমার বৌমা যদি কোন দিন আসে, এগুলি তুমি তারে দিবা। আমার কেন জানি মনে হয়, বৌমা বাঁইচা আছে। সে একদিন না একদিন আসব নীলগঞ্জে।

ঃ সে বেঁচে আছে এটা মনে করার কারণ কি?

ঃ আমি স্বপ্নে দেখছি মাষ্টার।

ঃ সে যদি আসে, আমি নিজে পৌঁছে দেব আপনার কাছে।

ঃ না মাষ্টার, তার দরকার নাই।

ঃ কেন? দরকার নেই কেন?

পালবাবু জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বরুণা ফিরে আসেনি। দশ বিঘা জমি এবং বসতবাড়ি আছে আগের মতই। একবার ফজল মিয়া দলিল বের করল একটা—বসতবাড়ি এবং জমি তাকে দলিল করে দিয়ে গেছে পালরা। সেই দলিল আদালতে টিকল না। কিছুদিন হল ফজল আলির ভাগ্নে মিম্বর মিয়া একটি হ্যাণ্ডনোট বের করেছে--যার মর্মার্থ হচ্ছে উনিশশো সত্তুর সনে পালবাবু তার কাছে এগারো হাজার বত্রিশ টাকা কর্জ নিয়েছে। সে টাকা শোধ হয়নি। টাকা শোধ কিংবা অনাদায়ে বাড়িঘর নিলামে তোলার জন্যে সে চেষ্টা-তদবির করছে।

কবির মাষ্টার মিম্বর মিয়ার সঙ্গে দেখা করে ঠাণ্ডা গলায় বলে এসেছেন, দেখা মিম্বার, উনিশশো সত্তুর সনে তুমি হাফপ্যান্ট পরতে। দাঁড়িগোফও জ্বালায়নি। তোমার কাছ থেকে এগারো হাজার টাকা কর্জ নিল পালরা? জালিয়াতি করতে হলে বুদ্ধি লাগে, তোমার মত বেকুবের কাজ না।

মিম্বর মিয়া কোন উত্তর দেয়নি, কিন্তু এমন ভাবে তাকিয়েছে যার মানে সে সহজে ছাড়বে না।

কিছুদিন হল কবির মাষ্টার ভাবছেন গার্লস স্কুলটা পালদেব বসতবাড়িতে শুরু করলে কেমন হয়? নাম দেবেন--বরুণা বালিকা বিদ্যালয়। বরুণা যদি সত্যি সত্যি ফিরে আসে সে খুশীই হবে। আর একবার স্কুল চালু হয়ে গেলে সহজে কেউ হাত বাড়াবে না।

ঝড় ভালই হয়েছে। গাছপালা পড়ে চারদিক লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। অধিকাংশ কাঁচা বাড়ি ঝড়ে উড়ে গেছে। মানুষ-জন মারা যায় নি, তবে বদিউজ্জামানের মা'র পা ভেঙ্গেছে দু'জায়গায়। সে চিৎকার করছে গরুর মত। বদিউজ্জামানের সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে তার ঝড়ে উড়িয়ে নেয়া ঘরের শোকে কাতর। সে উঠোনে বসে আছে মাথা নিচু করে। মায়ের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে একবার ধমকে উঠেছে--আহ্-খালি চিল্লায়। চুপ করেন।

ঃ ডাক্তারের কাছে আমারে লইয়া যাবে বদিউজ্জামান?

ঃ সকাল হউক।

ঃ সকালতক বাঁচতাম না।

ঃ না বাঁচলে নাই।

বদিউজ্জামানের স্ত্রী হাঁস-মুরগীর খবর নিতে ছুটাছুটি করছে।

আকাশের অবস্থা ভাল নয়। সাধারণত কালবৈশাখীর পরে- পরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, এবার সে রকম হচ্ছে না। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়িঘর-ভাঙ্গা মানুষগুলির জন্যে রাতের একটা আশ্রয় দরকার। এতগুলি মানুষকে আশ্রয় দেবার মত ব্যবস্থা হঠাৎ করা মুশকিল।

কবির মাষ্টার ছাতা মাথায় দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। এত বড় একটা ঝড় হয়ে গেল, কিন্তু একজন মানুষও মারা গেল না এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করল। ঝড়ের মধ্যে বেঁচে থাকা এদের অভ্যাস আছে।

বদিউজ্জামানের মাকে সদরে পাঠানো দরকার। বদিউজ্জামানের সেদিকে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ঘরের শোকেই সে কাতর। কবির মাষ্টার বিরক্ত হয়ে বললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে আছিস কেন? মাকে হাসপাতালে নিয়ে যা।

ঃ সকাল হউক। সকালে নিমু।

ঃ সকালে নিবি কিরে ব্যাটা! অবস্থা তো খুবই খারাপ।

ঃ এখন রওনা দিলে শেষ রাইতে পৌঁছমু সদরে। কেউ পুছত না আমারে।

ঃ রুয়াইল বাজারে নিয়ে যা। ডাক্তার দেখা।

ঃ পয়সা নাই মাষ্টার সাব। হাঁস মারা গেছে দুইটা। তুফানে ফতুর হইছি।

বদিউজ্জামান থুক করে একদলা থুথু ফেলল। তার মা প্রাণপণে চিৎকার শুরু করল। কবির সাহেব বললেন, ডাক্তারের খরচ আমার কাছ থেকে নে।

তিনি তাঁকে পঞ্চাশটা টাকা দিলেন। এদের এত খারাপ অবস্থা, দুঃসময়ের জন্যে কোন সঞ্চয় নেই। একটা নীলগঞ্জ তহবিল করা দরকার, যেখান থেকে দুঃসময়ে টাকাপয়সা নেয়া যাবে। তবে যথাসময়ে সে টাকা ফেরত দিতে হবে। তাতে সবার মনে একটা সাহস হবে।

ঃ বদিউজ্জামান!

ঃ জ্বি।

ঃ টাকাটা ফেরত দিবি মনে করে। আমার নিজের টাকা না। সুখী নীলগঞ্জের টাকা।

ঃ জ্বি আইচ্ছা।

কবির সাহেব রাতে আব ঘুমুতে গেলেন না। সমস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। অল্প কিছু সময়েব জন্যে ঘুমুতে যাবার মানে হয় না। তিনি তাঁর চিঠি-পত্র নিয়ে বসলেন। চিঠিপত্র আসতে শুরু করেছে। ছাত্রদের কাছ থেকে যে রকম সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়েছিল সে রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। চিঠির উত্তর সবাই দিচ্ছে, কিন্তু আসল জায়গায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। যেসব চিঠি পাচ্ছেন তার একটির নমুনা এরকম--

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও আপনি একটা কিছু করতে যাচ্ছেন তা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আশা করি আপনার স্বপ্ন সফল হবে। সুখী নীলগঞ্জের প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। আমি কতটুকু সাহায্য করতে পারব তা জানি না, কারণ বর্তমানে কিছু আর্থিক সমস্যা যাচ্ছে। সমস্যাটা মিটলেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য
আমীরুল ইসলাম।

এই জাতীয় চিঠিগুলির উপর তিনি লাল কালি দিয়ে লেখেন– সাক্ষাৎ। যার মানে

হচ্ছে চিঠিতে এর কাছে কোন কাজ হবে না, দেখা করতে হবে। অবশ্যি মাঝে মাঝে দু'একটা এমন চিঠি পান যে আনন্দে চোখ ভিজে উঠে। রংপুর থেকে ওহীদুল আলম বলে, একটি ছেলে লিখল– "স্যার, আমি ভাবতেও পারিনি আমার কথা আপনার মনে আছে। কি যে খুশী হয়েছি চিঠি পড়ে। অতি নিকৃষ্ট ছাত্র হয়েও আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি, এই আনন্দ আমার রাখার জায়গা নেই। স্যার, আমি জীবনে তেমন কোন সাফল্য লাভ করতে পারিনি। মোটামুটি একটি টানাটানির সংসার বলতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, আমি আপনাকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। পাঁচশ' টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠালাম। আমি আমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে আপনাকে পাঠাব। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনার জন্যে কিছু করতে পারছি। স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে একদিন একটা বড় অপরাধ করেছিলাম, আপনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এক লাইনের যে উপদেশ দিয়েছিলেন আমার তা এখনো মনে আছে। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তা মনে থাকবে। ....."

এই জাতীয় চিঠিগুলি তিনি আলাদা করে রাখেন। কোন কারণে মনখারাপ হলে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই মন ভাল হয়ে যায়। মনে হয় সুখী নীলগঞ্জ প্রকল্প নিশ্চয়ই একদিন শুরু হবে।

তিনি ফজরের আজান পড়ার আগে পর্যন্ত চিঠিপত্র নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। তারপর রুটিন মত বেড়াতে বেরুলেন। দক্ষিণপাড়া থেকে কান্নার শব্দ আসছে। ব্যাপার কি? তিনি দ্রুত দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

কাঁদছে বদিউজ্জামান এবং তার স্ত্রী। বদিউজ্জামান তার মাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি, তার মা কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে।

তিনি অবাক হয়ে নীলুর দিকে তাকালেন।

যেন নীলুর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। নীলু বলল, স্যার, আমি খুব লজ্জিত। শেষ মুহূর্তে জানালাম।

বড় সাহেব বললেন, লজ্জিত হওয়াই উচিত। অন্তত একমাস আগে জানালেও আমরা অন্য কাউকে পাঠাতে পারতাম।

নীলু মাথা নীচু করে বসে রইল। বড় সাহেব বললেন, আপনার সুইডেনে যেতে না পারার পেছনে কারণগুলি কি?

: আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

: কত ছোট?

ঃ সাড়ে তিন বছর বয়স।

ঃ এই প্রবলেমটা আগে লক্ষ্য করলেন না কেন?

ঃ আগে ভেবেছিলাম সম্ভব হবে। দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে যাবে।

বড় সাহেব যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন। নীলু তাঁর মুখ দেখেই সেটা বুঝতে পারছে। কিন্তু তার করার কিছুই নেই।

ঃ ট্রেনিং হবে দুই পর্যায়ে। তিনমাস অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং পরের তিনমাস সেলস এণ্ড প্রমোশন। আপনি না হয় প্রথম তিনমাসের ট্রেনিংটা শেষ করে চলে আসুন। নাকি সেখানেও অসুবিধা?

ঃ মেয়েদের স্যার অনেক অসুবিধা।

ঃ তিনমাস আপনার বাচ্চাকে দেখবার কেউ নেই? তার দাদা কিংবা খালা, ফুপু?

নীলু মৃদুস্বরে বলল, আমি একা একা এতদূর যাই, এটা আমার স্বামীর পছন্দ নয়।

ঃ আই সি। আপনি যদি মনে করেন আমি কথা বললে তিনি কনভিন্সড হবেন, তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি।

ঃ দরকার নেই স্যার।

নীলু উঠে দাঁড়াল। এখন সাড়ে বারটা বাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ ব্রেক হবে। তার আজ আর কাজ করতে ইচ্ছা করছে না। সে ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

কেন জানি বাসায় যেতেও ইচ্ছা করছে না। আবার একা একা ঘুরে বেড়াতেও ইচ্ছা করছে না। বন্যার অফিসে নয়ত তার বাসায় গিয়ে আড্ডা দেয়া যেত। অনেকদিন বন্যার সঙ্গে দেখা হয় না। তার অফিসে চলে গেলে কেমন হয়? আগে কোন দিন যায়নি। ঠিকানা আছে, খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে কেন?

বন্যা খুবই অবাক হল। দু'বার বলল, একা একা খুঁজে বের করলি? তুই তো দারুণ স্মার্ট হয়ে গেছিস। অল্প কিছুদিন চাকরি করেই তোর তো ভাল উন্নতি হয়েছে। তবে ভালমত বুদ্ধি খেলাতে পারিসনি, তোর প্রথমে উচিত ছিল টেলিফোন করে দেখা আমি আছি কিনা।

ঃ তোর এখানে আসব এমন কোন প্ল্যান ছিল না। হঠাৎ ঠিক করা।

ঃ আর মিনিট দশেক দেরী হলেই আমার সঙ্গে দেখা হত না।

ঃ এই সময় ছুটি হয়ে যায় নাকি তোদের?

ঃ না, ছুটি হয় চারটায়। আজ একটু সকাল সকাল ফিরছি, বাড়ি দেখতে যাব।

ঃ বাড়ি বদলাচ্ছিস?

ঃ না, বরের সঙ্গে বনিবনা একেবারেই হচ্ছে না। আমি আলাদা বাসা নিচ্ছি। তোকে সব বলব, দাঁড়া একটু, বস্‌কে বলে আসি। তুই কিছু খাবি?

ঃ না।

নীলু অবাক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিসব পাগলামি যে করছে বন্যা! বনিবনা না হলেই আলাদা বাসা ভাড়া নিতে হবে? তাছাড়া এই শহরে একটি মেয়েকে কেউ বাসা ভাড়া দেবে না। এই শহরে কেন, কোন শহরেই দেবে না।

বন্যা নীলুকে নিয়ে রিক্সায় উঠল। হালকা গলায় বলল, তোর হাতে সময় আছে তো?

ঃ আছে।

ঃ তাহলে চল আমার সঙ্গে। একজন কেউ সঙ্গে থাকলে সাহস হয়। নিউ এলিফেন্ট রোডে একটা মহিলা হোস্টেলের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম। কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকেই কেমন গা ছমছম করতে লাগল। সুন্দর সুন্দর সব মেয়েরা ঘুরঘুর করছে। ববকাট চুল, ঠোঁটে লিপস্টিক। বেশ ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে হয়, কিন্তু কেমন একটু খটকা লাগল। হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বললাম। বিশাল মৈনাক পর্বতের মত এক মহিলা। প্রথমে বলল, সীট আছে। তারপর যখন শুনল আমি একটা এম্ব্যাসীতে চাকরি করি তখন বলল, সীট নেই।

ঃ তুই কি বললি?

ঃ কিছু বলিনি, চলে এসেছি। জায়গাটা ভাল না।

নীলু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কি আবার ঐখানেই যাচ্ছিস নাকি?

ঃ না, আরেকটা মহিলা হোস্টেল আছে। শুনেছি সেটা ভাল। অনেক চাকরিজীবী মহিলা থাকে। তবে সীট পাওয়া মুশকিল।

ঃ হাসবেণ্ডের সঙ্গে কি হয়েছে সেটা শুনি।

ঃ রিক্সায় বসে বলার মত কোন স্টোরি না। নিরিবিলিতে বলব। আর ঐসব শুনে কি করবি?

ঃ হোস্টেল-টোস্টেল খোঁজার চেয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা ভাল না?

ঃ আমি কিছু মেটাব না। ও যদি চায় মেটাবে। দোষটা ওর, আমার না।

রিক্সাতেই বন্যা নিচু গলায় তার সমস্যার কথা বলতে শুরু করল।

ঃ তোকে তো আগেই বলেছি, আমার চাকরি করাটা ও পছন্দ করে না। মাসখানেক আগে আমাদের একজন অফিসার বেড়াতে এসেছেন আমার বাসায়। কার্টসি ভিজিট। এতেই তার মুখ গম্ভীর—কেন এসেছে? মহিলা কলিগদের বাসায় ঘুরঘুব কঁরাব দরকারটা কি? এইসব। তারপর কি হল শোন। সেই ছেলেটা আরেকদিন এল, আর ওব মাথায় একদম রক্ত উঠে গেল—কেন বার বার আসবে?

নীলু ক্ষীণস্বরে বলল, সত্যি তো, কেন আসবে বার বার?

ঃ বার বার কোথায় দেখলি? দু'বার এসেছে মাত্র। আর আমি কি তাকে বলতে পারি, আপনি আসবেন না আমাব এখানে?

নীলু চুপ করে রইল। বন্যা গম্ভীর গলায় বলল, তারপর কি হল শোন-- ও বলল, তুমি চাকরি ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে যদি থাকতে চাও তাহলে চাকবি ছাড়তে হবে।

ঃ তুই কি বললি?

ঃ আমার রাগ উঠে গেল। আমি বললাম, তুমি এমন কি রসোগোল্লা যে তোমার সঙ্গে থাকতেই হবে?

ঃ কি সর্বনাশ!

ঃ সর্বনাশের কি আছে? সত্যি কথা বললাম, মেয়ে হয়েছি বলে সত্যি কথা বলতে পারব না?

ঃ সত্যি মিথ্যা এখানে কিছু নেই। তুই তোর বরকে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলি।

ঃ তা করেছিলাম। ও আমাকে রাগিয়ে দিতে পারবে, আমি পারব না? খুব পারব।

ঃ কতদিন থাকবি আলাদা?

ঃ যতদিন দরকার হয় ততদিন থাকব। নিজ থেকে ফিরে যাবার মেয়ে আমি না।

হোস্টেলে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। সুপার আসেন পাঁচটায়। সুপার ছাড়া অন্য কেউ কিছু বলতে পারবে না।

মহিলা হোস্টেলটি বেশ সুন্দর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভেতরের দিকে ফুলের বাগান আছে। কমন রুমটি বিশাল। মেয়েরা হৈ হৈ করে পিংপং খেলছে। নীলু অবাক হয়ে দেখল, একটা টেবিল ঘিরে কয়েকজন মেয়ে তাস খেলছে। মেয়েরাও তাস খেলে নাকি? রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতেই মেয়েদের তাস খেলার ব্যাপারটা আছে। বাস্তবেও যে খেলা হয় নীলু প্রথম দেখল।

ঃ দেখ বন্যা, তাস খেলছে!

ঃ খেলবে না কেন? একশ'বার খেলবে। জুয়া খেলবে। মদ খেলে রাতে বাড়ি ফিরে স্বামীকে ঠ্যাঙ্গাবে। কোন ছাড়াছাড়ি নেই।

নীলু হেসে ফেলল। বন্যার স্বভাবচরিত্রে অনেকখানি পাগলামি এসে ঢুকে যাচ্ছে।

সুপার এল সাড়ে পাঁচটায়। সুপার মহিলা নন, পুরুষ। অভদ্র ধরণের লোক। কেউ কিছু বললে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে যার থেকে ধারণা হয়, লোকটি কারো কোন কথা শুনে না।

ঃ এখানে কোন সীট নাই। দরখাস্ত করলে ওয়েটিং লিস্টে নাম তুলব। ফরম নিয়ে দরখাস্ত করুন। কেন মহিলা-হোস্টেলে থাকতে চান তার কারণ আলাদা একটা কাগজে লিখে সঙ্গে দেন। সীট খালি হলে আপনাকে জানানো হবে।

ঃ কবে নাগাদ খালি হবে?

ঃ তা আমি কি করে বলব? আর খালি হলেই আপনি পাবেন কেন? ওয়েটিং লিস্টে যে প্রথম আছে সে পাবে।

ঃ আপনি এত অভদ্রভাবে কথা বলছেন কেন?

ঃ কোন্ কথাটা অভদ্রভাবে বললাম?

ঃ সারাক্ষণই তো ক্যাট-ক্যাট করে কথা বলছেন।

হোস্টেল সুপার থমথমে মুখে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে থেকে বলল, এ্যাপ্লাই করতে চাইলে ফরম নিয়ে এ্যাপ্লাই করুন। পাশের কামরায় ফরম আছে।

নীলু মৃদুস্বরে বলল, করবি এ্যাপ্লাই?

ঃ করব— করব না কেন?

ঃ এখন কোথায় যাবি?

ঃ কোথায় আবার যাব, বাসায় যাব। রোজ একবার খোঁজ নেব সীট খালি হল কিনা।

নীলু লক্ষ্য করল বন্যাকে কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। চোখের নিচে কালি। দেখেই মনে হয়, শরীর বিশ্রামের জন্যে কাতর। বাচ্চা-টাচ্চা হবে না তো? রাস্তায় নেমেই নীলু বলল, তোর কি আর কোন খবর আছে?

ঃ আর কি খবর থাকবে?

ঃ এই ধর জনসংখ্যা-বৃদ্ধিবিষয়ক কোন খবর?

বন্যা জবাব দিল না। অন্যমনস্কভাবে নিঃশ্বাস ফেলল। নীলু বলল, কি, আছে নাকি?

ঃ জানি না। তুই এখন বাসায় চলে যা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যেতে পারবি তো একা একা?

ঃ পারব।

ঃ আয় তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

ঃ বাসে তুলে দিতে হবে না। তুই বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর। তোর বিশ্রাম দরকার।

বলতে বলতে নীলু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল। বন্যা বিরক্ত হয়ে বলল, কি যে বাজে কথা বলিস।

ঃ তাহলে তোর কোন খবর নেই?

বন্যা এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তার মুখ বিষণ্ণ। এমন একটি সুখের সময়ে কেউ এত বিষণ্ণ থাকে কেন? এমন ছেলেমানুষ কেন বন্যা?

নীলু বাসায় ফিরল সন্ধ্যার পর।

তার জন্যে বড় ধরণের একটা চমক অপেক্ষা করছিল। নীলুর মা রোকেয়া দুপুরে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সঙ্গে বাবলু, বিলুর ছেলে। নীলু আনন্দের উচ্ছ্বাসে কেঁদে টেদে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলল। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর মা'র সঙ্গে নীলুর দেখা। রোকেয়া নিজেও কাঁদছিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে চেষ্টা কবছিলেন মেয়েকে সামলাবার। টুনী এবং বাবলু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছে। টুনী কখনো তার মাকে কাঁদতে দেখেনি। তার বিস্ময়ের কোন সীমা ছিল না। বড় মানুষেরাও তাহলে এমন করে কাঁদে?

নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, রাজশাহী থেকে ঢাকা কত আর দূর মা? তোমার আসতে সাড়ে তিন বছর লাগল?

রোকেয়া মেয়েকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। কিছুই বললেন না।

ঃ তোমার নাতনীকে দেখেছ মা।

ঃ হুঁ। বড় সুন্দর মেয়ে হয়েছে। তোর ননদের মত রূপসী হবে।

শাহানা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে খুব লজ্জা পেল। লাজুক স্বরে বলল, তোমার কান্না থামাও তো ভাবী। তোমার কান্না দেখে আমার নিজেরো চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

নীলু বাবলুকে কোলে নিয়ে আবার খানিকক্ষণ কাঁদল।

ঃ এই বুঝি বাবলু?

রোকেয়া বললেন, কোল থেকে নামিয়ে দে। কেউ কোলে নিলেই কাঁদে।

নীলু নামাল না। শাহানা বলল, এই ছেলেটা কিন্তু ভারী অদ্ভুত। কোন কথা বলে না। দুপুরবেলা এসেছে, এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। মাঐমা, ও কি রাজশাহীতেও এ রকম?

ঃ হ্যাঁ গো মা। কথাবার্তা যা বলে আমার সঙ্গেই বলে, তাও কানে কানে।

নীলু হাত মুখ ধুতে গেল। তার এত আনন্দ লাগছে আজ। মনে হচ্ছে পৃথিবীর মত সুখের জায়গা আর কিছুই নেই। অসংখ্য দুঃখের মধ্যেও এখানে হঠাৎ এমন সব সুখের

ব্যাপার ঘটে যায় যে সব দুঃখ চাপা পড়ে যায়। বাথরুমে দরজা বন্ধ করে নীলু আবার খানিকক্ষণ কাঁদল।

রোকেয়াকে এ বাড়ির সবাই বেশ পছন্দ করেন। মনোয়ারা নিজেও করেন। অন্য যে কেউ এ বাড়িতে কিছুদিনের জন্যে থাকতে এলেও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন, শুধু এই একটি ক্ষেত্রে করেন না। এর মূল কারণ হচ্ছে রোকেয়ার স্বভাব। তিনি কথা বলেন কম। গভীর আগ্রহে অন্যের কথা শোনেন। নিজের কোন মতামত কখনোই জাহির করেন না। যখন কিছু বলেন, এত আন্তরিকতায় সঙ্গে বলেন যে শুনতে বড় ভাল লাগে।

মনোয়ারা দুপুর থেকে তাঁর সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনেক কথা বলছেন। তার মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল নীলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

ঃ এই দেখেন না বেয়ান সাহেব, আমার ঘাড়ে মেয়ে দিয়ে সেই সকালে চলে যায় অফিসে, ফিরে সন্ধ্যা পার করে। ঘরে একটা কাজের মানুষ নাই। আমি একা মানুষ। বয়স তো হয়েছে আমার। না কি বলেন?

ঃ কাজের লোক রাখেন না কেন?

ঃ হাগারের-পাগারের একজন কাউকে ধরে আনলেই রাখব নাকি? একটাকে রেখেছিলাম– বেশ কাজের। তারপর দেখি, নাক ঝেড়ে সেই হাত তার শার্টে মুছে যেন কিছুই হয়নি এরকমভাবে টেবিলে ভাত বাড়তে গেল। এক চড় দিয়ে হারামজাদাকে বিদেয় করেছি।

ঃ বিদেয় করলেন কেন? ভালমত বুঝিয়ে দিলেই হত?

ঃ আমার এত সময় নেই বেয়ান সাহেব যে বসে বসে তাকে শিখাব। যে শিখে না নয় বছরে সে শিখেনা নব্বুই বছরেও, না। আর ঝামেলা কি একটা? শাহানার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, জানেন তো?

ঃ জ্বি জানি।

ঃ হুটহাট করে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোকজন আসছে। ওদের তো আর টোস্ট বিসকিট দিয়ে চা দেয়া যায় না, কি বলেন?

ঃ না, তা দেবেন কিভাবে?

ঃ কিন্তু দিতে হয়। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। সেইদিন শাহানার একখানা শাশুড়ী এসেছিলেন। একটা মানুষ নেই ঘরে। চা দিতে গিয়ে দেখি চায়ের পাতা নেই। চিন্তা করেন অবস্থা।

ঃ শাহানার বিয়েটা কবে?

ঃ জুলাই মাসের দশ তারিখে মোটামুটি ভাবে ঠিক করা হয়েছে। ছেলের ছোট চাচা থাকেন হাওয়াই। উনি জুলাই মাস ছাড়া আসতে পারবেন না। আর এটা হচ্ছে ওঁদের বংশের প্রথম কাজ, ওঁরা সবাইকে নিয়ে করতে চান।

ঃ তাতো চাইবেই।

ঃ বিরাট খরচের ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন। এদিকে হাত একবারে খালি। কিভাবে কি হবে কে জানে। মনে হলেই বুক শুকিয়ে আসে। ভেবেছিলাম এর মধ্যে রফিকের একটা কিছু হবে, কিছুই হচ্ছে না।

ঃ ইনশাআল্লাহ হবে শিগগীর।

ঃ আর হয়েছে! মহা অপদার্থ। ওর কিছুই হবে না।

বাবলু তার অদ্ভুত স্বভাবের জন্যে খুব অল্প সময়েই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হোসেন সাহেবের মতে বাবলুর মত গম্ভীর ছেলে তিনি এর আগে দেখেননি। কোন কথা নেই, কান্নাকাটি নেই, ঝামেলা নেই। গভীর আগ্রহে সব কিছু দেখেছে। সবই অবশ্যি দূর দূর থেকে। মনোয়ারার ধারণা--ছেলেটা হাবা টাইপ, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। কিন্তু কথাটা সম্ভবত ঠিক নয়। ছেলেটির বুদ্ধি ভাল। শুধু ভাল নয়, বেশ ভাল।

টুনী তার সঙ্গে ভাব করার খুব চেষ্টা করছে। বাবলু আছে তার সঙ্গে কিন্তু খুব একটা ভাব হয়েছে বলে মনে হয় না। টুনী রান্নাবাটিখেলার সময় বাবলু একটু দূরে বাসে থাকে। তাকিয়ে থাকে গভীর মনোযোগে। খেলাতে তার অংশগ্রহণ বলতে এইটুকুই। টুনীর সঙ্গে তার কথাবার্তার নমুনা এ রকম–

টুনী ঃ রান্নাবাটি খেলবে?

বাবলু ঃ (নিশ্চুপ)

টুনী ঃ আমি হচ্ছি মা, তুমি কি হবে?

বারলু ঃ (মৃদু হাসি)

টুনী ঃ বাবা হবে?

বাবলু ঃ (মাথা নাড়ল। তার অর্থ কি ঠিক বোঝা গেল না। হ্যাঁ হতে পরে, আবার নাও হতে পারে)

টুনী ঃ আচ্ছা তুমি বাবা। এখন অফিসে যাও। সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে আসবে।

বাবলু ঃ (নড়ল না)

টুনী ঃ কী, অফিসে যাবে না?

বাবলু ঃ (মাথা নাড়ল। কিন্তু এবারো বোঝা গেল না সে হ্যাঁ বলছে কি না বলছে।)

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এ বাড়িতে যে একটিমাত্র লোকের সঙ্গে তার কিছু কথাবার্তা হয় সে সফিক। সে ঘুরে ফিরে সফিকের কাছে আসে এবং অত্যন্ত গম্ভীর হযে সফিকের পাশে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে চলে যায়। এই অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই দু'একটা কথাবার্তা হয়।

যেমন গত রবিরারের কথা ধরা যাক। সফিক শুয়ে ছিল বিছানায়, বাবলু পর্দার আড়াল থেকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করল। তারপর গট গট করে ঘরে ঢুকে পা ঝুলিয়ে খাটে বসে রইল। সফিক বলল– কি খবর তোমার বাবলু সাহেব? ভাল আছ?

বাবলু হ্যাঁ- সূচক মাথা নাড়ল। সে ভালই আছে।

সফিক বলল, হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো। বাবলু দিল। সফিক সিগারেট ধুরিয়ে বলল, তুমি একটা খাবে নাকি বাবলু?

বাবলু মাথা নাড়ল, সে খাবে না। সফিক বলল, তুমি সিগারেট খাও না?

ঃ না।

ঃ কেন?

ঃ ভাল লাগে না।

এমন ভাবে বলা যেন আগে অভ্যাস ছিল, ভাল না লাগায় বর্তমানে ছেড়ে দিয়েছে, তবে খুব পীড়াপিড়ি করলে সে একটা সিগারেট টেনে দেখতে পারে।

ঃ বাবলু সাহেব, তুমি ছড়া বা কবিতা এসব কিছু জান?

ঃ হুঁ।

ঃ শোনাও একটা ছড়া। ছড়া শুনতে ইচ্ছা করছে।

বাবলু উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত ছড়া শুনাবার তার তেমন আগ্রহ নেই। ঘর থেকে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে। পরমুহূর্তেই পর্দার ওপাশ থেকে বাবলুর ছড়া শোনা গেল...

হইয়ার বাড়ি গেছিলাম
দুধ ভাত দিছিল
দুই ভাত খাইছিলাম।

অদ্ভুত ছড়া। স্বরচিত হবারই সম্ভাবনা। সফিক হাসিমুখে বলল, খুব চমৎকার ছড়া। এসো ভেতরে এসো। বাবলু ভেতরে ঢুকল না। সফিককে অবাক করে দিয়ে একই ছড়া দ্বিতীয়বার পর্দার আড়াল থেকে বলল। সফিক হেসে ফেলল। বড় মজার ছেলে তো!

রোকেয়া রাতে ঘুমান শাহানার সঙ্গে। তিনি, বাবলু ও শাহানা। শাহানার খাটটি ছোট। তিনজনে চাপাচাপি হয়। রোজ রাতেই রোকেয়া বলেন, তোমাকে তো মা বড় কষ্ট দিচ্ছি।

শাহানা লজ্জিত স্বরে বলে, কি যে আপনি বলেন মাঐমা, আপনাকে আমরা উল্টে কষ্ট দিচ্ছি। আমার কোনই কষ্ট হচ্ছে না—আপনি থাকায় কতরকম গল্পটল্প করতে পাচ্ছি।

এই কথাটা খুবই সত্যি। শাহানা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে গল্প করে। রোকেয়ার চোখ একেক সময় ঘুমে বন্ধ হয়ে আসে কিন্তু ঘুমুতে পারেন না, শাহানা ডেকে তুলে—মাঐমা, ঘুমাচ্ছেন নাকি?

ঃ নাগো মা, জেগেই আছি।

ঃ বীণার কথা কি আপনাকে বলেছি?

ঃ বীণা কে?

ঃ আমাদের বাড়িওয়ালা রশিদ সাহেবের মেয়ে। তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর ঘরের মেয়ে। প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন বিয়ের এক মাসের মধ্যে। খুব রূপসী ছিলেন। আমরা অবশ্যি দেখিনি, শুধু শুনেছি। মাঐমা, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

ঃ না।

ঃ তাহলে বীণার কাণ্ডটা শুনেন। কাউকে বলবেন না আবার।

ঃ না, বলব না।

ঃ আমার কি মনে হয় জানেন মাঐমা? আমার মনে হয়, আনিস ভাইয়ের সঙ্গে ওর কিছু একটা সম্পর্ক আছে।

ঃ আনিস ভাই কে?

ঃ আহা ঐদিন না বললাম আপনাকে, আমাদের চিলেকোঠায় থাকেন। ম্যাজিসিয়ান।

ঃ ও হ্যাঁ, বলেছ।

ঃ আপনার সঙ্গে দেখাও তো হয়েছে। ঐ যে হলুদ রঙের স্যুয়েটার পরা একটি ছেলে

এসে আপনাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

ঃ বুঝলেন মাঐমা, আমার মনে হয় আনিস ভাইয়ের প্রতি বীণার একটা ইয়ে আছে। কিভাবে বুঝলাম জানেন?

ঃ না, কিভাবে বুঝলে?

ঃ ব্যাপারটা খুবই গোপন। আমি হঠাৎ টের পেয়ে ফেলেছি। আপনি কাউকে বলবেন না।

ঃ না মা, আমি আর কাকে বলব?

শাহানা খাটে উঠে বসল। আশেপাশে কেউ নেই তবু সে গল্প করতে লাগল ফিস ফিস করে। রোকেয়া লক্ষ্য করেছেন, মেয়েটা প্রায়ই আনিস ছেলেটির প্রসঙ্গ নিয়ে আসছে। তার গল্পের এক পর্যায়ে ম্যাজিসিয়ান আনিসের কথা থাকবেই। প্রতি রাতেই ভাবেন, সকালবেলা নীলুকে জিজ্ঞেস করবেন— একটি মেয়ে, যার কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে হচ্ছে, সে রোজ রাতে অন্য একটি ছেলের গল্প এত আগ্রহ করে করবে কেন?

ঃ মাঐমা, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

ঃ না।

ঃ বীণা মেয়েটার ঘটনাটা কেমন লাগল?

তিনি কিছু বললেন না। হাই তুললেন।

ঃ মাঐমা, কাল আমি আনিস ভাইয়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।

ঃ আচ্ছা। এখন ঘুমাও মা, রাত অনেক হয়েছে।

ঃ আনিস ভাই, মাঐমাকে একটা ম্যাজিক দেখান তো। গোলাপেরটা না ওটা দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে।

আনিস খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্লেডের একটা খেলা দেখালো। এই খেলাটা শাহানাও এর আগে দেখেনি। হাত দিয়ে সে শূন্য থেকে একটার পর একটা চকচকে ব্লেড বের করতে লাগল। সেসব ব্লেড সে টপাটপ গিলে ফেলতে লাগল। রোকেয়া আঁৎকে উঠলেন, এ কি কাণ্ড। শাহানা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, সত্যি সত্যি খাচ্ছে না মাঐমা। ব্লেড কেউ খেতে পারে?

রোকেয়া ভেবে পেলেন না, যে ব্লেডগুলি মুখে পুরেছে, সেগুলি গেল কোথায়? সেই রহস্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেদ হল। আনিস গিলে ফেলা ব্লেডগুলি একটার পর একটা মুখ থেকে বের করে সামনের টেবিল প্রায় ভর্তি করে ফেলল। রোকেয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। করে কি করে এসব? চোখের ধান্ধা নাকি? এই বাচ্চা ছেলে তাঁর মত বুড়ো মানুষের চোখে ধান্ধা লাগাবে কিভাবে?

শাহানা রোকেয়ার বিস্মিত মুখভঙ্গি খুব উপভোগ করছে। যেন এই চমৎকার ম্যাজিকের কিছু কৃতিত্ব তার। এসব তো ভাল লক্ষণ নয়। নীলুর সঙ্গে কথা বলা দরকার। এত চমৎকার একটি মেয়ের জীবনে সামান্যতম সমস্যাও আসা উচিত নয়। তবে নীলু খুব চালাক মেয়ে। কিছু একটা হলে নিশ্চয়ই তার চোখে পড়বে। কিছু নয় হয় তো। কিন্তু এমন

মুগ্ধ চোখে মেয়েটি তাকিয়ে ছিল আনিসের দিকে, এই দৃষ্টি ভুল হবার কথা নয়।

আনিস ছেলেটিকে তাঁর বেশ লাগল। ভদ্র এবং লাজুক। এ রকম একটা লাজুক ছেলে ম্যাজিসিয়ান হবে কিভাবে? ম্যাজিক দেখানো কি লাজুক ছেলের কাজ? পড়াশোনা ছেড়ে তার ম্যাজিসিয়ান হবার এমন অদ্ভুত শখই বা কেন হল? মাথায় উপর বুদ্ধি দেয়ার কেউ নেই? বুদ্ধি দেয়ার কেউ থাকলে কি এরকম হয়? মা বাবা বেঁচে থাকলে এই ছেলে নিশ্চয়ই এসব নিয়ে মেতে উঠতে পারত না। রোকেয়ার বড় মায়া লাগল।

তিনি এক সপ্তাহ থাকবেন বলে এসেছিলেন, প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল। যেতে ইচ্ছে করছে না। জামাইয়ের বাড়িতে এত দীর্ঘদিন থাকাও যায় না, কিন্তু থাকতে তাঁর খারাপ লাগছে না– ভালই লাগছে। যার জন্যে আসা সেই নীলুর সঙ্গে কথা বলার তেমন কোন সুযোগ পাচ্ছেন না। অথচ নীলুর সঙ্গে তাঁর জরুরী কথা বলা দরকার। নীলু অফিস থেকে ফেরে ক্লান্ত হয়ে। ফিরেই সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠে। তাকে একা পাওয়াই মুশকিল, কারণ শাহানা তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকে। কথাগুলো শাহানার সামনেও নিশ্চয়ই বলা যায়, কিন্তু তাঁর বড় লজ্জা লাগে। কিন্তু না বলেই বা উপায় কি।

রাজশাহী ফিরে যাবার দু'দিন আগে তিনি নীলুকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে হাঁটতে গেলেন। নীলু বলল, কিছু বলতে চাও নাকি মা?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ টাকা-পয়সা দরকার?

ঃ না, সেসব কিছু না।

নিজের মেয়ের কাছেও তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েরা বোধ হয় পুরোপুরি নিজের মেয়ে থাকে না। এদের কাছে সহজ হওয়া যায় না।

ঃ চুপ করে আছ কেন মা, বল?

ঃ বাবলুকে তোর কাছে রাখবি? ওকে নিয়ে বড় কষ্টে পড়েছি।

নীলু চুপ করে রইল।

ঃ তারা ছেলেটাকে সহ্যই করতে পারে না। এইটুকু বাচ্চা অথচ.....

ঃ দুলাভাই কোন রকম খোঁজখবর করে না।

ঃ না।

ঃ দেখতেও আসে না?

ঃ গত মাসের আগের মাসে একবার ঘণ্টাখানিকের জন্যে এসেছিল।

ঃ ছেলেকে নিয়ে কি করবে না করবে কিছুই বলেনি?

ঃ না।

ঃ কেমন মানুষ বল তো মা?

দু'জন বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ছাদে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আনিসের ঘর থেকে ঝন ঝন শব্দ হচ্ছে, কোন ম্যাজিকের প্র্যাকটিস বোধ হয়।

রোকেয়া মৃদুস্বরে বললেন, বাবলু একটা কাঁচের জাগ ভেঙ্গে ফেলেছিল, সেই অপরাধের শাস্তি কি হয়েছিল শোন......

ঃ এসব শুনতে চাই না মা।

ঃ তুই জামাইকে বলে দেখ যদি রাখতে রাজি হয়। শান্তিতে মরতে পারি।

ঃ এখনই মরার কথা আসছে কেন?

ঃ বাঁচব না বেশী দিন।

ঃ বুঝলে কি করে?

ঃ এসব বোঝা যায়। তোর বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন।

নীলু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল—বাবলু কি পারবে তোমাকে ছেড়ে থাকতে?

ঃ পারবে। ও শক্ত ছেলে। তুই একটু বলে দেখ জামাইকে। নাকি আমি বলব?

ঃ তোমার বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব।

ঃ রাজি হতে চাইবে না। হয়ত সে চায় একটা বাড়তি ঝামেলা কাঁধে নিতে?

নীলু জবাব দিল না। রোকেয়া বললেন, তুই চাকরি করিস এটা বোধ হয় তোর শাশুড়ী পছন্দ করে না।

নীলু সে কথারও কোন জবাব দিল না। সে বাবলুর ব্যাপারটি কি করে বলবে তাই ভাবছিল। রোকেয়া বললেন, চল নিচে যাই। তোর শাশুড়ী বোধ হয় খুঁজছেন।

ঃ তুমি যাও মা। আমি থাকি এখানে কিছুক্ষণ, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

রোকেয়া নিচে নেমে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরই চায়ের কাপ হাতে শাহানা তাকে খুঁজতে এল। সে অবাক হয়ে দেখল নীলু কাঁদছে।

ঃ কি হয়েছে ভাবী?

ঃ কিছু হয়নি।

ঃ তোমার জন্যে চা এনেছি।

ঃ চা খাব-না শাহানা।

ঃ একটু খাও ভাবী, আমি নিজে বানিয়েছি।

বলতে বলতে সেও কেঁদে ফেলল। কাউকে কাঁদতে দেখলেই তার কান্না পেয়ে যায়। নীলু অবাক হয়ে বলল, তোমার আবার কি হল?

শাহানা ফোঁপাতে লাগল। কিছু বলল না।

বাবলুকে রেখে রোকেয়া রাজশাহী চলে গেলেন। মনে করা হয়েছিল বাবলু খুব কান্নাকাটি করবে, সে তেমন কিছুই করল না। রোকেয়া যখন বললেন, যাই বাবলু?

বাবলু ঘাড় কাত করল। যেন যাবার অনুমতি দিচ্ছে।

ঃ কাঁদবে না তো?

বাবলু মাথা নাড়ল। সে কাঁদবে না।

রহমান সাহেব দীর্ঘদিন পর উত্তেজনা অনুভব করছেন।

মেয়ের বিয়েতে তিনি বড় রকমের একটা হৈ-চৈ করতে চান। সব ধরণের সামাজিকতা, উৎসব অনুষ্ঠান তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করতেন, এখনো করেন। কিন্তু শারমিনের বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা মনে হলেই মনে হয় ঢাকা শহরের সবাইকে আনন্দ অনুষ্ঠানে ডাকা যায় না?

রাত জেগে আত্মীয়-স্বজনদের লিস্টি তৈরী করেছেন। কেউ বাদ থাকবে না, সবাই আসবে। দাওয়াতের চিঠি নিয়ে লোক যাচ্ছে। প্রতিটি দাওয়াতের চিঠির সঙ্গে ঢাকায় আসা- যাওয়ার খরচ দেয়া হচ্ছে।

তাঁর নিজেব বাড়িটি প্রকাণ্ড, তবু তিনি আরেকটি দোতলা বাড়ি ভাড়া করেছেন। বিয়ের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা একটা বড় হোটেলে সারবার জন্যে সবাই বলছিল। এতে খরচ বেশী হলেও ঝামেলা কম হবে। তিনি রাজি হননি। তাঁর ঝামেলা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। বাবুর্চিরা বিশাল ডেগচিতে পাক বসাবে। সকাল থেকেই ঘিয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে । হৈ চৈ ছুটাছুটি হবে- তবেই না আনন্দ।

এইটিই তো জীবনের শেষ ঝামেলা। আবার একদিন শাবমিনের বাচ্চার বিয়ের সময় ঝামেলা হবে। সেই ঝামেলায় তিনি অংশ নিতে পাববেন এমন মনে হয় না। মানুষ নিজের মৃত্যুর ব্যাপারটি আগে আগে টেব পায়।

রাত ন'টা বাজে। প্রচণ্ড গবম পড়েছে। রহমান সাহেব শারমিনের ঘরেব দিকে রওনা হলেন। শারমিনকে নিয়ে বারান্দায় বসবেন। বারান্দায় বেশ হাওয়া।

শারমিনকে কেমন যেন রোগা রোগা লাগছে। চোখের নিচে কালি। ওর কি ভাল ঘুম হচ্ছে না? অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিয়েব আগে আগে নানান ধরণের দুশ্চিন্তা মানুষকে কাবু করে ফেলে। শারমিনকেও নিশ্চযই করছে। এবং ওকে সাহস ও আশ্বাস দেবার কেউ নেই।

ঃ শরীরটা ভাল আছে তো মা?

ঃ ভাল আছে।

ঃ ঘুম হচ্ছে না ভাল? মুখটা কেমন শুকনো লাগছে?

শারমিন মৃদু স্বরে বলল, যা গরম।

ঃ দোতলার ঘরটার এয়ারকুলার চালু করে ঘুমালেই পার।

ঃ না, ঐখানে আমার কেমন দম-বন্ধ লাগে।

ঃ চা খাওয়া যাক, কি বল শারমিন?

ঃ গরমের মধ্যে আমি চা খাব না।

ঃ গরমের মধ্যেই চা ভাল। বিষে বিষক্ষয় হয়। যাও চায়ের কথা বলে আস। তুমি চা না চাইলে ঠাণ্ডা কিছু নাও। এসো কিছুক্ষণ গল্প করি। নাকি আমার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগবে না?

ঃ ভাল লাগবে না কেন?

ঃ কেমন গম্ভীর মুখে বসে আছ, তাই বলছি।

শারমিন হাসল।

ঃ তোমার কটা কার্ড লাগবে তা তো বললে না?

ঃ আমার কোন কার্ড লাগবে না বাবা।

ঃ কেন, লাগবে না কেন?

ঃ আমার কাউকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করছে না।

রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কেন করছে না?

ঃ জানি না কেন করছে না।

ঃ আমার মনে হয়, তুমি সাময়িকভাবে একটা ডিপ্রেসনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবে?

ঃ না না, আমার কি কোন অসুখ করেছে নাকি যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব?

ঃ তাও ঠিক।

ঃ রহমান সাহেব হাসলেন। শারমিনও হাসল।

ঃ শারমিন, সাব্বির কি ছ' তারিখে আসছে?

ঃ ছ' তারিখে কিংবা আট তারিখে।

ঃ তুমি কিন্তু এয়ারপোর্টে যাবে।

ঃ ঠিক আছে যাব।

ঃ তুমি কিন্তু মা এখনো আমার চায়ের কথা বলনি। তুমি কি কোন ব্যাপারে আপসেট?

ঃ না, আপসেট না।

সে আপসেট না, এই কথাটা ঠিক নয়। শারমিন এক অদ্ভুত সংশয়ে ভুগছে। যার উৎস সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। উৎসবের ছোঁয়া চারদিকে, কিন্তু এই উৎসব তাকে স্পর্শ করছে না। বাবা প্রতি রাতে বিয়ের নানান ব্যাপারে কত আগ্রহ নিয়ে গল্প করছেন, তাতেও মন লাগছে না। কেন লাগছে না? সাব্বিরকে কি সে পছন্দ করছে না? তাও তো সত্যি নয়।

মানুষ হিসেবে তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। যতটুকু দেখেছে তার ভালই লেগেছে। সাব্বিরের ভেতর এক ধরণের দৃঢ়তা আছে, যা ভাল লাগে। সব মেয়েই বোধহয় তার পাশে একজন শক্ত সবল মানুষ চায় যার উপর নির্ভর করা চলে।

সে রাতদিন বইপত্র নিয়ে থাকে, এখানে কি শারমিনের আপত্তি? তাও তো নয়, পড়াশোনা সে নিজেও পছন্দ করে। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তো সে বই পড়েই কাটিয়েছে। তাহলে আপত্তিটা কোথায়?

শারমিন নিজেই চা বানাল। বাবার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করে, ইদানিং করা হচ্ছে না। বিয়ের পর আরো হবে না। এই মানুষটি পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন। সাবাদিন নিজের কাজ দেখে ফিরে আসবেন জনমানবহীন বিশাল একটি বাড়িতে। হয়ত আবার কুকুর পুষবেন। দিনকয়েক আগেই সরাইলের দুটি কুকুর আনা হয়েছে। কিন্তু পছন্দ না হওয়ায় ফেরত পাঠিয়েছেন। এ রকম হতেই থাকবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে কুকুর আসবে, এদের পছন্দ হবে না— আবার সেগুলি ফেরত যাবে।

বাবার জীবনের শেষ অংশ কেমন হবে? এদেশের অসম্ভব বিত্তশালী একজন মানুষ মারা যাবেন একা একা? আসলেই কি বিপুল বৈভবের তেমন কোন দরকার আছে?

ঃ আফা।

শারমিন চমকে তাকাল। জয়নাল কখন যে নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঃ কি ব্যাপার জয়নাল?

ঃ আপনের কাছে যে আসে, একজন দাড়িওয়ালা মানুষ, রফিক সাব?

ঃ হ্যাঁ, কেন?

ঃ হেইন আইজ সইন্ধ্যায় আসছিলেন।

ঃ আমাকে আগে বলনি কেন?

ঃ মনে আছিল না আফা।

ঃ ডাকলে না কেন আমাকে?

ঃ ডাকতে গেছিলাম, জামিলার মা কইল আপনার মাথা ধরছে। দরজা বন্ধ কইরা ঘুমাইতাছেন।

ঃ ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যাও।

জয়নাল গেল না। মাথা নিচু করে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

ঃ কিছু বলবে জয়নাল?

ঃ জ্বি।

ঃ বল।

জয়নাল একটা অদ্ভুত কথা বলল। সে নাকি তার ঘরে ঘুমুতে পারে না। জেগে কাটাতে হয়। কারণ সে প্রায়ই দেখে তার ঘরে মার্টি সাহেব হাঁটছে কিংবা পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘর অন্ধকার থাকলেও দেখা যায়। বাতি জ্বাললে দেখা যায় না। শারমিনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বলে কি এ!

ঃ রোজ দেখ?

ঃ রোজ দেখতাম আগে। এখন সারারাত ঘরে বাতি জ্বলে। আমারে অন্য একটা ঘরে থাকতে দেন আফা।

ঃ বেশ তো, থাক অন্য ঘরে। ঘরের তো অভাব নেই।

জয়নাল বেরিয়ে যেতেই শারমিনের মনে হল, সে মিথ্যা কথা বলেছে। উদ্দেশ্যও পরিষ্কার, একটা ভাল ঘর সে দখল করবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে একটি চমৎকার গল্প সে ব্যবহার করছে। আমার সবাই কি সে রকম করি না?

চা নিয়ে বারান্দায় যাওয়া মাত্রই রহমান সাহেব বললেন, তোমাকে একটা বড় খবর দেয়া হয়নি।

ঃ কি খবর?

ঃ এখন না, সে খবরটা বিয়ের পর- পরই দেব।

ঃ শুধু শুধু তাহলে আমার মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে দিলে কেন?

ঃ ইচ্ছা করেই দিলাম।

রহমান সাহেব ছেলেমানুষের মত হাসতে লাগলেন। যেন বুদ্ধি করে শারমিনের ভেতর কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরে তিনি খুব বেশী। কিন্তু শারমিন তেমন কোন কৌতূহল অনুভব করল না। তার ঘুম পেতে লাগল।

ঃ আমি যাই বাবা, ঘুম পাচ্ছে।

ঃ আর একটু বস মা। রাত বেশী হয়নি।

শারমিন বসল। রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, আমার সব কর্মচারী তোমার বিয়ে উপলক্ষে একটা বোনাস পাচ্ছে, তুমি জান?

ঃ জানি। ম্যানেজার সাহেব আমাকে বলেছেন।

ঃ আইডিয়াটা তোমার কেমন লাগল মা?

ঃ ভালই। প্রাচীন কালের রাজা-মহারাজাদের মত মনে হচ্ছে। তাঁরাও তো নিজের পুত্র-কন্যাদের বিয়ে উপলক্ষে সবাইকে খেলাত-টেলাত দিতেন।

রহমান সাহেব উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। শারমিনের কথাগুলি তাঁর বড় ভাল লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত কন্যা ও পিতা বসে রইল মুখোমুখি।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। অনেক দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়। রহমান সাহেব বললেন, যাও মা– শুয়ে পড়।

শারমিন নড়ল না। যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল।

সাব্বির এল আট তারিখে। আগেরবার এয়ারপোর্টে তাকে রিসিভ করবার জন্যে কেউ ছিল না, এবার অনেকেই এসেছে। সাব্বিরের মা অসুস্থ, তিনিও এসেছেন। এত লোকজনের মাঝখানে বিশাল একটা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে শারমিনের অস্বস্তি লাগছিল। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা এসব পলিটিশিয়ানদের মানায়, অন্য কাউকে মানায় না। তাছাড়া তোড়া জিনিসটাই বাজে। একগাদা ফুলকে জরির ফিতায় বেঁধে রাখা অসহ্য। এরচে একটি দুটি গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভাল। কোন একটি ছবিতে এমন একটি দৃশ্য শারমিন দেখেছিল। রেলস্টেশনে একগাদা গোলাপ নিয়ে একটি মেয়ে, তার প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছে, তার চোখে মুখে গম্ভীর উৎকণ্ঠা, যদি সে না আসে। কত মানুষ নামল কত মানুষ উঠল, কিন্তু ছেলেটির দেখা নেই। মেয়েটি প্ল্যাটফরমের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করছে। হাত থেকে একটি একটি করে ফুল পড়ে যাচ্ছে, মেয়েটির সেদিকে খেয়াল নেই। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ছেলেটিকে। মেয়েটি সব ফুল ছুঁড়ে ফেলে জড়িয়ে ধরল তাকে। চমৎকার ছবি।

ঃ কেমন আছ শারমিন?

ঃ ভাল। আপনি কেমন?

ঃ খুব ভাল।

ঃ এই নিন আপনার ফুল।

ঃ থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর দি ফ্লাওয়ার্স।

সাব্বিরের গায়ে ধবধবে সাদা একটা শার্ট। গাঢ় নীল রঙের একটা টাই। দীর্ঘ ভ্রমণজনিত ক্লান্তির কোন ছাপ নেই তার চেহারায়। কি চমৎকার লাগছে তাকে দেখতে। শারমিন ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল।

সাব্বির বলল, আমার সঙ্গে চল শারমিন। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

ঃ উঁহু, এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।

ঃ কেন?

ঃ লজ্জা লাগবে।

সাব্বির এয়ারপোর্টের সকলকে সচকিত করে হেসে উঠল। এবং অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে শারমিনের হাত ধরল। দৃশ্যটি এতটুকুও বেমানান মনে হল না, যেন এটাই স্বাভাবিক। সাব্বিরের মা একটু পেছনের দিকে সরে গেলেন। কলেজ-টলেজে পড়া কয়েকটি মেয়ে আছে তার সঙ্গে। তারা মুখ নিচু করে হাসতে লাগল। শারমিনের লজ্জা লাগতে লাগল।

সাব্বির খুশী খুশী গলায় বলল, তোমার বাবা এটা কি শুরু করেছেন বল তো?

ঃ কি করেছেন?

ঃ বিশাল এক বাড়ি ভাড়া করেছেন মার জন্যে। তিন মাসের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনরা আসবে— মার চিঠিতে জানলাম সে বাড়ি নাকি রাজপ্রাসাদের মত। ড্রইংরুমটায় নাকি কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।

সাব্বির হৃষ্টচিত্তে হাসতে লাগল। শারমিন কিছু বলল না। সাব্বিরের মা'র জন্যে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে এই তথ্যটা সে জানত না। বাবা এ বিষয়ে তাকে কিছু বলেনি। শারমিন বলল, আমি কিন্তু এখন সত্যি সত্যি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

ঃ পরে না, এখনই হবে। তুমি এখন আমার সঙ্গে যাবে। প্লেনে আজ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে, ওটা শুনবে।

সাব্বিরের মা বললেন, চল মা আমাদের সঙ্গে। লজ্জার কিছু নেই। আর সাব্বির, তুই এমন হাত ধরে টানাটানি করছিস কেন? হাত ছেড়ে দে।

শারমিনের বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ি রং করার লোকজন এসেছিল, এরা বিদায় নিচ্ছে। কিছু অপরিচিতা মহিলাকেও দেখা যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করেছেন বোধহয়। তাঁরা দূর থেকে কৌতূহলী হয়ে শারমিনকে দেখছে। কাছে এগিয়ে আসছেন না। শারমিন হাত- ইশারা করে জয়নালকে ডাকল।

ঃ জয়নাল, কেউ কি এসেছিল আমার কাছে?

ঃ জ্বি না, আফা।

ঃ রফিক সাহেব?

ঃ জ্বি না, আসেন নাই।

ঃ ঠিক আছে, তুমি যাও। ভাল কথা, ঘর বদল করেছ?

ঃ জ্বি করছি।

ঃ এখন আর নিশ্চয়ই মার্টি সাহেবকে দেখ না?

জয়নাল মৃদু স্বরে বলল, জ্বি দেখি। কাইল রাইতেও দেখছি।

শারমিন কিছু বলল না। অশরীরী মার্টি শুধু জয়নালকে দেখা দেবে কেন? সে যাবে তার প্রিয়জনদের কাছে, আসবে তার কাছে। কিন্তু আসছে না, কেন আসছে না? শারমিন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। দুটি বাচ্চা ছেলে নামছিল, এরা শারমিনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

ঃ তোমরা কারা?

ছেলে দুটি জবাব দিল না। নিজেদের মধ্যে মুখ, চাওয়াচাওয়ি করল। বিয়ে উপলক্ষে এসেছে নিশ্চয়ই। ছেলে দু'টি ভয় পেয়েছে। সম্ভবত তাদের বলা হয়েছিল, দোতলায় উঠা যাবে না। এত আগে সবাই আসতে শুরু করল কেন?

ঃ কি নাম তোমাদের?

তারা উত্তর না দিয়ে ছুটে নেমে গেল।

শারমিনের ঘর তালাবন্ধ। আকবরের মা তালা খুলতে খুলতে বলল, বাড়ি ভরতি হইয়া গেছে মাইনষে। এইটা ধরে ওইটা ছোঁয়। কিছু কইলে ফুঁস কইরা উঠে— আমি অমুক আত্মীয়, তমুক আত্মীয়।

শারমিন বলল, আমার ঘরের সামনে কাউকে বসিয়ে রাখ, যাতে কেউ ঢুকতে না পারে।

ঃ জ্বি আইচ্ছা।

শারমিন হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই জয়নাল এসে খবর দিল, রফিক সাহেব এসেছেন।

রফিক হাসিমুখে বলল, বিয়ের দাওয়াত নিতে এলাম। তুমি তো দাওয়াত দিলে না, বাধ্য হয়েই নিজে থেকে আসা। এর আগেও একদিন এসেছিলাম।

ঃ খবর পেয়েছি।

ঃ এখন বল, বিয়ের দাওয়াত দিচ্ছ না?

ঃ দিচ্ছি। বাসার সবাইকে নিয়ে আসবে। কাউকে বাদ দেবে না। তোমার চাকরিবাকরি এখনো কিছু হয়নি, তাই না?

ঃ বুঝলে কি করে?

ঃ থট রিডিং। তুমি কিছু খাবে?

ঃ ঘরে তৈরী সন্দেশ ছাড়া যে কোন জিনিস খাব। অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাকট, দুপুরে আমাব খাওয়া হয়নি।

ঃ কেন?

ঃ কেন হয়নি ,সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। খাওয়া হয়নি সেটাই ইম্পর্টেন্ট।

শারমিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আচ্ছা রফিক, আমি যদি তোমার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেই, তুমি করবে?

ঃ কি রকম চাকরি?

ঃ ভাল চাকরি। বেশ ভাল। মাসে তিন-চার হাজার টাকার মত পাওয়া যায় এরকম কিছু।

রফিক পাঞ্জাবির পকেট থেকে তার সিগারেটের প্যাকেট বের করল। অনেকখানি সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, না, করব না।

ঃ কেন?

ঃ তোমার কাছ থেকে সুবিধা নেব, এজন্যে আমি কখনো তোমার কাছে আসিনি।

ঃ কি জন্যে এসেছ?

ঃ কি জন্যে এসেছি তা তুমি নিশ্চয়ই জান, জান না?

শারমিন শুকনো মুখে হাসল। রফিক বলল আজ বেশীক্ষণ থাকব না, কাজ আছে।

ঃ কি কাজ?

ঃ বেকার মানুষেরই কাজ থাকে বেশী। তোমাদের ধারণা, বেকাররা রাতদিন সিগারেট খায় এবং চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়, এ ধারণা ঠিক না।

ঃ বেকার সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আমি আগে কখনো বেকার দেখিনি। তোমাকেই শুধু দেখলাম।

ঃ কেমন লাগল আমাকে?

শারমিন জবাব দিল না। কিছু প্রশ্ন আছে যার কোন জবাব দেয়া সম্ভব হয় না।

খবরের কাগজে তিন লাইনের একটা বিজ্ঞাপন উঠেছে। হোসেন সাহেব খুবই অবাক হলেন যে এটা কারো চোখে পড়ল না। লোকজন কি আজকাল বিজ্ঞাপন পড়ে না নাকি? তাঁর ধারণা ছিল মেয়েরা বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু ধারণাটা সত্যি নয়। নীলু, শাহানা, মনোয়ারারা এরা কেউ এই প্রসঙ্গে কিছু বলল না। মনোয়ারার চোখে না পড়া ভাল। তিনি চান না মনোয়ারা দেখুক, কিন্তু অন্য দুজনে কেন দেখবে না?
বিজ্ঞাপনটা এ রকম—

শেষ চিকিৎসা
দুরারোগ্য পুরানো অসুখের হোমিওপ্যাথি মতে
চিকিৎসা করা হয়। যোগাযোগ করুন।
এম হোসেন
১৩/৩ কল্যাণপুর
ঢাকা।

একমাসের টাকা দেয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে দুবার করে এই বিজ্ঞাপন ছাপা হবে, কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয় না বিজ্ঞাপনে কোন লাভ হবে। কেউ তো পড়ছেই না।

হোসেন সাহেব খবরের কাগজ হাতে রান্নাঘরে ঢুকলেন। নীলু রান্না চড়িয়েছে। শ্বশুরকে দেখে সে বলল, কিছু বলবেন নাকি বাবা?

ঃ না, তেমন কিছু না। আজকের খবরের কাগজটা কি পড়েছ?

নীলু অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ, কেন?

ঃ একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে, চোখে পড়ে নাই?

তিনি খবরের কাগজ মেলে ধরলেন।

ঃ ভাবলাম একটা বিদ্যা যখন শিখলাম কষ্ট করে, তখন কাজে লাগানো যাক। কি বল?

ঃ তা তো ঠিকই।

ঃ এটাও এক ধরণের সমাজসেবা, কি বল মা?

ঃ তা তো নিশ্চয়ই।

ঃ গরীব– দুঃখীদের কাছ থেকে পয়সা নেব না ঠিক করেছি। তবে অন্যদের কাছ থেকে নেয়া হবে। বাসায় এলে দশ টাকা, আর কল দিয়ে নিয়ে গেলে-কুড়ি টাকা। বেশী হয়ে গেল নাকি?

ঃ না, বেশী হয়নি, ঠিকই আছে।

হোসেন সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন—বাড়ির সামনে একটা সাইনবোর্ড দিতে হবে। "ডাঃ এম হোসেন, হোমিও" কি বল মা? লোকজন বিজ্ঞাপন দেখে আসবে, বাসা খুঁজে বের করতে হবে তো ?

ঃ সাইনবোর্ড তো দিতেই হবে। আপনি রফিককে বলে দিন, ও সাইনবোর্ড করিযে নিয়ে আসবে।

ঃ হ্যাঁ বলব। ইয়ে আরেকটা কথা মা।

ঃ বলুন।

ঃ তোমার শাশুড়ীকে কিছু না বলাই ভাল। মানে কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই রেগে যায় তো, সে জন্যেই বলছি।

ঃ না বাবা, আমি কিছু বলব না।

নীলুর কথার মাঝখানেই মনোয়াবা ঢুকলেন। হোসেন সাহেবকে দেখেই রেগে উঠলেন।

ঃ রান্নাঘরে ঘুরঘুর করছ কেন? পুরুষমানুষদেব বান্নাঘবে ঘুবঘুর করা আমার পছন্দ না। যাও টুনীদের বই নিয়ে বসাও।

অন্যদিন হলে তিনি কিছু বলতেন। রান্নাঘরে পুরুষমানুষদের থাকা উচিত,না উচিত, এই নিয়ে মোটামুটি ভাবে একটা তর্ক বাধিয়ে বসতেন। আজ কিছুই বললেন না। টুনী এবং বাবলুকে নিয়ে পড়াতে বসলেন।

মনোয়ারা দীর্ঘ নঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার শ্বশুবের কাণ্ডকারখানায লজ্জায় মুখ দেখানো দায়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে দেখেছ? এম. হোসেন দেখেই সন্দেহ হযেছিল, ঠিকানা দেখে বুঝলাম। তোমাকে বিজ্ঞাপনের কথাই বলছিল বোধ হয়?

ঃ জ্বি।

ঃ লোকটা যে বোকা তাও না, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে। সে এক মহা ডাক্তার হয়ে গেছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। চিন্তা কর অবস্থা!

নীলু মৃদু স্বরে বলল, কিছু বলার দরকার নেই মা।

ঃ না বললে তো আশকারা দেয়া হবে। এ সব জিনিসে আশকারা দিতে নেই।

টুনী এবং বাবলু পড়তে বসেছে। এদের পড়ানোর কাজটা হোসেন সাহেব নিজেই আগ্রহ করে নিয়েছেন। পড়াশোনা চলছে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। প্রতিদিন একটি করে

অক্ষর নানান ভাবে শেখানো হচ্ছে। হোসেন সাহেব হিসাব করে দেখেছেন এগারোটি স্বরবর্ণ শিখতে লাগবে এগারো দিন এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শিখতে লাগবে আটত্রিশ দিন। মোট এক মাস উনিশ দিনে প্রতিটি বর্ণ তারা পড়তে এবং লিখতে শিখবে।

আজ শেখানো হচ্ছে 'গ'। হোসেন সাহেব প্রকাণ্ড একটা গ লিখে দেয়ালে ঝুলিয়েছেন। গ দিয়ে দুলাইনের একটি ছড়া তৈরী করা হয়েছে। টুনী এবং বাবলু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়াটি পড়ছে—

গ তে হয় গরু
তার পা দু'টি সরু।।
গরুর শিং বাঁকা
গরু যায় ঢাকা।

বাবলু এমনিতে কথাবার্তা একেবারেই বলে না, কিন্তু ছড়া বলাতে তার একটা আগ্রহ আছে। সে টুনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর করে ছড়া পড়ছে।

হোসেন সাহেব বললেন, এইবার লেখ। প্রথমে একটা গরুর ছবি আঁক– শিংওয়ালা গরু যে ঢাকার দিকে যাচ্ছে এবং গরুর পাশে আঁক একটা গ। তারপর তোমাদের ছুটি।

টুনী বলল, না দাদু, ছুটি না, তুমি গল্প বলবে।

ঃ আজ আর গল্প না।

ঃ উহুঁ। বলতে হবে। শীত-বসন্তের গল্প বলতে হবে।

ঃ না, আজ আর কোন গল্প-টল্প হবে না।

ঃ বলতেই হবে, বলতেই হবে।

গল্প বলায় হোসেন সাহেবের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। গল্প বলতে না চাওয়া হচ্ছে তাঁর দাম বাড়াবার একটা কৌশল। রোজই বেশ খানিকক্ষণ না-না করেন এবং শেষ পর্যন্ত লম্বা-চওড়া একটা গল্প শুরু করেন যেটা শেষ হতে দীর্ঘ সময় নেয়। এক সময় টুনী এবং বাবলু দু'জনের চোখই ঘুমে জড়িয়ে আসে তবু তারা জেগে থাকে।

বাবলু এ বাড়িতে মোটামুটি ভাবে সুখেই আছে বলা চলে। কোন এক বিচিত্র কারণে সফিক বাবলুকে খুবই পছন্দ করে। সে যে আগ্রহ বাবলুর ব্যাপারে দেখায়, টুনীর ব্যাপারে তা দেখায় না। এটা নীলুকে বেশ পীড়িত করে। এর মধ্যে রহস্য আছে কিনা কে জানে।

অফিস থেকে ফিরেই সফিক ডাকবে, বাবলু সাহেব কোথায়?

বাবলু যেখানেই থাকুক, গলার স্বর শুনে ছুটে আসবে উল্কার বেগে।

ঃ তারপর বাবলু সাহেব, কেমন আছেন?

ঃ ভাল।

ঃ সারাদিন কি কি করলেন?

ঃ (একগাল হাসি)

ঃ কি, কিছুই করা হয়নি?

ঃ (না বোধক মাথা নাড়া)

সফিক অফিসের কাপড় ছাড়বে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে পাশে। সফিক বাথরুমে যাবে

হাতমুখ ধুতে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার পাশে। সফিক অফিস-ফেরত চা বারান্দায় বসে খাবে, সেও থাকবে বারান্দায়।

নীলু অনেকবার ধমক দিয়েছে, কি'সব সময় বড়দের সঙ্গে ঘুরঘুর করা? যাও খেলতে যাও।

সফিক প্রশ্রয়ের সুরে বলেছে—আহা থাক না। বিরক্ত করছে না তো।

ছুটির দিনগুলিতে সফিক দুপুরবেলা শুয়ে থাকে। বাবলু ঠিক তখন সফিকের পাশে বসে থাকে এবং একটা হাত তুলে দেয় সফিকের গায়ে। এতটা বাড়াবাড়ি নীলুর ভাল লাগে না। কোন কিছুর বাড়াবাড়িই ভাল না।

নীলু প্রায়ই ভাবে এই প্রসঙ্গে সফিককে সরাসরি একদিন কিছু বলবে। বলা হয়ে উঠছে না। সফিক আজকাল আগের চেয়েও গম্ভীর। অফিসের ঝামেলা নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। অফিস সম্পর্কে সফিক কখনো কিছু বলে না, কাজেই আসলে কি হচ্ছে জানার উপায় নেই। অবশ্যি সে এখন ঘরে ফিরছে সকাল সকাল। টঙ্গী যাচ্ছে না। নীলুর ধারণা ছিল টঙ্গীর কাজ শেষ হয়ে গেছে বলেই যেতে হচ্ছে না। সে ধারণাও ঠিক না। টঙ্গীর কাজ শেষ হয়নি। দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অন্য একজনকে। কেন কে জানে?

সফিক অফিসে ঢুকেই জানল খাস বিলেতী বড়কর্তা আজ অফিসে আসবেন। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় এসে ঢাকা পৌঁছেছেন। তাঁর নাম মিঃ টলম্যান। এই জাতীয় নাম বিলেতীদের পক্ষেই সম্ভব। বাঙ্গালী মুসলমান কত বৎসর পর তার ছেলের নাম রাখবে লম্বা আহমেদ? বা আদৌ এ রকম নাম রাখার মত সাহস কি তাদের হবে?

সফিক অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, নতুন বড় সাহেবের আচার-আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক গবেষণা হয়ে গেছে। এবং জানা গেছে ইনি দারুণ কড়া লোক। অসম্ভব রাগী এবং অসম্ভব কাজের। মালয়েশিয়ার কোম্পানী যখন লাটে ওঠার মত হল তখন টলম্যানকে পাঠানো হল। এক মাসের মধ্যে সে সব ঠিকঠাক করে ফেলল।

বিলেতী সাহেব একজন আসবেন জানা ছিল, গতকালই তিনি এসে পৌঁছেছেন এটা সফিকের জানা ছিল না। সিদ্দিক সাহেব জানতেন, তিনি খবরটা অন্য কাউকে জানাননি। নিজেই গিয়েছেন এয়ারপোর্টে। সাহেবকে এনে প্রথম রাতে নিজের বাসায় ডিনার খাইয়েছেন। সিদ্দিক সাহেবের এই ধরনের লুকোচুরির কারণ সফিকের কাছে স্পষ্ট হল না। কানভাঙ্গানির কিছু কি আছে তাঁর মনে? সিদ্দিক সাহেব বুদ্ধিমান লোক। একজন বুদ্ধিমান লোক এ ধরনের বোকামি করবে না। সিদ্দিক সাহেব এতটা কাঁচা কাজ করবেন এটা ভাবা যায় না।

সিদ্দিক সাহেব খবর নিয়ে এলেন মিঃ টলম্যান সাড়ে এগারোটার সময় আসবেন। বারটা থেকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করবেন। কারখানা দেখতে যাবেন তিনটায়। সাড়ে চারটায় যাবেন জয়দেবপুর। সিদ্দিক সাহেবকে অত্যন্ত উল্লসিত মনে হল। সফিককে হাসতে বললেন, জাত বৃটিশ তো, একেবারে বাঘের বাচ্চা।

সফিক ঠাণ্ডা গলায় বলল, হালুম হালুম করছিলো নাকি?

: না, এখনো করেনি। তবে করবে। মালয়েশিয়াতে কি কাণ্ডটা করেছে জানেন তো?

চারজনকে স্যাক করেছে জয়েন করবার প্রথম সপ্তাহে। ইউনিয়ন গাঁইগুঁই করছিল, ইউনিয়নের চাঁইদের ডেকে নিয়ে বলেছে—যদি কোন রকম গোলমাল হয়, কোম্পানী বন্ধ করে দিয়ে সে চলে যাবে। তাকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যে কোম্পানী লস খাচ্ছে, তাকে পোষার কোন মনে হয় না।

ঃ কোন রকম ঝামেলা হয়নি?

ঃ এ্যাবসলিউটলি নাথিং।

ঃ এখানেও কি এরকম কিছু হবে বলে মনে করেন?

ঃ হতে পারে। আমি জানি না।

ঃ জানবেন না কেন? তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার কথাবার্তা হয়েছে। এয়ারপোর্ট থেকে আনলেন, ডিনার খাওয়ালেন।

ঃ আপনি কি অন্য কিছু ইঙ্গিত করছেন?

ঃ না, আমি অন্য কিছুই ইঙ্গিত করছি না। টলম্যানের আসার খবর আপনি চেপে গেছেন এটাই আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়েছে।

ঃ এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই।

ঃ না থাকলেই ভাল।

অফিসের সবাই ভেবেছিল নাম যখন টলম্যান তখন নিশ্চয়ই বেঁটেখাট মানুষ হবে। কিন্তু দেখা গেল তালগাছের মতই, স্বভাব-চরিত্রেও ভয় পাওযার মত কিছু নেই। শান্ত। কথাবার্তা বলে নিচু গলায়। মিনিটে মিনিটে রসিকতা করে। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসে প্রাণখুলে।

অফিসারদের সঙ্গে মিটিংটি চমৎকার ভাবে শেষ হল। টলম্যান বললেন, তিনি মনে করেন এখানে চমৎকার স্টাফ আছে যারা ইচ্ছা করলেই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথম শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। তিনি এসেছেন এই ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে এর বেশী কিছু নয়। যারা যারা সিগারেট খায়, তিনি তাদের সবাইকে নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেট দিলেন এবং হরতাল ও স্ট্রাইক প্রসঙ্গে বিলেতি একটি গল্প বলে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। গল্পটি এ রকম, লেবার পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একবার ঠিক করলেন কিছু দাবী-দাওয়া নিয়ে একদিনের জন্যে স্ট্রাইক করবেন। ইতিহাসে এরকম ব্যাপার আর হয় নি। সবার ধারণা শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক হবে না। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা, চিঠি লেখা-লেখি।

শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক হল। অদ্ভুত ধরনের স্ট্রাইক। প্রফেসররা ঠিকই ক্লাস নিলেন, কাজ কর্ম করলেন- শুধু সেই দিনটির বেতন নিলেন না।

গল্প শেষ করে টলম্যান বললেন, এ ধরনের স্ট্রাইক তোমাদের দেশে চালু করতে পারলে বেশ হত, তাই না?

মিটিং শেষ করে নিজের ঘরে ফেরার পনেরো মিনিটের মধ্যে সফিক টলম্যানের কাছ থেকে যে চিঠিটি পেল তার সারমর্ম হচ্ছে "তুমি দায়িত্বে থাকাকালীন এ অফিসে নিম্ন-লিখিত অনিয়মগুলি হয়েছে। আমি মনে করি এ দায়িত্ব বহুলাংশে তোমার। এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি প্রতিটি অভিযোগ প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য লিখিত ভাবে জানাবে।"

তিনটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পরের পৃষ্ঠায় আছে। বেশ খুঁটিয়ে লেখা।

দুপুর দু'টোর দিকে সিদ্দিক সাহেব এসে বললেন, সফিক সাহেব, আপনার চিঠির প্রসঙ্গে আমি কিছুই জানি না, আপনি বিশ্বাস করেন। এত ছোট মন আমার না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। এই টলম্যান ব্যাটার সঙ্গে আপনার ব্যাপারে আমার কোন কথা হয়নি।

সফিক শান্ত স্বরে বলল, আপনার কথা বিশ্বাস করছি। কাগজপত্র সাহেব হেড অফিস থেকেই তৈবী করে এনেছে।

ঃ আমি টলম্যানকে আপনার কথা গুছিয়ে বলব।

ঃ না, কিছু বলার দরকাব নেই।

সফিক অসময়ে বাড়ি ফিরে এল।

কবিব মামা এসেছেন। টেবিলে পা তুলে সোফায় বসে, আছেন গম্ভীব হয়ে। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছে মেজাজ অত্যন্ত খাবাপ। মেজাজ খাবাপ হবাব মত কাবণ ঘটেছে। ট্রেনে আসার সময় একটা ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ট্রেন মোটামুটি ফাঁকাই ছিল, পা তুলে আরাম করে সীটে বসেছিলেন। তেজগাঁ স্টেশনে নামতে গিয়ে দেখেন চটিজুতোজোড়া নেই। পুরানো চটি এমন কোন লোভনীয় বস্তু নয়। মানুষ কি দিন দিনই অসৎ হয়ে যাচ্ছে? কোথাও যেতে হলে সারাক্ষণ নিজেব জিনিসপত্র কোলের উপব নিয়ে বসে থাকবে হবে? তাঁকে বাসায় আসতে হয়েছে খালিপায়ে।

সফিক কবিব মামাকে দেখে সালাম করবার জন্যে এগিয়ে এল।

ঃ কি রে, ভাল আছিস?

ঃ জ্বি।

ঃ মুখ এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?

ঃ মাথা ধরেছে।

ঃ অফিস থেকে চলে এসেছিস?

ঃ জ্বি।

ঃ সামান্য মাথা ধরাতেই অফিস ছেড়ে এসেছিস, বলিস কি?

সফিক কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল। কবিব মামা অবাক হয়ে তাকিয়ে বইলেন। তিনি অসম্ভব বিবক্ত হয়েছেন। সমগ্র জাতির ভেতবই কাজেব প্রতি একটি অনীহা এসে গেছে। টঙ্গীতে একজন টিকিট চেকার উঠল। পাঁচ-ছ'জন যাত্রীর টিকিট দেখেই সে যেন ক্লান্ত হয়ে গেল। দু'বার হাই তুলল। কবির সাহেবেব কাছে এসে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যেন সে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পডবে।

তিনি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিতেই সে বলল, থাক থাক, লাগবে না।

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, লাগবে না কেন, দেখেন?

ঃ আরে না, দেখতে হবে না।

ঃ দেখতে হবে না কেন? একশ' বার দেখতে হবে।

টিকিট-চেকার এরকম ভাবে তাকাল যেন সে এমন অদ্ভুত কথা এর আগে শোনেনি। বড়ই আশ্চর্য কাণ্ড।

কবির মামা সোফায় হেলান দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন—কেন দিন দিন জাতি এমন কর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে? কাজে কেউ কেন আনন্দ পাচ্ছে না? কেন পাচ্ছে না? এসব প্রশ্নের উত্তর কারা জানেন? সমাজবিজ্ঞানীরা? জাতি হিসেবে বাঙ্গালী কর্মবিমুখ এটা তিনি মানতে রাজি নন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দেখেছেন কি অসম্ভব খাটতে পারে না- খাওয়া রোগা মানুষগুলি। তখন পেরেছে, এখন কেন পারবে না? এখন কেন জোয়ান বয়সের একজন টিকিট-চেকার তিনটা টিকিটে টিক-মার্ক দিয়েই বোয়াল মাছের মত হাই তুলবে।

মনোয়ারা বললেন, গোসল করে নিন, ভাত দিয়ে দেই।

ঃ একটু অপেক্ষা করি। বৃষ্টি আসবে আসবে করছে। বৃষ্টির পানিতে গোসল করব।

ঃ বৃষ্টির পানিতে করবেন কেন? ঘরে কি পানির অভাব?

কবির মামা থেকে থেকে বললেন, বয়স হয়ে যাচ্ছে, বেশী দিন বৃষ্টির পানি গায়ে লাগানো যাবে না, তাই সুযোগ পেলেই লাগিয়ে নেই। সরিষার তেল আছে ঘরে?

ঃ জ্বি আছে।

ঃ নিয়ে আস। তেল মেখে নেই। ঠাণ্ডা লেগে গেলে মুশকিল।

মনোয়ারা বসলেন পাশেই। কবির মামা বললেন, তারপর বল, তোমার খবরাখবর বল।

ঃ আমার কোন খবর নাই।

ঃ খবর নাই কেন? মনে হচ্ছে সবার উপর তুমি বিরক্ত!

ঃ বিরক্ত হব না কেন? কে আমার জন্যে কি করল খুশী হবার মত?

ঃ কে কি করল সেটা জিজ্ঞেস করবার আগে বল তুমি অন্যদের জন্যে কি করলে?

মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন, কি করলাম মানে? সংসার চালাচ্ছে কে?

ঃ তুমি এমন ভাব করছ যেন তুমি না থাকলে সংসার আটকে যাবে।

ঃ আটকাবে না?

ঃ না, আটকাবে না। কারো জন্যেই কিছু আটকে যায় না। মুশকিলটা হচ্ছে সবাই মনে করে তাকে ছাড়া সংসার অচল। বৃষ্টি নামল বোধ হয়। সাবান দাও, গামছা দাও। হোসেন আসবে কখন?

ঃ জানি না কখন।

ঃ কোথায় গিয়েছে বললে?

ঃ জানি না কোথায়।

ঃ তুমি কি আমার উপর রেগে গেলে নাকি? রাগ হবার মত কিছু বলিনি।

গামছা সাবান নিয়ে ছাদে চলে গেলেন। ভাল বৃষ্টি নেমেছে। ছাদে পানি জমে গেছে। তিনি খানিকক্ষণ শিশুদের মত সেই জমে থাকা পানিতে লাফালেন। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন সব বয়স্ক মানুষরাই বোধ হয় খানিকটা শিশুর অভিনয় করতে ভালবাসে।

কবির মামা গায়ে সাবান মাখতে মাখতে লক্ষ্য করলেন, খাঁচায় দু'টি কবুতর চুপচাপ ভিজছে। আনিসের ম্যাজিকের কবুতর। তাঁর বিরক্তির সীমা রইল না। প্রথমত খাঁচায় পাখি আটকানোই একটি অপরাধ। তার চেয়ে বড় অপরাধ বন্দী পাখিগুলিকে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে

ফেলে রাখা। তিনি আনিসের ঘরে উঁকি দিলেন, আনিস আছ?

আনিস ঘরেই ছিল। সে অবাক হয়ে উঠে এল।

ঃ তোমার কবুতর বৃষ্টিতে ভিজছে। পশু-পাখিকে এভাবে কষ্ট দেবার তোমার কোন রাইট নেই। এটা ঠিক না—অন্যায়।

ঃ আপনি বৃষ্টির মধ্যে কি করছেন মামা?

ঃ গোসল করছি, আর কি করব?

ঃ আপনি কি মামা কবুতর দু'টি ছেড়ে দিতে বলছেন?

ঃ তোমার ম্যাজিকের যদি কোন গুরুতর ক্ষতি না হয় তাহলে ছেড়ে দাও।

আনিস হাসিমুখে বৃষ্টির মধ্যে নেমে এল। খাঁচা খোলার পর কবুতর দু'টি উঠে গেল না। ছাদের রেলিংয়ের উপর বসে রইল। আনিস বলল, দেখলেন মামা, বৃষ্টিতে ভিজতে ওদের ভালই লাগছে।

আনিস হুস হুস করে ওদের তাড়াতে চেষ্টা করল। ওরা গেল না। উড়ে উড়ে বার বার রেলিংয়েই বসতে লাগল।

কবির মামা গম্ভীর গলায় বললেন—উড়তে ভুলে গেছে।

আনিস বলল— ভুলে গেলেও শিখে নেবে। ওদের নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না মামা।

ঃ তুমি ভিজছ কেন?

আনিস হেসে বলল, ভিজতে ভালই লাগছে।

ঃ তোমার ম্যাজিক কেমন চলছে?

ঃ ভালই।

ঃ যে শাস্ত্রটা তৈরীই হয়েছে মানুষকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে, সেটা লোকজন এত আগ্রহ করে কেন শেখে বল তো আমাকে?

ঃ আপনি মামা শুধু ফাঁকিটা দেখলেন। ফাঁকির পেছনে বুদ্ধিটা দেখলেন না। আমি যদি এই বৃষ্টির ফোঁটা থেকে একটা গোলাপ ফুল এনে দিই, আপনার কেমন লাগবে?

বলতে বলতেই আনিস হাত বাড়িয়ে একটি গোলাপ তৈরি করল। কবির মামা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ কেমন লাগল মামা?

ঃ চমৎকার।

ঃ শুধু চমৎকার?

ঃ অপূর্ব। আমি মুগ্ধ হলাম আনিস।

ঃ আপনার কি মামা মনে হয় না যে সত্যিকার ফাঁকিগুলি ভুলে থাকার জন্যে এ জাতীয় কিছু ফাঁকির দরকার আছে?

ঃ তুমি খুব গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছ!

আনিস হাসতে লাগল। কবির মামা বললেন, তোমাকে আমি নীলগঞ্জে নিয়ে যাব। গ্রামের লোকজনদের তুমি তোমার খেলা দেখাবে।

ঃ নিশ্চয়ই দেখাব। আপনি যখন বলবেন তখনি যাব। অনেকক্ষণ ধরে ভিজছেন, নিচে যান—ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ফুলটা নিয়ে যান মামা।

তিনি গোলাপ হাতে নিচে নেমে এলেন।

রাতের বেলা তাঁর জ্বর এসে গেল। রফিককে যেতে হল ডাক্তারের খোঁজে। শাহানা কপাল টিপে দিতে বসল।

শাহানা শাড়ি পড়ছে। মনোয়ারা কামিজ পরার উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। দু'দিন পর বিয়ে যে মেয়ের সে ফ্রক পরে ধেই-ধেই করবে কেন?

শাড়িতে শাহানাকে অপূর্ব লাগছে। ঘরে আলো কম। কবির মামার চোখে আলো লাগছে বলেই বাতি নেভানো। খোলা দরজা দিয়ে সামান্য কিছু আলো এসে পড়েছে শাহানার মুখে। কি সুন্দর লাগছে তাকে। যেন একজন কিশোরী দেবী।

শাহানা বলল, এখন কি একটু ভাল লাগছে মামা?

ঃ লাগছে। তোর বিয়ের ব্যাপারে কতদূর কি হল?

ঃ জানি না।

ঃ খামাখা এটা ঝুলিয়ে রেখেছে কেন বুঝলাম না। এসব তো ঝুলিয়ে রাখার জিনিস না।

শাহানা কিছু বলল না। কবির মামা বললেন, ছেলেটিকে পছন্দ হয়েছে তো?

শাহানা জবাব দিল না। খুব লজ্জা পেয়ে গেল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, লজ্জা পাস কেন? একজন মানুষকে পছন্দ হয়েছে কি পছন্দ হয়নি এটা বলার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

ঃ পছন্দ হয়েছে।

ঃ ভাল। যে কথাটা মনে আসে সে কথাটা মুখেও আসতে পারে। এবং আসাই উচিত। তোর বরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ভাল ছেলে। সব সময় হাসছে।

ঃ সব সময় হাসলেই বুঝি ভাল ছেলে হয়?

ঃ হ্যাঁ হয়। কুটিল মনের মানুষ সব সময় হাসতে পারে না। গম্ভীর হয়ে থাকে।

ঃ তুমিও তো সব সময় গম্ভীর হয়ে থাক, তুমি কি কুটিল মনের মানুষ?

ঃ গম্ভীর হয়ে থাকি আমি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কখনো হাসি না?

ঃ না।

কবির মামাকে দেখে মনে হল তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শাহানা হাসতে শুরু করল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করল হাসির বেগ সামলাবার জন্যে, সেটা সম্ভব হল না। সে ছুটে গেল বারান্দায়। বারান্দায় কিন্নর কণ্ঠের হাসি দীর্ঘ সময় ধরে শোনা গেল। টুনী যোগ দিল সেই হাসিতে, তারপর বাবলু। শিশুরা যাবতীয় সুখের ব্যাপারে অংশ নিতে চায়।

আগামীকাল শারমিনের গায়েহলুদ।

শারমিন আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছে। আয়নায় নিজেকে চেনা যাচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছিল? বিয়ের ঠিক আগে সব মেয়েই অচেনা হয়ে যায়। তাদের চোখ হয় আরো কালো। চেহারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধবণের ঔজ্জল্য আসে। বিয়ে হবে-হবে মেয়েরা বার বার আয়নায় নিজেদের দেখে কথাটা আংশিক সত্যি। শারমিন আয়নায় নিজেকে চিনতে পাবছে না, তবে আয়নার সামনে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

জমিলার মা এসে বলল, আপনারে ডাকে?

ঃ কে ডাকে?

ঃ বড় সাহেব।

ঃ বল আসছি।

শারমিন নড়ল না। যে ভাবে বসেছিল ঠিক সে ভাবেই বসে রইল। বাড়ি -ভর্তি মানুষ। কিছুক্ষণ আগেই দু'টি মেয়ে বাবান্দায ছুটাছুটি কবছিল। শাবমিন শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে—তোমরা নিচে যাও কিংবা ছাদে যাও, আমার মাথা ধবেছে। বাবার উপব বাগ লাগছে খানিকটা, এক মাস আগে থেকে লোকজন দিযে বাড়ি ভর্তি কববাব কোন দরাকাব ছিল না। এবং এদেব কাণ্ডজ্ঞানও নেই, এতদিন আগে কেউ আসে অন্যের বাড়ি?

ঃ আফা।

সারমিন বিরক্ত মুখে তাকাল। জমিলার মা আবাব এসেছে। তাব মুখ হাসি হাসি। ঠোঁট লাল টুকটুক করছে। গায়ের লাল পেড়ে সাদা শাড়িটিও নতুন। বিয়ে উপলক্ষে সবাই নতুন শাড়ি পেযেছে। দু'টি কবে শাড়ি– একটি সাধাবণ লালপেড়ে সাদা শাড়ি, অন্যটি দামী শাড়ি।

ঃ আফা, আপনেরে ডাকে।

ঃ বলছি তো যাব।

ঃ বড় সাব চা লইয়া বইস্যা আছে।

শারমিন উঠে দাঁড়াল। এমন বিবক্তি লাগছে। শুধু বিবক্তি নয, মাথাও ধবেছে। তীব্র ব্যথা। চারটা প্যারাসিটামল খাওয়া হযেছে ছ'ঘণ্টাব মধ্যে। যন্ত্রণা ভোঁতা হযে এসেছে কিন্তু তবু মাঝে মাঝে চিলিক দিয়ে উঠছে।

রহমান সাহেব চায়ের পট নিযে হাসিমুখে বসে আছেন। শাবমিনকে দেখে অবাক হযে বললেন, এমন একটা সাধাবণ শাড়ি পবে ঘুবছ কেন মা?

শারমিন জবাব দিল না।

ঃ নাও চা নাও।

ঃ চা খেতে ইচ্ছে কবছে না।

ঃ ইচ্ছা না করলেও খাও। বাবাকে কোম্পানী দাও। এখন তো আব আগেব মত তোমাকে পাব না।

ঃ পাবে– সব সময়ই পাবে। আমি সব সময় তোমাব মেয়েই থাকব বাবা।

বলতে বলতে শারমিনের গলা ভারী হয়ে এল। রহমান সাহেব দেখলেন শারমিন কাঁদছে। তিনি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বাবার কাছে মেয়ের বিয়ে কোন আনন্দের ব্যাপার নয়। বিয়ের দিনটি হচ্ছে বাবা-মা'র জীবনের গভীরতম বিষাদের দিন। এই বিষাদ

ভুলবার জন্যেই আনন্দ ও উল্লাসের একটা ভান করা হয়। রহমান সাহেব গাঢ়স্বরে বললেন মা-মনি, চা খাও।

শারমিন পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেই টুপ করে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল কাপে। রহমান সাহেব দৃশ্যটি দেখলেন। তাঁর নিজেরো ইচ্ছা করল ছুটে কোথায়ও পালিয়ে যেতে। মানুষের বেশির ভাগ ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে। ছুটে যেতে ইচ্ছা করলেও ছুটে যাওয়া যাবে না। তাকে বসে থাকতে হবে এখানেই।

ঃ শারমিন!

ঃ বল বাবা।

ঃ তোমাকে না জানিয়ে একটা কাজ করেছি মা।

শারমিন তাকাল।

ঃ পুলিশের ব্যাণ্ড-পার্টি আনিয়েছি। গ্রাম থেকে অনেকেই এসেছে, ওরা খুশী হবে। ব্যাণ্ড পার্টির অনেক কায়দাকানুন আছে তো। একজন ব্যাণ্ড-মাষ্টার থাকে, সে রুপো বাঁধানো লাঠি নাড়াচাড়া করে। আমার নিজেরই দেখতে এমন চমৎকার লাগে।

রহমান সাহেব হাসলেন। হাসল শারমিনও।

ঃ ওরা কখন আসবে?

ঃ আজ বিকেলে আসবে। আবার কালও আসবে। কেমন হবে বল তো মা?

ঃ ভালই হবে।

ঃ মোতাব্বের সাহেব বলছিলেন, ব্যাণ্ড না এনে শানাইয়ের ব্যবস্থা করতে। একটা স্টেজের মত থাকবে, সেখানে বসে বসে সানাই বাজাবে। কাউকে সে রকম পাওয়া গেল না। তা ছাড়া শানাই বড় মন খারাপ করিয়ে দেয়। মেয়ের বিয়ে এম্নিতেই বাবা-মা'র জন্যে যথেষ্ট মনখারাপ করার মত ব্যাপার, সেটাকে আর বাড়ানো ঠিক না কি বল মা?

শারমিন জবাব দিল না। রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। কয়েকদিন ধরেই তিনি খুব সিগারেট খাচ্ছেন। প্রায় চেইন স্মোকার হয়ে গেছেন।

শারমিন বলল, আমি এখন উঠি বাবা।

ঃ এখনই উঠবে কি, বস একটু।

ঃ ভাল লাগছে না বাবা। জ্বর জ্বর লাগছে।

তিনি মেয়ের হাত ধরলেন। জ্বর নেই, গা ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

ঃ শারমিন!

ঃ কি বাবা?

তিনি খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে বললেন, একটা কথার ঠিক জবাব দাও তো মা। তাকাও আমার চোখের দিকে। রহমান সাহেব থেমে থেমে বললেন, সাব্বিরকে কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

ঃ পছন্দ হবে না কেন? তাঁকে পছন্দ না করার মত তো কিছু নেই?

ঃ আমিও তাই বলি। জমিলার মা বলল, তুমি গতকাল সারারাত ঘুমোওনি। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছিলে।

ঃ ঘুম আসতে একটু দেরী হয়েছে, যা গরম।

ঃ আমাকে ডাকলে না কেন?

ঃ তোমাকে ডাকলে কি হত?

ঃ দু'জনে মিলে গল্প করতাম।

ঃ আজ যদি ঘুম না আসে তোমাকে ডাকব। বাবা, এখন যাই?

ঃ আচ্ছা যাও। জমিলার মা বলছিল, ছেলেপুলেরা নাকি তোমাকে খুব বিরক্ত করছে। বারান্দায় ছুটাছুটি করছে।

ঃ না, তেমন কিছু না।

শারমিন নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল। এবং এক সময় ঘুমিয়েও পড়ল। জমিলার মা তাকে জাগাল না। দুপুরে খাবার সময় রহমান সাহেব বললেন, ওর ঘুম ভাঙ্গানোর দরকার নেই, ঘুমুক।

পুলিশের ব্যাণ্ডপার্টি চলে এল তিনটায়। শারমিনের ঘুম ভাঙ্গল ব্যাণ্ডের শব্দে। তারা বাজাচ্ছে আনন্দের গান, উৎসবের গান। কিন্তু তবু কেন বার বার চোখ ভিজে উঠছে? কেন বার বার মনে হচ্ছে চারপাশ অসম্ভব ফাঁকা? কোথাও কেউ নেই? কেন এত কষ্ট হচ্ছে?

দরজায় টুক টুক আওয়াজ হল। শারমিন ক্লান্ত গলায় বললো, কে?

ঃ আফা, আমি।

ঃ কি চাও?

ঃ আপনার সাথে দেখা করতে আইছে।

ঃ কে?

ঃ ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, রফিক সাব।

শারমিন চুপ করে রইল। তার একবার ইচ্ছা হল বলে—ওকে চলে যেতে বল। কিন্তু সে কিছুই বলল না। জমিলার মা দ্বিতীয়বার ডাকল—ও আফা, আফা। শারমিন তারও জবাব দিল না। কিন্তু জমিলার মা নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও নিচে নেমে এল।

ব্যাণ্ডপার্টির চারদিকে সবাই ভীড় করে আছে। রহমান সাহেবও এতক্ষণ ছিলেন। একটু আগেই গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন, বলে গেছেন শারমিন ঘুম থেকে উঠেই যেন কাপড় পরে তৈরী থাকে। সন্ধ্যার পর তাকে নিয়ে বেরুবেন।

রফিক ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা শুনছে খুব উৎসাহ নিয়ে। তার মুখ হাসি হাসি। শারমিনকে আসতে দেখে সে এগিয়ে গেল।

ঃ শারমিন, বল তো কি গান বাজছে?

ঃ জানি না।

ঃ কাম-সেপ্টেম্বর। আমার খুব প্রিয় গান।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হুঁ। দারুণ মিউজিক। তোমার ভাল লাগছে না?

ঃ লাগছে।

ঃ আজ তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হল। আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম।

কষ্ট করে....

হোসেন সাহেব কথা শেষ করলেন না। নীলু শান্ত স্বরে বলল, দিচ্ছি। চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেব?

ঃ এক স্লাইস রুটি দিতে পার যদি থাকে। মাখন দিও না। এই বয়সে মাখনটা আর সহ্য হয় না।

নীলু মুহূর্তের মধ্যেই চা রুটি নিয়ে এল। মুখে একটি বিরক্তির রেখাও পড়ল না। ঠোঁট বাঁকল না। পরের ঘরের একটি মেয়ে কত যত্নই না করল। এই ঋণ তো কখনো শোধ হবে না। পরের বাড়ির একটি মেয়ের কাছে আকাশপ্রমাণ ঋণ রেখে তাঁকে মরতে হবে।

ঃ বৌমা, একটু বস না। এই দু'মিনিট!

নীলু বসল। হোসেন সাহেব হাসিমুখে বলতে লাগলেন, গ্রামের বাড়িতে প্রথম বর্ষণে কত মাছ মেরেছি। প্রথম বর্ষণে কি হয় জান? মাছগুলি সব মাথা-খারাপের মত হয়ে যায়। পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে আসে, স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতরায়। কত কি যে করে।

শাহানা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আবার বকবক শুরু করলে বাবা?

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। বৃষ্টিতে ঢাকা শহর আজ হয়ত ডুবে যাবে। এখন আবার বাতাস দিচ্ছে।

এক রাতের বৃষ্টিতে বাড়ির সামনে হাঁটু-পানি জমে গেছে। আরেকটু হলে ঘরে পানি ঢুকতো। শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি দেখছে। নীলু অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে বাইরে এসে আঁতকে উঠল। ভীত গলায় বলল, বন্যার পানি নাকি শাহানা? সমুদ্রের মত লাগছে?

শাহানা হাসিমুখে বলল, আজ আর অফিসে যেতে পারছ না। শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত যদি তুলতে পার তাহলে অবশ্যি ভিন্ন কথা। কিংবা একটা রিকশা যদি বারান্দা পর্যন্ত আনা যায়।

ঃ কে আনবে রিকশা?

সেটা একটা সমস্যা। রফিককে বলা যাবে না, সে এখনো ঘুমুচ্ছে। না ঘুমুলেও পানি ভেঙে রিকশা আনার পাত্র সে নয়। শাহানা বলল, তোমার কি যাওয়াটা খুবই দরকার ভাবী?

ঃ হুঁ।

ঃ আনিস ভাইকে বলি একটা রিকশা এনে দিক।

ঃ যাও, প্লীজ। দেখ সে আছে কিনা।

ঃ সে নেই। বাজার করতে গিয়েছে। এক ঘন্টার উপর হয়েছে, এসে পড়বে। এলেই রিকশা আনতে পাঠাব।

ঃ থ্যাংকস, শাহানা।

নীলু ভেতরে ঢুকে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারী একটা বাজারের ব্যাগ হাতে আনিসকে আসতে দেখা গেল। লাউয়ের মাথা পুঁইশাক বের হয়ে আছে। অন্য হাতে একটা হাঁস। এত বাজার-টাজার আনিসের নিশ্চয়ই নয়, বীণাদের বাজার। আনিসের প্যান্ট ভাঁজ করে হাঁটু পর্যন্ত তোলা। কি কুৎসিতই না দেখাচ্ছে! আনিস হাসিমুখে বলল, কি ব্যাপার শাহানা, তুমি এখনো বারান্দায়?

ঃ তাতে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে?

ঃ আরে না, আমার অসুবিধা কি? আমার বরং সুবিধাই হল। তোমার মুখ দেখে যাত্রা করেছি বলে কুড়ি টাকায় হাঁস পেয়ে গেলাম। এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে এই হাঁসের দাম হত কমসে-কম চল্লিশ।

ঃ কেন শুধু শুধু কথা বলেন? কে আপনার এইসব কথা শুনতে চায়? আপনি চট করে একটা রিকশা নিয়ে আসুন।

আনিস অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। শাহানা বলল, খামাকা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাজার দিয়ে রিকশা নিয়ে আসুন।

আনিস বাজারের থলি নামিয়ে রেখে প্যান্টের ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল, দু'দিন পর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এখনো তুমি রেগে রেগে কথা বল— পরে অসুবিধা হবে।

ঃ কি অসুবিধা হবে?

ঃ তোমার নিজেরই খারাপ লাগবে। মনে হবে লোকটা তো ভালই ছিল, কেন যে এত খারাপ ব্যবহার করেছি।

শাহানা একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে ঘরে ঢুকে গেল। আবার যদি বের হয় এই আশায় আনিস বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শাহানা এল না। আনিসকে আবার প্যান্ট উঠাতে হল। রিকশা আনতে যেতে হবে। তারপর যাবে পুরানো ঢাকায়। আজ শরাফ আলি ভাইকে বাড়িতে পাওয়ার সম্ভাবনা। গতরাতের ঝুম-বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই প্রাণভরে বোতল টেনেছে। এবং যদি টেনে থাকে, তাহলে এখনো ঘুমে। দড়ির একটা কৌশল যদি আদায় করা যায়।

গলির সামনে এসে আনিসকে থমকে দাঁড়াতে হল। নর্দমা উপচে উঠেছে। পূতিগন্ধময় পানি ঢুকছে গলিতে। নাড়ি উল্টে আসার মত দুর্গন্ধ। সুস্থ মাথায় কেউ এই পানিতে পা ডুবিয়ে গলিতে ঢুকবে না। আনিসের অবশ্যি ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আজ গেলেই শরাফ আলিকে পাওয়া যাবে। বড় কিছু পেতে হলে কষ্ট করতেই হয়। সে প্রায় চোখ বন্ধ করে গলিতে ঢুকে পড়ল।

পানবিড়ির দোকানের ঝাঁপ খোলা। বুড়ো লোকটি কৌতূহলী হয়ে আনিসকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই বলল, শরাফ আলির খোঁজে যান?

ঃ জ্বি।

ঃ আইজ পাইবেন। বাড়িতে আছে। এট্টু আগে পাঁচটা সিগ্রেট কিনল।

আনিস বলল, আমাকে এক প্যাকেট ভাল সিগারেট দিন। সিগারেট দেখলে খুশী হবে।

বুড়ো বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। যার অর্থ, খুশী হবার লোক শরাফ আলি নয়।

দরজা খুলল রেশমা। ঝলমলে একটা শাড়ি গায়ে পেঁচানো। মুখটি করুণ ও বিষণ্ণ। ভারি চোখ দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। আনিস ভয়ে ভয়ে বলল, শরাফ ভাই আছেন?

ঃ হুঁ, আছেন।

মেয়েটি দরজা ধরে আছে, ভেতরে ঢুকতে দেবার ইচ্ছা নেই হয়ত। আনিস বলল, ভেতরে এসে বসব?

রেশমা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

ঃ পা ধোয়া দরকার, একটু পানি দেবেন?

ঃ পা ধোয়ার দরকার নাই। এইটা মসজিদ না।

আনিস ঘরে ঢুকল। মেয়েটি কটু গলায় বলল, দুই দিন পরে পরে ক্যান আসেন? কি চান আপনে?

আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। এত স্নিগ্ধ মুখ মেয়েটির, অথচ কি কঠিন গলায় কথা বলছে।

ঃ কি, কথা কন না কেন ভদ্রলোকের ছেইলা?

ঃ ম্যাজিক শিখতে আসি। পামিং শিখি।

ঃ আসল ম্যাজিক আমার কাছে আছে, শিখবেন?

মেয়েটির চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা হাত দরজার কপাটে, অন্য হাত কোমরে। যেন প্রচণ্ড একটা ঝগড়ার প্রস্তুতি। অথচ মুখ এখন হাসি হাসি।

ঃ কি দেখবেন, ম্যাজিক?

বলতে বলতে মেয়েটি এক হাতে শাড়ি ঘোমটার মত মাথায় দিয়ে নরম গলায় বলল, এই দেখেন— এখন আমি ভদ্দরলোকের মাইয়া, দেখলেন?

আনিস কিছু বুঝবার আগেই রেশমা বুক থেকে শাড়ি সরিয়ে ফেলল। ব্লাউজ বা ব্রা কিছুই নেই। সাদা শঙ্খের মত মেয়েটির সুগঠিত বুক ঝলমল করছে। আনিসের গা ঝিমঝিম করতে লাগল। রেশমা শান্ত গলায় বলল, একটু আগে ছিলাম ভাল মাইনষের ঝি, এখন হইলাম নটি বেটি। এরে কয় ম্যাজিক। আপনেরে একটা কথা কই— আপনে ভাল মাইনষের পুলা— খারাপ জায়গায় ঘুরাঘুরি করেন ক্যান? এইখানের বাতাসে দোষ আছে, খারাপ বাতাস শইলে লাগব। যান বাড়িতে যান।

আনিস নিঃশব্দে বের হয়ে এল। আকাশে আবার ঘন হয়ে মেঘ করেছে। পথে নামতেই বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল। পানওয়ালা হাসিমুখে বলল, দেখা হইছে শরাফ ভাইয়ের সাথে?

আনিস জবাব দিল না।

কবির মাষ্টারের শরীরটা ভাল না।

কয়েকদিন আগে পা পিছলে পুকুরপাড়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তখন কিছু হয়নি কিন্তু এখন জানান দিচ্ছে। গতরাতে কোমরব্যথায় ঘুমুতে পারেন নি। সেঁক দিতে গিয়ে শওকত আগুন-গরম কাপড় কোমরে ধরেছে, নির্ঘাৎ ফোসকা পড়েছে। এখন টনটনে ব্যথা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে আছেন। উঠানে বৃষ্টি-ভেজা জোছনা। রাত তেমন হয়নি কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। সুনসান নীরবতা। এতক্ষণ ঝিঁঝিঁ ডাকছিল, এখন তাও ডাকছে না। তবে মশার পিন পিন শব্দ হচ্ছে। বড্ড মশা। কিছুক্ষণ বসে

থাকলে মনে হয় গা খুবলে নিয়ে যাবে। শওকত মালশায় ধূপ দিয়ে পায়ের কাছে রেখে দিয়ে ক্ষীণগলায় বলল, সেঁক লাগব, স্যাব?

কবির মাষ্টার হুংকার দিয়ে উঠলেন, সাবধান, সেঁকের কথা মুখে আনবি না। আমাকে আলুপোড়া করেছিস, খেয়াল নেই? সাহস কত আবার, সেঁক দিতে চায়! দূর হ সামনে থেকে।

শওকত সরে গেল, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে উঠোনে দেখা গেল। সাজসজ্জা বিচিত্র। পায়ে গামবুট, হাতে পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চ। কবির মাষ্টার থমথমে গলায় বললেন, যাস কোথায়?

ঃ মাছ মারতে যাই।

ঃ গামবুট পেলি কোথায়?

শওকত জবাব দিল না। কবির সাহেব ভারী গলায় বললেন, অসুখে একটা মানুষকে ফেলে চলে যাচ্ছিস, ব্যাটা তুই মানুষ না অন্য কিছু?

কবির মাষ্টারের কথা শওকতের উপর কোন প্রভাব বিস্তাব করল বলে মনে হল না। সে টর্চ ফেলে চার কোণ পবীক্ষা করল এবং গামবুটে মচমচে শব্দ করে বের হয়ে গেল।

কবির মাষ্টার বিড়বিড় করে কি সব বললেন। তাঁর কোমরের ব্যথা বেড়েছে। পানিব পিপাসা হচ্ছে। কিন্তু উঠে গিয়ে পানি খাবার উৎসাহ বোধ করছেন না। সাবা শরীরে সীমাহীন আলস্য। এর নাম বয়স। বেলা শেষ হয়েছে। অজানা দেশে যাবার প্রস্তুতি তেমন নেই। একা যখন থাকেন, ভয়-টয় লাগে। একদিকে মায়া, অন্যদিকে ভয়। অসম্ভব সুন্দর এই জাযগা ছেড়ে যেতে মায়া লাগছে। প্রিয়জন কেউ নেই তবু যখন মনে হয় এই শওকতের সঙ্গে আব দেখা হবে না, দেখা হবে না সফিক-রফিকদের সঙ্গে, তখন বুকের ভেতর চাপ ব্যথা অনুভব করেন। তিনি গৃহী মানুষ নন, তাঁরই যখন এমন অবস্থা তখন গৃহী মানুষেব অবস্থাটা কি ভাবাই যায় না।

কবির মাষ্টার লক্ষ্য করলেন তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। তিনি লজ্জিত বোধ করলেন। আশেপাশে দেখার কেউ নেই তবু কেন জানি মনে হয় কে যেন দেখে ফেঁলল। যে দেখেছে সে যেন একটি তরুণী মেয়ে। দেখেই চট করে পর্দার আড়ালে সরে গিয়ে হাসছে। মেয়েটির মুখ শাহানার মত। সরল স্নিগ্ধ একটি মুখ। যে মুখ দেখলেই মনে এক ধরনের পবিত্র ভাব হয়।

শাহানার বিয়ে খুব শিগগীরই হবার কথা, কিন্তু কেউ এখনো কোন চিঠিপত্র লিখছে না। হয়ত ভুলে গেছে। তাঁর কথা বিশেষ করে কারোর মনে থাকে না। নিমন্ত্রিত মানুষদের তালিকা যখন তৈরী হয় তখন কেমন করে যেন তাঁর নামটা বাদ পড়ে যায়। কেউ ইচ্ছা করে করে না তিনি তা জানেন। হয়ে যায়। ভুল ধরা পড়লে খুব লজ্জা পায়। অসংখ্য বার ভাবে এই ভুল আর হবে না, কিন্তু আবার হয়। কেন হয় কে জানে? মানুষ বড় রহস্যময় প্রাণী। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকার যে রহস্য তারচে কম নয়। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘমালা এগিয়ে আসছে। চাঁদ প্রায় ঢাকা পড়তে বসেছে। কি সুন্দরই না লাগছে। কোমরের ব্যথা তাঁর আর মনে রইল না। তিনি প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। শওকত খালি হাতে ফিরে এসেছে এটিও লক্ষ্য করলেন না। শওকত যখন বলল, ঘুমাইছেন? তখনই শুধু চমকে উঠলেন।

ঃ কিরে, মাছ পাস নাই?

ঃ না, যাই নাই।

ঃ এত মাছ মাছ করে আবার খালি হাতে ফিরে এলি?

ঃ জমির মিয়ার সাথে যাওনের কথা ছিল, তারে ভূতে ধরছে।

ঃ কি বললি?

ঃ নিয়ামত খাঁর বাড়ির সামনে যে তেঁতুল গাছ আছে, হেইখানে ভূতে ধরল। কুস্তি হইছে দুইজনে। জমির মিয়া খুব ভয় পাইছে। শইল দিয়া বিজল বাইর হইতেছে।

ঃ কি পাগলের মত কথা বলছিস? ভূতে ধরবে কি?

ঃ ধরলে আমি কি করমু কন, আমারে জিগাইয়া তো ধরে নাই!

গা জ্বলে যাওয়ার মত কথা। ভূতের সঙ্গে কুস্তি করেছে একজন, অন্যজন তা বিশ্বাস করে বসে আছে। কবে এদের বুদ্ধি হবে? কবে এরা সাদা চোখে পৃথিবী দেখতে শিখবে?

ঃ বিছনা করছি, যান শুইয়া পড়েন। চা-টা কিছু খাইবেন?

ঃ না। তুই আবার যাস কই?

ঃ জমির মিয়ার বাড়িতে। লোকটা বাঁচব না। তওবা করতে চায়। মৌলবী আনতে লোক গেছে।

ঃ কি বলছিস তুই?

ঃ সারা শইল দিয়া বিজল বাইর হইতেছে।

কবির মাষ্টার উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, ঘরে তালা দে। তারপর চল মূর্খটাকে দেখে আসি। কুস্তি যে জায়গায় হয়েছে সেখানটায় আগে নিয়ে যা।

ঃ এই অসুখ শইলে যাইবেন? দিনের অবস্থাও বালা না।

ঃ কথা বলিস না। তোদের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।

যে তেঁতুলতলায় ভূতের সঙ্গে কুস্তি হয়েছে সে জায়গাটায় ধস্তাধস্তির ছাপ সত্যি সত্যি আছে। কবির মাষ্টার টর্চ ফেলে উবু হয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। শওকত শীতল গলায় বলল, এখন বিশ্বাস হয় স্যার? জায়গাটা খারাপ। আসেন যাই গিয়া।

ঃ তোর ভয় লাগছে?

শওকত জবাব দিল না। তার সত্যি সত্যি ভয় লাগছে। ভয় কাটানোর জন্যে একটি বিড়ি ধরিয়েছে। হাতে আগুন থাকলে এরা কাছে আসতে পারে না। জ্বলন্ত বিড়ি স্যারের নজর থেকে লুকিয়ে রাখাও এক সমস্যা।

ঃ স্যার চলেন যাই। দিনের অবস্থা খারাপ।

কবির মাষ্টার উঠে পড়লেন।

জমির মিয়ার বাড়িতে রাজ্যের লোক এসে জড় হয়েছে। তিন-চারটা হ্যারিকেন জ্বলছে। মালশায় ধূপ এবং লোহা পুড়তে দেয়া হয়েছে। জমির মিয়া বারান্দায় চাটাইয়ে শুয়ে ছটফট করছে। ভূতে পাওয়া মানুষকে ঘরে ঢুকানো যায় না। কবির মাষ্টারকে দেখেই জমির শব্দ করে কেঁদে উঠল।

ঃ দিন শেষ গো মাষ্টার সাব। ভূতে কামড় দিছে।

কবির মাষ্টারের বিস্ময়ের সীমা রইল না। লোকটি সত্যিই মৃত্যুশয্যায়। চোখ ডেবে গেছে। গা দিয়ে হলুদরঙের পিচ্ছিল ঘাম বেরুচ্ছে। বাঁ হাত রক্তাক্ত। কবির মাষ্টারের নিজেকে

সামলাতে সময় লাগল।

ঃ জমির মিয়া, তুমি যে গিয়েছিলে তেঁতুলতলায়—তোমার পায়ে জুতা ছিল?

ঃ জ্বি না।

ঃ তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শোন। তোমার সঙ্গে যে কুস্তি করেছে তার পায়ে ছিল রবারের জুতা। জুতার ছাপ আছে মাটিতে। ভূত কি আর জুতা পায়ে দেয়, বল দেখি?

জমির মিয়ার কোন ভাবান্তর হল না। টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। মৌলানা সাহেব আসবার আগেই ডাক্তার এসে পড়ল। নিমতলির সোবাহান ডাক্তার। নেত্রকোনায় এক সময় কম্পাউণ্ডারী করত, এখন পুরো ডাক্তার। রুগীকে ভূতে ধরেছে শুনেই সে তার কালো ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ বের করে ফেলল। কবির মাষ্টার বললেন. কিসের ইনজেকশান দিচ্ছ?

ডাক্তার সোবাহান হাসিমুখে বলল, কোরামিন সুঁইয়ের এক গোঁতায় দেখবেন রুগী ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে উঠেছে। ওষুধ তো না, আগুন।

সেই আগুন ইনজেকশনেও কাজ হল না। রুগী আরো ঝিমিয়ে পড়ল। সোবাহান ডাক্তারকে তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হল না। সে নীচু গলায় পাশের লোকটিকে বলল, একটা পান দিতে বল তো। মুখটা মিষ্টি হয়ে আছে।

কবির মাষ্টার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কি অবস্থা! আশেপাশে কোথাও একজন পাশ করা ডাক্তার পর্যন্ত নেই যে জানবে কি হচ্ছে, সমস্যা কোথায়? মৃত্যু নামক কুৎসিত জিনিসটির সঙ্গে যে প্রাণপণে যুদ্ধ করবে? ঠান্ডা গলায় বলবে— বিনাযুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী। এই লোকটির মত বিরসমুখে পান চিবোবে না।

সোবাহান ডাক্তারের জন্যে জলচৌকি এসেছে। সে জলচৌকি প্রত্যাখ্যান করল। তার আরেক জায়গায় যেতে হবে। জরুরী কল। তার অপেক্ষা ভিজিটের জন্য। টাকা আসছে না বলে যেতেও পারছে না। পাশের লোকটিকে খানিকটা আড়ালে টেনে নিয়ে গুজগুজ করে আবার কি সব বলছে। সম্ভবত ভিজিটের কথা।

মৌলানা সাহেব এসে পড়েছেন, অনেক আয়োজন করে তিনি তওবা পড়ালেন। এবং তার কিছুক্ষণ পরই জমির মিয়া মারা গেল। তার অল্পবয়স্ক বউটি গড়াগড়ি করে কাঁদছে।

এত অল্প সময়ে এত বড় একটি ঘটনা ঘটে যেতে পারে? মৃত্যু ব্যাপারটা কি এতই সহজ? কবির মাষ্টার হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, এ রকম কিছু বোধ হয় ঘটেনি। এটা তাঁর কল্পনা।

ঃ শওকত!

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ চল বাড়ি যাই।

শওকত বিস্মিত হল। এ অবস্থায় মাষ্টার সাহেব বাড়ি চলে যেতে চাইবেন এটা বিশ্বাস করা কঠিন। সে কথা বাড়াল না। রাস্তায় নেমে এল।

ঃ শওকত!

ঃ জ্বি।

ঃ চল তো, তেঁতুলতলায় আরেকবার যাই।

ঃ আবার যাওনের দরকার কি?

ঃ ভূতের কথাটা ঠিক না। ভূত রবারের জুতা পায়ে দেয় না।

ঃ যা হওনের হইছে স্যার। অখন ভূত হইলেই বা কি, না হইলেই বা কি। বৃষ্টিতে ভিজ্যা লাভ না, চলেন যাই গিয়া।

কবির মাষ্টার আর আপত্তি করলেন না। রাতে তাঁর চেপে জ্বর এল। বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন। শেষরাতের দিকে চোখ লেগে এসেছিল, তখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি মারা গেছেন। তাঁর মা বাবা এসেছেন তাঁকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে। তাঁদের মুখ বিষণ্ন। চোখে জল টলমল করছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নীচু করে। কবির মাষ্টার খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন আপনারা? বসুন?

তাঁরা বসলেন না। দু'জনেই কাঁদতে শুরু করলেন।

স্বপ্ন এই পর্যন্তই। কবির মাষ্টার জেগে উঠলেন। ঘামে গা ভিজে গিয়েছে। ক্লান্ত স্বরে ডাকলেন, শওকত, ও শওকত?

শওকত উঠল না। পাশ ফিরে আবার নাক ডাকাতে লাগল। শেষরাতের দিকে তার ভাল ঘুম হয়।

শাহানার গায়েহলুদের দিন তারিখ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

প্রথম ঠিক হল, সোমবার সকালে। বরের বাড়ি থেকে ঠিক ন'টায় মেয়েরা আসবে। দশটার ভেতর বিদেয় করে দিতে হবে। বিয়ে শুক্রবারে, গায়েহলুদ এত আগে আগে কেন? হলুদের পর কিছু নিয়মকানুন পালন করতে হয়। ঘর থেকে হলুদ দেয়া মেয়ে বেরুতে পারে না। ছেলেদের দিকে তাকাতে পারে না। বরপক্ষের কেউ কিছু শুনলেন না। ওদের একটিই কথা—সোমবারই হবে এবং নটার সময়েই হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সোমবার খুব ভোরে তাঁরা জানালেন একটা বিশেষ ঝামেলা হয়েছে, হলুদ হবে মঙ্গলবার বিকালে। ঠিক তিনটার সময় তাঁরা আসবেন, চারটার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সেই দিনও বদলাল—ঠিক হল বুধবার সকাল।

নীলু খুব বিরক্ত হল। বরের চাচাকে বলে ফেলল, আপনারা মন ঠিক করুন।

বরের চাচা মনে হল এই কথায় খুব অপমানিত বোধ করলেন। গলার স্বর চট করে পাল্টে ফেলে বললেন, অসুবিধা আছে বলেই তো বদলানো হচ্ছে। শখ করে নিশ্চয়ই বদলাচ্ছি না।

ভদ্রলোক মুখ অন্ধকার করে রইলেন। চা নাস্তা কিছুই মুখে দিলেন না। যাবার সময় সহজ ভদ্রতায় বিদায়ও পর্যন্ত নিলেন না। নীলু খুব অপ্রস্তুত বোধ করল।

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ক্যাটক্যাট করে ঐ কথাগুলি না বললে হত না বৌমা?

ঃ বলার ইচ্ছা ছিল না মা, মুখ-ফসকে বলে ফেলেছি। এমন কিছু অন্যায়-কথাও কিন্তু বলি নি।

ঃ আমাকে ন্যায় অন্যায় শিখাতে এসো না। বয়স কম হয়নি, ন্যায়-অন্যায় চিনি। তোমরা

সবাই চাও বিয়েটা নিয়ে একটা ঝামেলা হোক। ভালয় ভালয় এটা পার করি তা চাও না।

নীলু চুপ করে গেল। মনোয়াবা চুপ করলেন না। তাঁর স্বভাবমত কথা বলতেই লাগলেন। শেষের দিকে তাঁর কথায় মনে হতে লাগল যেন নীলু আগের থেকে সব ঠিকঠাক করে বরপক্ষীয়দের সঙ্গে এই ঝামেলাটা বাধিয়েছে। এক পর্যায়ে শাহানা কড়া গলায় বলল, তুমি যদি এই মুহূর্তে চুপ না কব তাহলে কিন্তু আমি একটা কাণ্ড করব।

ঃ কি কাণ্ড করবি?

ঃ সেটা যখন কবব তখন বুঝবে। এখন বল চুপ করবে কিনা। শুধু শুধু ক্যাচক্যাচ করে বাড়িসুদ্ধ সবার মাথা ধরিয়ে দিয়েছ।

মনোয়ারার রক্ত চড়ে গেল। তিনি নিতান্তই অবান্তর সব কথা বলতে লাগলেন। যাব মধ্যে একটি হচ্ছে নীলুদের পরিবার হচ্ছে ছোটলোকের পরিবার। তিন বছর পর মা মেয়েকে দেখতে এসেছিল খালিহাতে। একটা বিসকিটের প্যাকেট পর্যন্ত ছিল না। পরিবাবের আছব যাবে কোথায়? মা'র যেমন ছোট মন, মেয়েরও তেমনি হয়েছে। মানুষের ভাল দেখতে পারে না ইত্যাদি।

এইসব কথাবার্তার কোন বকম জবাব দেয়া অর্থহীন। নীলু রান্না চড়িয়ে দিয়ে প্রাণপণে ভাবতে লাগল। সে এখন কিছুই শুনছে না। কিন্তু মনোযারা নীলুর একটি দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছেন, যা তিনি প্রায়ই কবেন। নীলুর মা খালিহাতে মেয়েকে দেখতে এসেছিলেন। এই কথা নীলুকে অতীতে লক্ষ বাব শুনতে হয়েছে। বাকি জীবনে হয়ত আরো কয়েক লক্ষ বার শুনতে হবে।

হোসেন সাহেব নিঃশব্দে রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। নীচু গলায় ডাকলেন, বৌমা!

নীলু স্বাভাবিক স্ববে বলল, চা লাগবে বাবা?

ঃ না মা, চা-টা কিছু না। তোমার শাশুড়ী কি সব শুরু করেছে? কিছু মনে কবো না গো লক্ষ্মী সোনা।

ঃ আমি কিছু মনে কবিনি।

ঃ যেসব সে বলেছে ওগুলি তার মনের কথা না।

নীলু জবাব দিল না। তার চোখে পানি এসে গিয়েছে। এই স্নেহময় বৃদ্ধটি অসংখ্যবার তার চোখে পানি এনে দিয়েছেন। এই ভালবাসার তেমন কোন প্রতিদান নীলু কি দিতে পেরেছে?

ঃ তোমার শাশুড়ী হচ্ছে তোমার মেয়ের মত, বুঝলে মা? মেয়েব উপর কি আর রাগ করা যায়, বল? কথা বলছ না কেন? রাগ করা যায়?

ঃ না, যায় না। আপনাকে চা করে দেই?

ঃ দাও।

রাতে ঘুমুতে যাবাব সময় সফিক হাই তুলে বলল, মা'র সঙ্গে নাকি তুমুল একটা যুদ্ধ করলে?

ঃ হ্যাঁ করলাম। খবরটা তোমাকে দিল কে?

ঃ টুনী দিয়েছে। বাতি নেভাও। শোন, মা'ব সঙ্গে আর একটু মানিয়ে চলতে পার না, বুড়ো মানুষ, কিছু একটা বললেই যদি কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু কর, তাহলে তো মুশকিল।

নীলু বাতি নিভিয়ে দিল।

গা-ঘামে চটচট করছিল। অনেকখানি সময় নিয়ে গোসল করল। চুল ভেজাবে না ভেজাবে না করেও চুল ভেজাল। নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু বাথরুম থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছা করছে শাওয়ারের নীচে সারারাত মাথা ধরে রাখতে। যাতে মনের সব গ্লানি জলধারার সঙ্গে ধুয়েমুছে যায়। কিন্তু তা কি আর যায়? যায় না। গ্লানি থেকেই যায়।

শাহানার ঘরে বাতি জ্বলছে। আজকাল অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে বাতি জ্বলে। সে কি ইচ্ছে করেই জেগে থাকে, না তার ঘুম আসে না? বিয়ে ঠিক হওয়া মেয়েকে একা একা ঘুমুতে দিতে নেই, কিন্তু শাহানাকে দিতে হচ্ছে। সে তার মার সঙ্গে ঘুমুতে রাজি না।

অবশ্যি তার ঘরের একটি চৌকিতে বাবলু ঘুমায়। তাকে কি মানুষের মধ্যে গণ্য করা যায়? বোধহয় যায় না। সে বাস করে ছায়ার মত। ক'দিন ধরে জ্বর যাচ্ছে কিন্তু একটি কথাও কাউকে বলেনি। সফিক প্রথম লক্ষ্য করল এবং বেশ কিছু কড়া কড়া কথা শোনাল। সেসব কথার সারমর্ম হচ্ছে— এই ছেলেটা কোন আসবাবপত্র না, এও একটি মানুষ।

বাতি জ্বলছে রান্নাঘরেও। রফিক ফিরেছে বোধ হয়। ঘুমুবার আগে সে এক কাপ চা খায়। এতে নাকি তার সুনিদ্রা হয়। নীলু এগুলো রান্নাঘরের দিকে। চিরকাল সে শুনে এসেছে চা খেলে ঘুম কমে যায়—রফিকের বেলায় উল্টো।

রান্নাঘরে রফিককেই পাওয়া গেল। চা নয়, প্লেটে ভাত নিয়েই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত; বড় বড় দলা মেখে মুখে দিচ্ছে। নিশ্চয়ই প্রচুর ক্ষিধে। নীলুকে দেখে রফিক অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে হাসল।

ঃ এটা কেমন খাওয়ার নমুনা রফিক? শারমিনকে বললেই সে গরম-টরম করে দিত!

ঃ ও ঘুমুচ্ছে। বেকার মানুষ, বউকে রাতদুপুরে ঘুম ভাঙ্গাই কি করে?

ঃ আমাকে ডাকতে। যাও টেবিলে গিয়ে বস। আমি গরম করে আনছি।

ঃ আমার খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। কাজেই তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ঘুমুতে যাও।

ঃ এত রাত পর্যন্ত বাইরে কি করছিলে?

ঃ নাথিং। তুমি আবার এখন উপদেশ দিতে শুরু করলে ঝামেলা হয়ে যাবে। যা বলছি তাই কর—ঘুমুতে যাও।

ঃ চল একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

ঃ আমার দেরী হবে, চা খাব।

রফিক চায়ের পানি বসাল। এঁটো থালাবাসন পরিষ্কার করল। নীলু তাকিয়ে আছে। বেশ মজা লাগছে তার।

ঃ ড্যাবড্যাব করে কি দেখছ ভাবী?

ঃ তোমার ঘরকন্না দেখছি। এক হাতে প্লেট পরিষ্কার করার এ কায়দা কোথায় শিখলে?

ঃ সব কিছু কি ভাবী শিখতে হয়? কিছু বিদ্যা মানুষ সঙ্গে নিয়েই জন্মায়। তুমিও কি চা খাবে?

ঃ না।

ঃ আমি কিন্তু দু'জনের পানি নিয়েছি।

ঃ তুমি নিজেই দু'কাপ খাও। ভাল ঘুম হবে।

রফিক চা বানাতে পারল না। ঘরে চায়ের পাতা নেই। নীলুর খুবই খারাপ লাগতে লাগল।

বেচারা এত কষ্ট করে পানিটানি গরম করেছে।

ঃ সরি রফিক, আমি খেয়াল করিনি।

ঃ সরি হবার কোনই কারণ নেই ভাবী। আজকের দিনটিই আমার জন্য খারাপ। যে ক'টা কাজ করতে গিয়েছি, প্রতিটি ভণ্ডুল হয়েছে।

ঃ মোড়ের চায়ের দোকানটা খোলা আছে না? ওখান থেকে খেয়ে আস।

ঃ দরজা খুলে দেবে কে?

ঃ আমি জেগে থাকব।

রফিক সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল। তার মুখ হাসি-হাসি। নীলু বসার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। একবার যখন বের হয়েছে এত সহজে ফিরবে না। শাহানার ঘরে এখনো বাতি জ্বলছে। একবার উঁকি দিয়ে দেখলে হয়। কিন্তু কেমন আলসেমী লাগছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না।

মাঝে মাঝে এমন আলসেমী লাগে। কোন কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। তারও কি বয়স হয়ে যাচ্ছে? হচ্ছে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কেন জানি তা মেনে নিতে ইচ্ছা করে না। আয়নায় নিজেকে দেখলে মনে হয়, কই, বয়স তো কিছুই বাড়েনি। সুন্দব একটি মায়াভরা মুখ। ঘন কালো চোখ। এই চোখ নিয়ে কত কাণ্ড। তাদের কলেজের ইংরেজীর স্যার আফতাবউদ্দিনের কাছে গিয়েছে পার্সেন্টেজ নিতে। ক্লাসে দেরী করে এসেছিল, সেখানে দেয়া হয়নি। আফতাব স্যার রেজিস্টার খাতা খুলে বললেন, তোমার ক'টা পার্সেন্টেজ দরকার বল তো? মোটে একটা? নীলু বিস্মিত হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, বাহ্ তোমার চোখ তো ভারী সুন্দর। ভাল করে তাকাও আমার দিকে। এই বলেই কিছু বুঝবাব আগেই গালে হাত দিয়ে নীলুর মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন বিকেল হয়ে গেছে। কমন রুমে একটি মানুষ নেই। আফতাব স্যার তাকাচ্ছেন অদ্ভুত চোখে। কি সর্বনাশা কাণ্ড। প্রতিটি মেয়ের জীবনেই এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটে যা চিরকাল গোপন রাখতে হয়। কোথায় এখন আফতাব স্যার কে জানে? কি সুন্দর ভরাট গলায় শেকসপীয়ার পড়াতেন, এখনো কানে বাজে।

Tell them that God bid's us do goods for evil,
And thus I clothe my naked villainity
with odd old ends stol'n forth of holy writ,
And seem a saint when most I play the devil.

কিং রিচার্ড দ্য থার্ড। আচ্ছা, তার যদি আফতাব স্যারের সঙ্গে বিয়ে হত তাহলে কেমন হত? জীবনটা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অন্যরকম হত। টুনী জন্মাত না। অন্য কোন মেয়ে জন্মাতো কিংবা কোন ছেলে। এখন সে যেমন টুনীকে ভালবাসে সেই ছেলে বা মেয়েটিকে সে তেমনই ভালবাসতো—বাসতো না?

ঃ ভাবী ? একা একা বসে আছ কেন?

শাহানা বের হয়ে এসেছে। একটা সাদা চাদর এমনভাবে গায়ে জড়িয়েছে যে অদ্ভুত লাগছে দেখতে।

ঃ কথা বলছ না কেন ভাবী?

ঃ রফিকের জন্য বসে আছি। রফিক দোকানে চা খেতে গিয়েছে—ঘরে চা ছিল না।

ঃ ছিল না, তবু খেতেই হবে? ছেলে হবার কত মজা দেখলে ভাবী? একটা ছেলে যা চাইবে, সবাই তাকে তা করতে দেবে। কিন্তু একটা মেয়েকে দেবে না।

ঃ আমি দেব। তুমি যদি এখন বাইরে চা খেতে যেতে চাও, আমার কোন আপত্তি নেই—যেতে পার।

শাহানা গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল। নীলুও হাসল। শাহানা বলল, তুমি শুয়ে পড়, আমি দরজা খুলে দেব। আমার ঘুম আসবে না। রাতে প্রায় আমি জেগে থাকি। দিনে ঘুমাই।

ঃ অভ্যাসটা ভাল, বিয়ের পর তাহলে আর কষ্ট হবে না।

ঃ কষ্ট হবে না কেন?

ঃ বিয়ের পর অনেকদিন পর্যন্ত স্বামী নামক জিনিসটি বৌদের রাতে ঘুমুতে দেয় না।

শাহানা কিছু বলল না। নীলু লক্ষ্য করল, মেয়েটির ফর্সা গাল টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কথাগুলি বলা ঠিক হয়নি। নীলুর লজ্জা লাগতে লাগল। এত বাচ্ছা মেয়ে। জীবন সর্ম্পকে কোন বোধ পর্যন্ত জন্মায়নি। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা ঠিক হয়নি।

ঃ দাঁড়িয়ে আছ কেন শাহানা, বসো।

শাহানা বসল না। দাঁড়িয়েই রইল। রফিক এখনো আসছে না, এক ঘন্টার মত হয়ে গেল, কি যে সে করে।

বাহান্নটা কার্ড বাহান্ন রকম।

দর্শকরা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করবেন। তারপর ফিরিয়ে দেবেন ম্যাজিশিয়ানকে। ম্যাজিশিয়ানের হাতে নয়, টেবিলে রাখা একটি চারকোণা বাক্সে। ম্যাজিশিয়ান দূর থেকে মন্ত্র পড়বেন। ম্যাজিক ওয়ান্ড শূন্যে দুলাবেন, অমনি বাহান্নটি তাস হয়ে যাবে বাহান্নটি সাহেব। খেলার আসল মজাটা হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান একবারও তাস হাত দিয়ে ছোঁবেন না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন দূরে। কাজেই দর্শকরা একবারও ভাববে না এর মধ্যে হাত সাফাইয়ের কিছু আছে। অসাধারণ একটি খেলা তবে পুরোপুরি যান্ত্রিক। ম্যাজিশিয়ানের করবার কিছু নেই। যা করবার স্প্রিং-লাগানো কাঠের বাক্সটাই করবে। তাসের প্যাকেট রাখা মাত্র তা চলে যাবে লুকানো একটি খোপে। ওপরে উঠে আসবে আগে থেকে রাখা এক প্যাকেট তাস। তাসের বদলে অন্য কিছুও-উঠে আসতে পারে। কিন্তু তা করা ঠিক হবে না। তাহলে দর্শকরা ভাববে কাঠের বাক্সেই কিছু একটা আছে। তখন তারা বাক্স পরীক্ষা করতে চাইবে। তাসের বদলে যদি তাস আসে তাহলে কোন সমস্যা হবে না। দর্শকরা ভাববে গণ্ডগোলটি তাসের। তারা ব্যস্ত থাকবে তাস পরীক্ষায়। ম্যাজিক মানে হচ্ছে মনস্তত্ত্বের খেল।।

আনিস স্প্রিং-দেওয়া বাক্সটি নিজেই বানিয়েছে কিন্তু ঠিকমত কাজ করছে না। ডালা নেমে-আসার সময় ঝপ করে শব্দ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সবসময় নামছেও না। স্প্রিংটি আরও শক্ত

করে সেই ত্রুটি দূর করা যায় কিন্তু তাতে ঝপ শব্দ আরও বেড়ে যায়। এই মুহূর্তে সেই শব্দ সমস্যার কোন সমাধান মনে আসছে না।

শাহানা অনেকক্ষণ থেকেই ছাদে হাঁটছে। আনিসকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু আনিস একবারও তাকাচ্ছে না। কেউ একজন ছাদে আছে এই বোধটুকুও সম্ভবত তার নেই। শাহানা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। হাল্কা গলায় ডাকল, আনিস ভাই?

আনিস অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার, অসময়ে?

ঃ অসময়ে মানে? আপনার এখানে কি পঞ্জিকা দেখে আসতে হবে?

ঃ না, তা হবে না। ভেতবে আসবে?

ঃ আসতে বললে হয়ত আসব। আগে বলুন।

ঃ আস, ভেতরে আস।

ঃ আপনি বাক্স হাতে নিয়ে কি করছেন? ধ্যান করছেন নাকি? অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি। একবার দেখি বিড়বিড় করে কথা বলছেন— কার সঙ্গে কথা বলছেন? বাক্সটাব সঙ্গে?

ঃ দাঁড়াও, তোমাকে ব্যাপারটা বলি। এই বাক্সটাকে বলে টু-ওয়ে বক্স। দু'টা কম্পার্টমেন্ট আছে। একটা দেখা যায়, অন্যটা দেখা যায় না।

আনিস দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। স্প্রিংটা কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাল। বর্তমানে কি সমস্যা হচ্ছে সেটা বুঝাতে চেষ্টা করল। শাহানা গভীব মনোযোগে তাকিয়ে আছে, যেন সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারছে। আনিস বলল, কত সহজ টেকনিকে কেমন চমৎকার একটা কৌশল দেখলে!

ঃ হ্যাঁ দেখলাম। আপনি কথা বলার সময় আমি একটা কথাও বলিনি, চুপ করে শুনেছি। এখন আমি কিছুক্ষণ কথা বলব, আপনি চুপ করে শুনবেন। আমাব কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলবেন না। হাঁ হুঁ কিছুই বলবেন না।

আনিস অবাক হয়ে তাকাল। শাহানার চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখ রক্তাভ। গলার স্বব গাঢ়। ব্যাপারটা কি?

ঃ আনিস ভাই!

ঃ বল।

ঃ শুক্রবারে আমার বিয়ে, আপনি তো জানেন। আপনাকে কার্ড দেওয়া হয়েছে, না?

ঃ হয়েছে।

ঃ এখন আপনি যদি মনে করেন আপনার সাহস আছে তাহলে আমি আপনার সঙ্গে অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কোর্টে কিভাবে নাকি বিয়ে করে— আমি তো কিছুই জানি না, আপনিই ব্যবস্থা করবেন। আমাব কাছে চারশ টাকা আছে।

আনিস হতভম্ব হয়ে গেল। কি বলছে শাহানা? সুস্থ মাথায় বলছে, না অন্য কিছু?

ঃ আনিস ভাই, আমি একটা সুটকেস গুছিয়ে রেখেছি। আপনি আপনার জিনিষগুলি গুছিয়ে নিন।

ঃ এসব তুমি কি বলছ শাহানা?

ঃ আপনি কি চান না আমি সারাজীবন আপনার সঙ্গে থাকি?

ঃ চাইলেই কি সব হয়? আমি তোমাকে নিয়ে যাই কোথা? কি খাওয়াব তোমাকে?

শাহানা উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, আনিস ভাই, আমি যাচ্ছি।

ঃ শাহানা শোন, একটা কথা শোন।

শাহানা দাঁড়াল না। সিঁড়ি ভেঙ্গে দ্রুত নেমে গেল।

আনিস সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ঘরে বসে রইল। সন্ধ্যা মেলাবার পর নিচে নেমে এল। বারান্দায় নীলু কি যেন করছে। আনিসকে দেখেই বলল, তোমার কি শরীর খারাপ নাকি আনিস?

ঃ জ্বি না।

ঃ চোখ মুখ বসে গিয়েছে ..

ঃ মনটা ভাল নেই ভাবী। বারান্দায় কি করছেন?

ঃ কিছু করছি না। তুমি আমাকে দু'টা মোমবাতি এনে দিতে পারবে? আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই।

আনিস মোমবাতি আনতে গেল। মোমবাতি এনে দেখল ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে। সমস্ত বাড়ি আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। একটা রিকশায় করে কারা যেন এসেছে। সম্ভবত নীলু ভাবীর মা। বিয়েবাড়ির লোকজন আসতে শুরু করেছে। করাই তো উচিত। আনিস মন্থর পায়ে দোতলায় উঠে এল।

তেমন কোন ঝামেলা ছাড়াই শাহানার বিয়ে হয়ে গেল। বড় সমস্যা ছিল বিয়ের খরচের সমস্যা। তার সমাধান হল অদ্ভুতভাবে। হোসেন সাহেব কবির মাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন রফিকের শ্বশুর রহমন সাহেবকে দাওয়াত দিতে। দু'জনই ভেবে রেখেছিলেন, পরিচয়-পর্ব খুব সুখকর হবে না। হোসেন সাহেব আসতে চাননি। তিনি বার বার বলেছিলেন, ছোট বৌমা আগে যাক, বাবার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে আসুক, তারপর আমি যাব।

মনোয়ারা বিরক্তিতে মুখ কুঁচকেছেন, ছোট বৌমা যেতে চাচ্ছে না, তাকে জোর করে পাঠাব?

ঃ তাকে জোর করে পাঠাবে না— তাহলে আমাকে জোর করে পাঠাচ্ছো কেন?

ঃ বাজে কথা বলবে না। তৈরী হও, কবির ভাই যাবে তোমার সাথে। কথাবার্তা যা বলার সেই বলবে, তুমি চুপ করে থাকবে।

ঃ তাহলে আমার যাবার দরকারই বা কি?

ঃ আবার বাজে কথা!

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। দাওয়াতের চিঠি হাতে এমনভাবে বের হলেন যেন ফাঁসিকাঠে ঝুলবার জন্য যাচ্ছেন। ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা ফেললেন। আয়াতুল কুরশী পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন।

দোয়ার কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, রফিকের শ্বশুর হোসেন সাহেবকে

জড়িয়ে ধরলেন। আন্তরিক স্বরে বললেন, আমার এত সৌভাগ্য, এত বড় মেহমান আমার ঘরে। আদর যত্নের চূড়ান্ত করলেন ভদ্রলোক। নিজের মেয়ের কথা একবারও জিজ্ঞেস করলেন না। কবির মাষ্টার সে প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার মেয়ের সঙ্গে যা বোঝাপড়া তা আমায় করতে দিন। ঐটা বাদ থাক। আপনি আপনার নীলগঞ্জের ব্যাপারটা বলুন। এই বয়সে একটা শক্ত কাজ হাতে নিলেন।

ঃ যখন বয়স কম ছিল তখন এইসব চিন্তা মাথায় আসেনি। এখন এসেছে। এখন কি বয়সের কাবণে ঐ চিন্তা বাদ দেওয়া ঠিক হবে?

ঃ মোটেই ঠিক হবে না। বয়স কোন ব্যাপার নয়।

ঃ আপনি আমাব মনের কথাটা বলেছেন বেয়াই সাহেব।

ঃ একদিন যাব আপনার নীলগঞ্জ দেখতে।

ঃ ইনশাআল্লাহ। বড় খুশী হলাম বেয়াই সাহেব, বড় খুশী হলাম।

শাহানার বিয়েতে তিনি থাকতে পারবেন না বলে খুব দুঃখ করলেন। কাবণ আজ সন্ধ্যায় তাঁকে ব্যাংকক যেতে হচ্ছে। কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।

ঃ বুঝলেন বেয়াই সাহেব, একদিন আগে জানতে পারলেও ব্যাংককেব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করতাম। এখন তো সম্ভব না। আপনি কিছু মনে কববেন না।

তাঁরা উঠে আসবাব সময় রমবান সাহেব বেশ বিব্রত মুখেই একটি খাম এগিয়ে দিলেন। নরম স্বরে বললেন, এটা দিতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। নিজেব হাতে কোন একটা গিফট দেয়া দরকাব ছিল। এত অল্পসময়ে কিছু কেনা সম্ভব নয়। আপনাব মেয়েকে বলবেন সে যেন নিজের পছন্দমত ভাল একটা কিছু কেনে।

বাড়ি ফেবাব পথেই খাম খোলা হল। দশ হাজাব টাকার একটা ক্রসড চেক। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হোসেন সাহেব ভেবেছিলেন, চেক দেখে মনোযারা রেগে যাবেন। ক্যাটক্যাট কবে বলবেন, এত বড় সাহস আমাকে টাকা দেখাচ্ছে! টাকাব গরম আমাব কাছে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, সে রকম কিছু হল না। মনোযারা একটি কথাও বললেন না। ঐ টাকায় শাহানাকে কিছু কিনে দেয়া হল না। পুরোটাই খবচ হল বিযেতে। আলোকসজ্জাব ব্যবস্থা কবা হল। খাবারের মেনুতে আগে টিকিয়া ছিল না, এখন টিকিযা এবং দৈ-মিষ্টি যোগ হল। গবীব আত্মীয়স্বজন যারা বিয়েতে এসেছে তাদেব অনেকের জন্যে শাড়িব ব্যবস্থা হল। ছেলেকে যে আংটি আগে দেবার কথা ছিল তাব চেযে অনেক ভাল একটা আংটি কেনা হল। মনোযাবাব ইচ্ছা ছিল স্যুটের কাপড় আরেকটু ভাল দেযা, কিন্তু আগেই কাপড় কিনে দবজিব দোকানে দিয়ে দেয়া হয়েছে বলে সেটা সম্ভব হল না।

শাহানা বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব সহজ ভাবেই পার কবল। মনোযাবা ভেবেছিলেন মেয়ে কেঁদেকেটে বিশ্রী একটা কাণ্ড করবে। সে রকম কিছু হল না। শাহানাব আচবণ সহজ এবং স্বাভাবিক। একবার শুধু নীলুকে বলল, ভাবী, আনিস ভাইকে একটু ডেকে আনবে, কথা বলব।

নীলু বিরক্ত স্বরে বলল, এখন ওর সঙ্গে কথা বলবে মানে? কি কথা?

ঃ তেমন কিছু না। ঠিকমত খাওয়াদাওযা করেছে কিনা।

ঃ ঐসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

ঃ আচ্ছা যাও, ভাবব না।

শাহানা মিষ্টি করে হাসল। বিয়ের সাজে আজ তাকে তেমন সুন্দর লাগছে না। কেমন যেন জবরজং দেখাচ্ছে। গা-ভর্তি গয়না। ফুলে ফেঁপে আছে জমকালো শাড়ি। ঠোঁটে কালচে রঙের লিপস্টিক, একেবারেই মানাচ্ছে না। একদল মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। এরা অকারণে হাসছে। এদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে শাহানা। এক-একবার হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ছে। দৃশ্যটি কেমন যেন ভাল লাগে না। নীলু এক সময় শাহানাকে এক পাশে নিয়ে নীচু গলায় বলল, এত হাসছ কেন?

ঃ হাসির গল্পগুজব হচ্ছে তাই হাসছি। কেন ভাবী, আমার হাসায় কোন বাধা আছে?

শাহানার গলার স্বরও যেন অন্য রকম। কঠিন এবং কিছু পরিমাণে কর্কশ। নীলু আর কিছু বলল না। শাহানা ফিরে গিয়ে আরো শব্দ করে হাসল।

বিয়ের প্রথম কিছুদিন ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। অনেকগুলি ঘটনা একসঙ্গে ঘটে এবং খুব দ্রুত ঘটে। অনেকটা স্বপ্নদৃশ্যের মত। নিজের জীবনেই ঘটছে অথচ যেন নিজের জীবনে ঘটছে না। এটা যেন অন্য কারো জীবন।

বিয়ের রাতটা নিয়ে শাহানার অনেক রকম দুশ্চিন্তা ছিল। না জানি কি হয়, না জানি কি ঘটে। বাসররাত নিয়ে কত রকম গল্প সে বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছে। কিছু কিছু ভারী মিষ্টি। বার বার শুনতে ইচ্ছে করে। গল্পের বইয়েও এই রাতের কত সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। অপরাজিত-য় কি সুন্দর বর্ণনা। অপুর সঙ্গে তার স্ত্রীর প্রথম দেখা। ছোট ছোট কথা বলছে দু'জনে। কত দ্রুত বন্ধুত্ব হচ্ছে দু'জনের মধ্যে, আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গল্পও আছে। নারীজীবনের চরম অবমাননার গল্প। গ্লানি ও পরাজয়ের গল্প। সেখানে ভালবাসা নেই, অন্য কিছু আছে।

শাহানার বেলায় এর কোনটাই হল না। জহির এল রাত একটার দিকে। তার মুখ দেখে মনে হল সে খুব বিরক্ত। জহিরের বড় বোনের গলা শোনা যাচ্ছে। খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলছে, অন্য সবাই তাকে সামলাতে চেষ্টা করছে। বড় রকমের ঝগড়া হচ্ছে। শাহানার একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে কি নিয়ে ঝগড়া? সে অবশ্যি জিজ্ঞেস করল না। খাটে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার ঘুম পাচ্ছিল। আবার একই সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভোঁতা ধরনের ব্যথা। সারা দুপুর ঘুমুলে যেমন ব্যথা হয় তেমন।

জহির নিজে কিছু বলল না। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে হাত মুখ ধুতে লাগল। এই সময় বাইরের হৈ-চৈ আরও বেড়ে গেল। মোটা পুরুষালি গলায় কে একজন বলছে, এসব আমি টলারেট করব না। যথেষ্ট টলারেট করেছি। তারপরই ঝনঝন করে কি যেন ভাঙ্গল। জহির বাথরুম থেকে বের হয়ে এসেছে। সে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। কিছু বলবে না বলবে না করেও শাহানা বলল, কি হয়েছে?

ঃ একটা পুরোনো পারিবারিক ঝগড়া। উৎসব-টুৎসবের দিনে এই ঝগড়াগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আজ এসব শুনে দরকার নেই। পরে শুনবে। তুমি থাক কিছুক্ষণ একা একা, আমি এক্ষুণি সব মিটিয়ে দিয়ে আসছি। সরি এবাউট ইট।

অপেক্ষা করতে করতে কখন যে শাহানা ঘুমিয়ে পড়েছিল সে নিজেই জানে না। জহির তাকে আর জাগায় নি। বিয়ের প্রথম রাতটি সে ঘুমিয়ে পার করে দিল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। ভোরবেলা জেগে উঠে দেখে জহির পাশের ইজিচেয়ারে বসে। অঘুমজনিত কারণে তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। জহির বলল, ঘুম ভাল হয়েছে শাহানা?

শাহানা জবাব দিল না।

ঃ তুমি এত তৃপ্তি করে ঘুমচ্ছিলে যে জাগাতে মন চাইল না।

শাহানার খুব ইচ্ছে করল জিজ্ঞেস করে, আপনি ঘুমুননি? জিজ্ঞেস করতে পারল না। লজ্জা লাগল।

জহিরের বড়বোনের নাম আসমানী। কাল রাতে যে মেয়ে এত কাণ্ড করেছে আজ ভোরে তাকে দেখে তা কে বলবে। খুব হাসিখুশী। যেন কিছুই হয়নি। শাহানার হাত ধরে বাড়ি দেখাচ্ছে। হড়বড় করে কত কথা বলছে।

ঃ কত বড় বারান্দা, দেখলে শাহানা? ফুটবল খেলা যায়, তাই না? অনেকেই বলেন এতবড় বারান্দা একটা ওয়েস্টেজ। আমার তা মনে হয় না। ছোট বারান্দার বাড়িগুলিতে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। তোমার আসে না?

ঃ না। আমার জীবন কেটেছে ছোট বারান্দার বাড়িতে।

ঃ এখানে কিছুদিন থাকলে আর ছোট বারান্দার বাড়িতে থাকতে পারবে না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। এসো শাহানা, লাইব্রেরী ঘরটা তোমাকে দেখাই। তোমার তো আবার গল্পের বইয়ের খুব নেশা।

ঃ কে বলল আপনাকে?

ঃ কেউ বলেনি। একবার তোমাদের বাসায় গিয়ে দেখি বই পড়ছ, আর চোখে আঁচল দিচ্ছ।

শাহানা কিছু বলল না। আসমানী হাসতে হাসতে বলল, গল্প-উপন্যাসের নায়ক নাযিকাদের সুখ-দুঃখে যারা কাতর তারা সাধারণত নিজেদের সুখ-দুঃখের ব্যাপারে উদাসীন হয়। এরকম হয়ো না। নিজের সুখ নিজে আদায় করে নেবে। বুঝতে পারছ?

ঃ পারছি।

ঃ জহির অবশ্যি খুবই ভাল ছেলে, সুখ তুমি পাবে। যথেষ্টই পাবে— এ নিয়ে তোমার সঙ্গে এক লক্ষ টাকা বাজি রাখতে পারি। রাখবে বাজি?

শাহানা হেসে ফেলল। আসমানী প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, কাল রাতে বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে, তুমি কিছু কিছু বোধহয় শুনেছ। জহির কি কিছু বলেছে?

ঃ না।

ঃ সত্যি বলেনি?

ঃ না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঃ ও আচ্ছা। তুমি কি শুনতে চাও?

ঃ জ্বি না, আমি শুনতে চাই না।

আসমানী অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহজ স্বরে বলল, শুনতে না চাইলেও তুমি শুনবে। অন্য কারো কাছ থেকে শোনার চাইতে আমার কাছ থেকে শোন। ঝামেলাটা বাড়ি নিয়ে। এই বাড়ি আমি চাই কিন্তু বাবা আমাকে দিতে রাজি না। ঢাকায় বাবার আরো দু'টি বাড়ি আছে, সে দু'টি বাবা জহিরকে দিয়ে দিক। তা দেবে না। বাবা আমার কোন কথাই শুনতে চাচ্ছে না। জহির যেমন তাঁর ছেলে, আমিও তেমনি তাঁর মেয়ে। আমি তো নদীর পানিতে ভেসে আসি নি। তাই না শাহানা?

ঃ তা তো ঠিকই।

ঃ শোন শাহানা, তোমার কাছে অনুরোধ, পারিবারিক এই ঝামেলায় তুমি নিরপেক্ষ থাকবে। এবং আমার মন খুব ছোট— এইসব ভাববে না। আমার মন ছোট না। তবে আমি অধিকার ছেড়ে দেবার মেয়েও না। আই উইল ফাইট টু দি লাস্ট। এসো তোমাকে বাগানটা দেখাই, খুব সুন্দর বাগান।

বাগান সত্যিই খুব সুন্দর। দু'টি গোলাপঝাড় বাগান আলো করে আছে। শাহানা মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, বাহ্, কি সুন্দর!

আসমানী চাপা গলায় বলল, এই বাগানের প্রতিটি গোলাপচারা আমার লাগানো। কোনটিতে কবে ফুল ফুটল সব আমার ডাইরীতে লেখা আছে। এ বাড়িতে কারো বাগানের শখ ছিল না। এই শখ আমার। চল ছাদে যাই দেখবে কত ধরনের অর্কিড আছে। কত কষ্ট করে একেকটা যোগাড় করেছি। একবার অর্কিড আনতে গিয়ে দু'টি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম—ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি।

আসমানী ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। শাহানার খুব ভাল লাগল মেয়েটিকে। কথা বলার কি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গি।

হাত ধরে হাঁটছে। যেন কতদিনকার পুরানো বন্ধু। অথচ এই মেয়েই কি কর্কশ গলায় কাল রাতে ঝগড়া করছিল। আজও হয়ত করবে। একজন মানুষের অনেকগুলি চেহারা থাকে। একটি চেহারার সঙ্গে অন্য চেহারার কিছুমাত্র মিল থাকে না।

শাহানা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল নতুন বাড়িতে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে। স্রোতের মত লোকজন আসছে। সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলতে হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার যারা আসছে সবাই বিত্তবান। কেউ বিলেত ঘুরে এসেছে। কেউ এই সামারে আমেরিকা যাবে। একজন শাহানাকে বলল, শাহানা যদি শপিং-এর জন্যে কোলকাতা যেতে চায় তাহলে যেন তাকে খবর দেয়, সেও সঙ্গে যাবে। কোলকাতা যাওয়া তো নয়, যেন বায়তুল মুকাররাম বাজার করতে যাওয়া। শাহানা ধাঁধায় পড়ে গেল। বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করতে লাগল। সবচে বিরক্ত করল দাড়িগোঁফওয়ালা বৃষস্কন্ধ এক প্রৌঢ়। সে শাহানাকে ডাকছে আন্টি করে এবং বেশ উঁচু স্বরেই বলছে, তার নেক্সট ছবিতে আন্টিকে একটা রোল করতেই হবে। এরকম সুন্দর একটা চেহারা অথচ বাংলাদেশের লোক সেটা দেখবে না তা হতেই পারে না। যদি হয় তাহলে সেটা হবে ক্রাইম। ক্ষমার অযোগ্য একটা অপরাধ। কি কুৎসিত লোকটির বলার ভঙ্গি অথচ কেউ রাগ করছে না। বরং মজা পেয়ে হাসছে। খুশী খুশী গলায় বলছে—দাও একটা রোল শাহানাকে, মনে হয় ভালই করবে। যে ভাবে ব্লাশ করছে তাতে ভার্জিন ভিলেজ গার্ল

হিসেবে চমৎকার হওয়ারই কথা।

কোথায় ছিল শাহানা আর আজ সে কোথায়? পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনও বোধহয় বদলে যায়। এত ভালবাসতো গল্পেব বই, অথচ এখন বই নিয়ে বসার কথা মনেই হয় না। তবুও অচিন রাগিনী নামের একটা বই সে বের করেছে। পড়ছে কিন্তু মন লাগছে না। আগে একটি বই পড়া শুরু করলেই মনে হত গল্পের নায়িকা আসলে সে। এসব তার জীবনের ঘটনা। এখন মনে হচ্ছে, না, উপন্যাসের নায়িকার জীবন এবং তার জীবন আলাদা। এত তাড়াতাড়ি মানুষ এত বদলে যায়? এই বাড়িতে কত মানুষ অথচ কেউ তার পরিবর্তন লক্ষ্য করছে না কেন? যে মানুষটি সবচে কাছের হওয়া উচিত সেই কেমন দূরে দূরে আছে। কি একটা মামলা নিয়ে ব্যস্ত। তাকে নাকি চিটাগাং যেতে হবে। না গেলেই নয়। গতরাতে সে খুব আগ্রহ নিয়ে মামলার কথা বলল।

ঃ বুঝলে শাহানা, মামলাটা সম্পত্তি নিয়ে। হাজি নরুল ইসলাম নামে এক বিরাট ধনী ব্যক্তি চিটাগাং-এ থাকেন। জন্মসূত্রে বাড়ি হচ্ছে ঢাকার বিক্রমপুর। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধার্মিক। এতিমখানা, স্কুল, কলেজ, মসজিদে বহু টাকা দেন। শুধু তাই না, তিনি একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ বাবা। ভদ্রলোক মাবা যাবার পর একটা সমস্যা দেখা গেল। চিটগাংযেব খাবাপ পাড়াব এক মেয়ে তাঁর সম্পত্তির বিরাট এক অংশ দাবী করে মামলা রুজু করে দিল। ভদ্রলোক নাকি তাকে দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। কাগজপত্র আছে। কেলেঙ্কারি অবস্থা। কেমন ইন্টারেস্টিং না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তুমি কিন্তু তেমন ইন্টারেস্ট পাও নি। কেমন করে বুঝলাম বল তো?

শাহানা চুপ করে রইল। জহির হাসতে হাসতে বলল, তুমি জানতে চাও নি, আমি কোন্ পক্ষের হয়ে মামলায় নেমেছি—তা থেকেই বুঝলাম।

জহির শব্দ করে হাসতে লাগল। কাউকে হাসতে দেখলেই হাসতে ইচ্ছে করে। শাহানাও হেসে ফেলল। জহির অবাক হওয়ার মত ভঙ্গি করে বলল, তুমি আবার হাসতেও জান নাকি? অবাক করলে তো? আমি এক মেয়েকে জানতাম, সে কিছুতেই হাসতো না। যত হাসির কথা বলা হোক, সে গম্ভীর হয়ে থাকতো। শেষটায় রহস্য জানা গেল।

ঃ কি রহস্য?

ঃ হাসলে মেয়েটাকে খুব বাজে দেখাতো।

ঃ সত্যি?

ঃ হ্যাঁ, কাউকে কাউকে বাজে দেখায়। আচ্ছা শোন শাহানা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? তুমিও আমার সঙ্গে চিটাগাং চল।

ঃ আমি?

ঃ হ্যাঁ তুমি। চিটাগাং-এর কাজ শেষ কবে তোমাকে নিয়ে নেপাল থেকে ঘুরে আসব। এই সময়টা নেপালে যাবার জন্যে ভাল নয়, তবু খারাপ লাগবে না। আমি কয়েকবার গিয়েছি। যাবে?

ঃ যাব।

ঃ তোমাদের বাসায় এখন কিছু জানানোর দরকার নেই। নেপালে পৌঁছে সবার নামে

একটা করে ভিউ কার্ড পাঠিয়ে দেবে। আইডিয়াটা কেমন, ভাল না?

ঃ হ্যাঁ, ভাল।

ঃ এমন শুকনো মুখে বলছ কেন? হাসিমুখে বল?

শাহানা হাসল। জহিরের সঙ্গে কথা বলতে তার বেশ ভালই লাগছে। কে জানে এই লোকটির সঙ্গে তার জীবন হয়ত খুব খারাপ কাটবে না।

টলম্যান সফিককে ডেকে পাঠিয়েছে

বেয়ারা দিয়ে পাঠানো নয়— একটা নোট দিয়েছে— যার অর্থ দুপুর এগারোটায় আমার সঙ্গে দেখা করবে। জরুরী।

জরুরী কিছু তো মনে হচ্ছে না। সাধাবণ কিছু হলে নোট পাঠাতো না। নিজেই উঠে এসে বলতো, সফিক, আমার ঘরে এসো— একসঙ্গে চা খাব। টি ব্রেক।

যতই দিন যাচ্ছে লোকটিকে সফিকের ততই পছন্দ হচ্ছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। অফিস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জলের মত স্বচ্ছ ধারণা— শুধু ম্যানেজমেন্ট নয়, এডভারটাইজিং, পাবলিক রিলেশন সবই তার নখদর্পণে। শুধু সমস্যা— কাবোবই কাজ করার স্বাধীনতা নেই, সব কাজ সে একাই করছে। বিভাগীয় প্রধানদের এখন আর কিছু করার নেই।

শ্রমিক সমস্যা সে মোটামুটি ধামাচাপা দিয়েছে। পদ্ধতিটিও চমৎকার। শ্রমিকদের প্রধান দাবী ছিল— দু'টি ঈদ বোনাস, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়িভাড়া।

সে দু'টির জায়গায় তিনটি বোনাস দিয়ে দিল। যাতায়াত ভাতা দেয়া হল না। ঠিক হল বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে গাড়ি ওদেব নিয়ে আসবে এবং দিয়ে আসবে। ওদের দাবী ছিল মাসে পঞ্চাশ টাকা চিকিৎসা ভাতা, সেটা করা হল পঁচাত্তর। মূল বেতনের বিশ ভাগ বাড়ি ভাড়া দেয়া হল এবং ঘোষণা দেয়া হল এক বৎসরের মধ্যে প্রতিটি শ্রমিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রমিকদের জন্যে অপ্রত্যাশিত বিজয়। তারা আন্দোলনের সাতজন মূল নেতাকে গলায় মালা দিয়ে কাঁধে করে নাচতে লাগল। তাদের বিজয় উল্লাসে বার বার শোনা গেল— শ্রমিক-বন্ধু টলম্যান, জিন্দাবাদ। উৎসাহের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর পর দেখা গেল, টলম্যান সাতজন শ্রমিক নেতাকে বরখাস্ত করেছে।

টলম্যান নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আমার আদেশের কোন বকম নড়চড় হবে না। তোমাদের কথা আমি মেনে নিয়েছি, তোমরা আমাব কথা মানবে। যদি না মান, কারখানা বন্ধ করে চলে যাব। এই ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়েছে। একদিনের ছুটি তোমাদের দেয়া হল। তোমরা চিন্তাভাবনা কর। একদিন কারখানা বন্ধ থাকবে। মন ঠিক কর— কাজ করবে কি করবে মা। যে একদিন ছুটি দেয়া হল সেই একদিন একটু কষ্ট করে খোঁজ নেবে, অন্য কারখানায় শ্রমিকরা কি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। আচ্ছা এখন যেতে পার।

পরশু সকাল ন'টায় যারা কাজে যোগ দেবে না, তাদের চাকুরি বাতিল ধরা হবে। পরবর্তী সময়ে এই নিয়ে কোন রকম আর দরবার চলবে না।

টলম্যান বাংলা জানে না। সে কথা বলল ইংরেজীতে। সফিককে অনুবাদ করে দিতে হল। শ্রমিকরাও কথা বলছিল, সফিক তার ইংরেজী করে দিতে গেলে টলম্যান শুকনো গলায় বলল, ওরা কি বলছে তা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। আমি কি বলছি তুমি শুধু সেটাই ওদের কাছে পৌঁছে দেবে।

ঃ আমার মনে হয় ওদেব কথাও জানা থাকা ভাল।

ঃ শুধু তোমাব মনে হলে তো হবে না, আমাবো মনে হতে হবে। আমাব সে বকম মনে হচ্ছে না।

অফিসেব রামেশ্বরবাবুরও চাকবি চলে গেল। এমন যে ঘটবে কেউ কল্পনাও করে নি। রামেশ্বরবাবু নিরীহ নির্বিবোধী মানুষ। কাবো সাতেপাঁচে নেই। পানেব কৌটা নিয়ে অফিসে আসেন, একটু পর পর পান খান। পায়ের কাছে পিকদানীতে পিক ফেলেন। একদিন টলম্যান তাঁকে ডেকে পাঠাল। হাসিমুখে বলল, ভাল আছেন?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ দু'দিনের ক্যাজুয়েল নিয়েছিলেন, অসুখ সেবেছে?

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ কি অসুখ?

ঃ আমার বড় নাতনীব ?'মাশা হয়েছিল।

ঃ ও, আচ্ছা। নাতনীর অসুখ, আপনার নিজের কিছু না?

ঃ জ্বি না স্যার।

ঃ আপনি দু'দিনেব ছুটি নিয়েছিলেন, কিন্তু এসেছেন চাবদিন পর। বাডতি দু'দিনেব ব্যাপাবে কিছুই করেন নি। মনে হয় ভুলে গিয়েছিলেন।

ঃ জ্বি স্যার।

ঃ অফিস ন'টার সময় শুরু হয়, কিন্তু আপনি কোনদিন সাড়ে দশটার আগে আসতে পারেন না।

ঃ অনেক দূরে থাকি স্যার— রামপুরা।

ঃ এখন তো অফিসের বাস যায়, দূরে থাকলে অসুবিধা হবাব কথা নয।

ঃ এত সকালে ভাত রান্না হয় না স্যার।

ঃ আপনি বাড়ি যান খুব সকাল সকাল, ঠিক না?

রামেশ্ববাবু কোন জবাব দিলেন না। প্রচুর ঘামতে লাগলেন। টলম্যান বললেন, গত এক মাসে আপনি কখন অফিসে এসেছেন কখন গিয়েছেন সব লিখে রেখেছি। এই কাগজে আছে— নিন পড়ে দেখুন।

রামেশ্বরবাবু কাগজের উপরে চোখ বুলিয়ে গেলেন। কিছু পড়লেন বলে মনে হল না।

ঃ ঠিক আছে, এখন যেতে পারেন।

তিনি নিজের চেয়াবে এসে পানেব কৌটা খোলামাত্র টলম্যানের চিঠি চলে এল— যার বক্তব্য হচ্ছে, এই অফিস মনে করছে তোমার চাকরি অফিসের কল্যাণে আসছে না। সম্ভবতঃ

অফিসের কাজে তোমার মন বসছে না। কাজেই .....। সার কথা চাকরি শেষ।

রামেশ্বরবাবুর জন্যে সুপারিশ নিয়ে অনেকেই গিয়েছিল টলম্যানের কাছে। সেই অনেকের একজন হচ্ছে সফিক। টলম্যান হাসিমুখে বলেছে— দয়া দেখাবার কথা তুমি বলছ কেন? দয়া দেখাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি। এটা কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। আমরা এদেশে টাকা কামাতে এসেছি। এই সহজ সাধারণ সত্যটি তোমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পার ততই ভাল।

ঃ রামেশ্বরবাবু অনেকদিন এই কোম্পানীর জন্যে কাজ করেছেন। কোম্পানীর তাঁর প্রতি দায়িত্ব আছে।

ঃ উনি বিনা বেতনে চাকরি করেন নি, কাজেই কোম্পানীর দায়িত্বের প্রশ্নটা কেন আসছে? এই ব্যাপারটি নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না। তুমি অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ কবলে করতে পার। তোমাদের দেশের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা কোনটি বল তো? সুন্দরবনের কথা খুব শুনেছি, কি ভাবে যাওয়া যায়?

•

টলম্যানের নোটটি সফিকের সামনে। এগারোটা বাজতে এখনো দশ মিনিট। সফিক লক্ষ্য কবল তার মধ্যে এক ধবনের অস্বস্তি কাজ করছে। যার কোন কারণ নেই। সে চা দিতে বলল। না বললেও হত। টলম্যানের কাছে যাওয়া মানেই প্রথম এক কাপ চা খাওয়া। এই চা সে নিজে বানায়। পানি গবম করা থেকে দুধ চিনি মেশানো পর্যন্ত সে নিজেই করে। অধঃস্তন যে মানুষটির জন্যে চা বানানো হচ্ছে সে অস্বস্তি বোধ করে। এটাও বোধ হয় অফিস ম্যানেজমেন্টেব একটা অঙ্গ।

আজ টলম্যান চায়ের কথা বলল না। ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, দুপুরে আজ তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে। অসুবিধা আছে?

ঃ না স্যার।

ঃ কোন একটা ভাল রেস্তোরাঁয় যাই চল। তুমি কি মদ্যপান কর?

ঃ না।

ঃ আমিও করি না তবে কোন স্পেশাল অকেশন হলে খানিকটা করি।

ঃ আজ কি কোন স্পেশাল অকেশন?

ঃ না, স্পেশাল কিছু না। আব দশটা দিনের মত সাধারণ একটা দিন। ভাল রেস্তোরাঁ কি আছে এখানে? মেক্সিকান ফুড পাওয়া যায়?

ঃ না। তবে বড় হোটেলগুলি মাঝে মাঝে মেক্সিকান নাইট, স্পেনিশ নাইট এই সব করে, তখন পাওয়া যায়।

ঃ চল ভাল একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাওয়া যাক।

ঃ আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

ঃ হ্যাঁ বলব। খেতে খেতে বলব।

খেতে খেতে যে কথাগুলি টলম্যান বলল, সফিক তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

ঃ প্রায় দু'বছর আগে আগস্ট ফিফটিনথ এক ব্যাচ ওষুধ তৈরী হয়েছিল যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বাতিল করে দেয়া হয়, তোমার মনে আছে?

ঃ মনে নেই। কাগজপত্র দেখতে হবে।

ঃ কাগজপত্র আমার সঙ্গে আছে, তুমি দেখতে পার। তুমি ছিলে প্রডাকশান সুপারভাইজার, তোমার সই আছে।

ঃ সই থাকলে ঠিক আছে।

ঃ না, ঠিক নেই। কারণ কারখানার লগবুকে ঐ দিন ঐ তারিখে কোন ওষুধ তৈবীব কথা নেই। ঐ দিন কোন ওষুধ তৈরী হয় নি। নষ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।

সফিক তাকিয়ে রইল। টলম্যান ঠাণ্ডা গলায় বলল, তার তিন মাস পর তুমি আশি হাজাব টাকার একটা চেক ইস্যু করেছ স্টোরেব দু'টি এয়ারকুলাব কেনার জন্যে। সেই এয়াবকুলাব কেনা হয় নি, চেক কিন্তু ভাঙ্গানো হয়েছে।

সফিক কিছু বলল না। টলম্যান বলল, ঐ মাসেই তার দিন দশেকেব ভেতব 'মর্ডনা কাব' নামের এক এজেন্সীকে গাড়ী কেনা বাবদ অগ্রিম এক লক্ষ টাকা দেয়া হয় ফবেন কাবেন্সীতে— ছ'হাজার ডলার। মর্ডনা কার বলে কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। যে ঠিকানা দেযা হযেছে ঐ ঠিকানারও কোন অস্তিত্ব নেই। তুমি কিছু বলবে?

ঃ না।

ঃ কাগজপত্র সব নিয়ে এসেছি, দেখতে পার। প্রযোজন বোধ করলে আমাব সঙ্গে ডিসকাস কবতে পাব। তুমি কি দাযিত্ব অস্বীকাব কবতে চাও?

ঃ না। অস্বীকার করাব পথ কোথায?

ঃ দ্যাটস বাইট। অস্বীকাব করবাব পথ নেই। এটা একটি জটিল চক্রান্ত। আমাব ধাবণা তোমাকে ব্যবহাব করা হযেছে। চিংড়ি মাছটা খাও, ভাল বানিযেছে। এতটা স্পাইসি না করলেও পারতো। আমাব জিভ পুডে গেছে।

টলম্যান রুমালে মুখ মুছল। চেযারে ঝুলিযে রাখা কোটেব পকেট থেকে মুখবন্ধ একটা খাম বের করে এগিযে দিল সফিকেব দিকে। সহজ গলায বলল, সরি। আঁই হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল ওনলি টু বি কাইন্ড। তোমাকে আপাতত সাসপেন্ড কবা হল। পুবো তদন্ত হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার— তদন্ত হবে নিবপেক্ষ। চিঠি খুলে পড। হাতে নিযে বসে আছ কেন?

সফিক চিঠি খুলল, মূল সাসপেনসন অর্ডাবেব সঙ্গে পেনসিলে টলম্যানেব লেখা একটা নোট। নোটের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি খুবই দুঃখিত। এই ব্যাপাবটা সহজভাবে নিতে চেষ্টা কবো।

সফিক অসময়ে বাড়ি ফিবেছে। নীলুও সকাল সকাল এসেছে। তার শরীব ভাল লাগছিল না— ছুটি নিয়ে এসেছে। সফিককে দেখে হঠাৎ তাব মনটা ভাল হয়ে গেল। সে খুশী খুশী গলায় বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল বাসায় গিয়ে তোমাকে দেখব।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ। আচ্ছা চল না একটা কাজ করি। কোথাও বেড়াতে যাই। যাবে?

নীলুকে অবাক করে দিয়ে সফিক বলল, চল যাই। কোথায় যেতে চাও?

ঃ সত্যি যাবে?

ঃ হ্যাঁ যাব।

নীলু তৎক্ষণাৎ চুল বাঁধতে বসল, সফিক যাতে মত বদলাবার সময় না পায়। আগে এরকম হয়েছে— বেড়াতে যাবাব জন্যে রাজি হয়ে শেষ মুহূর্তে বলেছে, আজ না গেলে হয়

না? শরীবটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে।

সফিক পা ঝুলিয়ে খাটে বসেছে। তার মুখ দেখে মনের আঁচ পাওয়া যায় না। তবু নীলুর মনে হল সফিক কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত। নীলু বলল, শাহানার কাণ্ড শুনেছ?

ঃ না। কি কাণ্ড?

ঃ আজ জহিরকে নিয়ে কাঠমুন্ডু চলে গিয়েছে। কাউকে কিছু বলেনি। রফিক টুনী আর বাবলুকে নিয়ে ও-বাড়িতে গিয়ে শোনে, কিছুক্ষণ আগে এয়ারপোর্ট রওনা হয়েছে।

ঃ ভালই তো।

ঃ আমাদের কাউকে কিছু জানাল না কেন কে জানে। আসুক জহির, ওকে ধরব শক্ত করে।

ঃ টুনী, বাবলু ওরা কোথায়?

ঃ ছাদে। এখন ওদেব ডাকাডাকি করবে না। বেরুচ্ছি দেখলে আর রক্ষা থাকবে না, সঙ্গে যাবার জন্যে হৈ-চৈ শুরু করবে। তুমি কি এক কাপ চা খাবে?

ঃ না।

ঃ আচ্ছা শোন— তুমি কি কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত নাকি? কেমন যেন অন্যরকম লাগছে তোমাকে?

ঃ না, চিন্তিত না।

ঃ এই শাড়িতে কি আমাকে ভালো দেখাচ্ছে?

ঃ হ্যাঁ দেখাচ্ছে। কোথায় যাব কিছু ঠিক করেছ?

ঃ আমার এক বান্ধবীর বাসা আছে নয়া পল্টনে, যাবে?

ঃ চল যাই।

নয়া পল্টনের বাসায় নীলুর বান্ধবীকে পাওয়া গেল না। তারা ঘরে তালা দিয়ে কোথায় যেন গিয়েছে। নীলুর অসম্ভব মনখারাপ হল। সফিক বলল, অন্য কোথাও চল। তোমার আরো বান্ধবী আছে নিশ্চয়ই?

ঃ থাক, এমনি চল রাস্তায় একটু হাঁটি।

সফিক তাতেও রাজি। তারা কিছুক্ষণ হাটল। নীলু একটি মিষ্টি পান কিনল। রাস্তায় দু'টাকা করে বেলি ফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে। নীলুর একটা কিনতে ইচ্ছা হচ্ছে, আবার বলতে লজ্জাও লাগছে। আশ্চর্য কাণ্ড, নীলুকে অবাক করে দিয়ে সফিক বেলি ফুলওয়ালার দিকে এগিয়ে গেল। কত সামান্য ব্যাপার অথচ এতেই নীলুর হৃদয় আবেগে পূর্ণ হল। তার মনে হতে লাগল, এই পৃথিবীতে তার মত সুখী মেয়ে আর একটিও নেই। তার ইচ্ছে করছে সফিকের হাত ধরে হাঁটতে। আজকাল ছেলেমেয়েরা কেমন সুন্দর হাত-ধরাধরি করে হাঁটে। দেখতে ভাল লাগে। দিন বদলে যাচ্ছে। নতুন দিনের সবই যে ভাল তা না, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস ভাল।

সফিক বলল, আরো হাঁটবে?

ঃ তোমার হাঁটতে ভাল লাগছে না?

ঃ লাগছে।

ঃ জান আজ শরীরটা ভাল লাগছিল না বলে সকাল সকাল চলে এসেছিলাম, এখন এত

চমৎকার লাগছে।

সফিক হাসল।

হাসলে এই মানুষটাকে এত সুন্দর লাগে। অথচ এ লোকটি একেবারেই হাসে না।

নীলু নরম সুরে বলল, আমাব একটা কথা শুনবে?

ঃ হ্যাঁ, শুনব।

ঃ চল না, আজ আমরা বাইরে কোথাও খাই। কোন নিরিবিলি রেস্টুরেন্ট। যাবে?

ঃ চল যাওয়া যাক।

ঃ তোমাব মন থেকে ইচ্ছে না করলে থাক।

সফিক হেসে বলল, আমার ইচ্ছে করছে। টাকা আছে তো তোমার কাছে? আমাব মানিব্যাগ ফাঁকা।

রেস্টুরেন্টে বসে নীলুর একটু খারাপ লাগল। বেচারী টুনীকে ফেলে একা একা খাওয়া—সে হয়ত না খেয়ে বাবা-মা'র জন্য বসে থাকবে। নীলু বলল, কিছু খাওযার দরকার নেই, চল বাসায় চলে যাই। বরং দু'টা কোল্ড ড্রিংকের অর্ডাব দাও, নয়ত এরা আবার কি ভাববে।

সফিক মেনু দেখে দেখে একগাদা খাবারের অর্ডার দিল। নীলু বলল, এত কে খাবে?

ঃ টুনী খাবে। প্যাকেট করে বাসায় নিয়ে যাবে।

ঃ এটা ভালই করেছ, টাকায় শর্ট পড়বে না তো? আমাব কাছে তিনশ টাকা আছে।

ঃ শর্ট পড়লে কোট খুলে রেখে দেব।

বলতে বলতে সফিক শব্দ করে হাসল। খাবারগুলি চমৎকার। কিংবা কে জানে অনেকদিন পব বাইরে খেতে এসেছে বলেই হয়তো এত ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে এমন এলে হয়। তা কি আর সম্ভব হবে? কতগুলি টাকা আজ দিতে হবে—হিসেবের টাকা।

সফিক বলল, চুপচাপ খাচ্ছ কেন? কথা বল?

ঃ কি বলব?

ঃ মজার মজার কিছু গল্প বল।

সফিক কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, খেতে ইচ্ছা করছে না।

ঃ কেন?

ঃ জানি না। শরীরটা বোধহয় খারাপ।

ঃ শরীর খারাপ, তাহলে এলে কেন?

ঃ তোমার সঙ্গে কখনো আসা হয় না, সুযোগ হল একটা।

নীলু দেখল সফিক আবাব হাসছে। কি চমৎকারই না তাকে লাগছে। গ্রে কালারের এই কোটটায় কি সুন্দর মানিয়েছে। নীলুর খুব ইচ্ছা করছে সফিকের কোলে একটা হাত রাখে। মজার কোন একটা গল্প বলে সফিককে আবার হাসিয়ে দেয়। তাব চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে।

শাহানার এই প্রথম প্লেনে চড়া।

আকাশে উড়বার মত বিরাট একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে কিন্তু তার জন্যে যতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত ততটা উত্তেজিত সে হচ্ছে না। অথচ প্রথম ট্রেনে চড়ার উল্লাস তার এখনো মনে আছে।

প্রথম প্লেনে চড়া সেই রকমই তো হওয়া উচিত। তা না, কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে। তার সবচে মনখারাপ হল প্লেনের সাইজ দেখে। এত ছোট? সত্যি সত্যি পাখির মত লাগছে। শাহানা বলেই ফেলল, প্লেন এত ছোট হয়?

জহির হাসতে হাসতে বলল, ছোট কোথায়, দু'শ ত্রিশজন যাত্রী যেতে পারে। বেশ বড়। দূর থেকে দেখছ তো, তাই এরকম লাগছে।

খুব দূর থেকে তারা দেখছে না। বসে আছে ডিপারচার লাউঞ্জে। কি একটা সমস্যা হয়েছে, প্লেন ছাড়তে এক ঘণ্টা দেরী হবে। সময় কাটানোর জন্যে চা-টা খাচ্ছে যাত্রীরা। জহির বলল, কিছু খাচ্ছ না কেন শাহানা?

ঃ ভাল লাগছে না। ঢোক গিলতে পারছি না।

ঃ সেকি? টনসিলাইটিস নাকি?

ঃ জানি না। কাঠমুন্ডু না গেলে কেমন হয় বল তো? আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না।

ঃ একবার পৌঁছে দেখ, ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না। তোমার কি প্লেনে চড়তে ভয় লাগছে?

ঃ হুঁ।

ঃ ওটা কাটাতে পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। প্লেন ভ্রমণ হচ্ছে পৃথিবীতে সবচে নিরাপদ ভ্রমণ।

শাহানা বলল, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

ঃ দু'টা প্যারাসিটামল খাও—ব্যাগে আছে না? আমি পানি এনে দিচ্ছি।

শুধু পানি না, জহির একটা পানও নিয়ে এসেছে। মাইকে বলা হচ্ছে, ফ্লাইট নাম্বার বি জি ২০৭, কাঠমাণ্ডুগামী যাত্রীদের অনুরোধ করা যাচ্চে ..... অদ্ভুত এক ধরণের উচ্চারণ। যেন অর্ধেক যন্ত্রে একজন মানুষ কথা বলছে। শাহানার মনে হল, এই কথাগুলি সহজ স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় না?

ঃ তোমার গা তো বেশ গরম গরম মনে হচ্ছে শাহানা!

ঃ জ্বর আসছে বোধহয়।

ঃ তোমার খুব বেশী খারাপ লাগলে না হয় বাদ দেয়া যাক। এখন টিকিট ক্যানসেল করলে অবশ্যি পয়সাকড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না।

শাহানা যন্ত্রের মত বলল, ক্যানসেল করতে হবে না—চল যাই।

শাহানা বসেছে জানালার পাশে কিন্তু একবারও জানালা দিয়ে তাকাতে ইচ্ছা করছে না। তার কেবলি ভয়, এই বুঝি সে বমি করে ফেলবে। বমি আসার আগে মুখে যেমন টক টক স্বাদ চলে আসে সে রকম চলে এসেছে। তার সামনে এক ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছেন, কি কুৎসিত কটু গন্ধ। শাহানার ইচ্ছে করছে এই টেকো লোকটির গালে ঠাস করে একটা চড় মারতে।

জহির বলল, খুব বেশী খারাপ লাগছে?

ঃ হুঁ।

ঃ প্রায় এসে গেছি। প্লেন নামতে শুরু করেছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে না?

ঃ হুঁ, করছে।

ঃ ঢোঁক গেলো, কমে যাবে।

ঃ ঢোঁক গিলতে পারছি না।

ঃ তাকাও জানালা দিয়ে। দ্যাখো প্লেনেব চাকা নামছে। তুমি তো কিছুই দেখছ না।

শাহানা ক্লান্ত গলায় বলল, পানি খাব।

জহির হাত-ইসারায় একজন এয়ার হোস্টেসকে ডাকল। কোন লাভ হল না। এক্ষুণি প্লেন নামবে। ওরা তাই নিয়েই ব্যস্ত। নো স্মোকিং সাইন বার বার জ্বলছে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সমানে সিগারেট টানছে। জহির এয়ার সেইফটির উপর একটি প্রবন্ধ পড়েছিল নিউজ উইকে। সেখানে বলা হয়েছে—এশিয়া মহাদেশের বিমানযাত্রীরা বিমান-ভ্রমণের আইন কানুন ভঙ্গ করে এক ধরনের মজা পায়। যে সময় সিট-বেল্ট বাঁধার কথা সে সময় সিট-বেল্ট খুলে ফেলে। নো স্মোকিং সাইন দেখলে তাদেব সিগারেটের পিপাসা পেয়ে যায়। তারা সবচে পছন্দ করে বিমানের করিডরে হাঁটতে যেন এটা প্লেন নয়—বাস।

প্লেন বেশ বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে ভূমি স্পর্শ করল। জহির হাসিমুখে বলল, এসে গেছি শাহানা। হোটেলে পৌঁছেই ডাক্তার ডাকব।

বড় হোটেলের নিয়মকানুনগুলি বেশ চমৎকার। দশ মিনিটের মাথায় ডাক্তার এসে উপস্থিত। কুড়ি মিনিটের মাথায় এলেন খোদ হোটেলের ম্যানেজার। পরনে হাফপ্যান্ট, কড়া লালরঙের স্পোর্টস শার্ট। মুখভর্তি হাসি। সে হাসিমুখে যে কথা বলল তা শুনে জহিরের মুখ শুকিয়ে গেল। রুগিণীকে হোটেলে রাখা যাবে না। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। জহির বলল, পেশেন্টকে হোটেলে রেখে চিকিৎসা হবে না?

ঃ না।

ঃ কেন?

ঃ কারণ হোটেল কোন হাসপাতাল নয়।

ঃ তাহলে আমি অন্য কোন হোটেলে চেষ্টা করতে চাই যেখানে আমাকে আমায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে দেবে।

ঃ নতুন বিয়ে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ হানিমুন?

ঃ হ্যাঁ বলতে পার—লেট হানিমুন।

ঃ আমার সমস্ত সহানুভূতি তোমার জন্যে। কিন্তু আমার উপদেশ শোন। আমি যে ব্যবস্থা নিচ্ছি তা আমাকে নিতে দাও। বিশ্বাস কর আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আমি যত ঠাণ্ডা মাথায় একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারি, কোন রাষ্ট্রপ্রধানও তা পারেন না। এ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যাও, তাকে ভর্তি করিয়ে ফিরে এসো।

জহির চুপ করে রইল। ম্যানেজার হাসিমুখে বলল, আমার কথায় আপসেট হচ্ছ নাকি? আমার পরামর্শ কিন্তু চমৎকার। স্ত্রীকে হাসপাতালে দিয়ে ফিরে এসে একটা হট শাওয়ার নাও এবং দু'টি বিয়ার খাও।

জহিরের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। শাহানা প্রায় অচেতন। জ্বর একশ তিন পয়েন্ট পাঁচ। জহির শুকনো গলায় বলল, খুব খারাপ লাগছে?

শাহানা কাতর গলায় বলল, খুব খারাপ লাগছে।

নেপালের হাসপাতালটির অবস্থা খুবই মলিন। নোংরা অপরিচ্ছন্ন, ফিনাইলের গন্ধের বদলে কেমন একটা টক গন্ধ। একটা ডেড বডি পড়ে আছে বারান্দায়। কেউ তার মুখ ঢেকে দেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। নীল রঙ্গের ডুমো ডুমো মাছি মৃত মানুষটির উপর ভন ভন করে উড়ছে। জহিরের অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। ডাক্তার ভদ্রলোক হেসে ইংরেজীতে বললেন, অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলেন মনে হচ্ছে?

ঃ তা কিছু ঘাবড়ে গেছি তো বটে।

ঃ বাংলাদেশের হাসপাতালগুলি কি এর চেয়ে ভাল?

ঃ হ্যাঁ ভাল, অনেক ভাল।

ঃ আমি যখন ছিলাম তখন কিন্তু ভাল ছিল না।

ঃ আপনি বাংলাদেশে ছিলেন?

ঃ হ্যাঁ। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছি। আমাদের দেশে মেডিকেল কলেজ নেই। ডাক্তারী পড়তে হলে আমাদের বাইরে যেতে হয়।

রুগী ভর্তি ব্যাপারটি অতি দ্রুত শেষ হল। শাহানাকে নিয়ে যাওয়া হল কেবিনে। জহির বলল, আমি কি ঐ কেবিনে রাতটা কাটাতে পারি?

ঃ না পারেন না।

ঃ হাসপাতালে কোথাও অপেক্ষা করতে পারি?

ঃ তা নিশ্চয়ই পারেন। আমার এই ঘরেই বসতে পারেন। তার কি কোন প্রয়োজন আছে? আপনার কষ্ট হবে—প্রচণ্ড মশা।

ঃ না, আমার কষ্ট হবে না।

ঃ আপনার রাতের খাওয়া কি হয়েছে?

ঃ না, হয়নি।

ঃ আমি কিছুক্ষণ পর পাশের একটি হোটেলে খেতে যাব। পাশেই একটা ভাল হোটেল

আছে। ইচ্ছে করলে আপনি আসতে পারেন।

জহির বলল, তার আগে জানতে চাই আমার স্ত্রীর চিকিৎসা কি শুরু হয়েছে?

: এখনো শুরু হয়নি, হবে। থ্রোট কালচার করা হচ্ছে। হানিমুনে এসেছেন, তাই না?

: হ্যাঁ।

: আপনার মনে ভয় ঢুকে গেছে যে হয়তো বা আপনাকে একা ফিরতে হবে, তাই না?

: হ্যাঁ, তাই।

: ভয় পাবেন না, খুবই সামান্য ব্যাপার।

ডাক্তার ডান হাতে জহিরের কাঁধ স্পর্শ করলেন। জহিরের মনে যে ভয় ভয় ভাব ছিল তা পুরোপুরি কেটে গেল। সে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিল—সারারাত এখানে বসে মশার কামড় খাওয়ার কোন মানে হয় না। হোটেলে ফিরে একটা শাওয়ার নেয়া যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি যাওয়া হল না। জহির রাতটা হাসপাতালেই কাটিয়ে দিল। চায়ের একটি হোটেলের খোঁজ ডাক্তার সাহেবই করে দিলেন। প্রচুর দুধ ও গরমমসলা দেয়া অদ্ভুত ধরনের চা ঝাঁঝালো, খানিকটা তেতো ধরনের স্বাদ। খেতে ভালই লাগে।

শাহানাকে দেখতে গেল সকাল ন'টায়। জ্বর কমে গেছে। তবে এক রাতেই কেমন রোগা লাগছে শাহানাকে। গালের হাড় বেরিয়ে গেছে। চোখের নীচে কালি। জহির বলল, কি অবস্থা?

শাহানা হাসল।

: এখন কি একটু ভাল লাগছে?

: লাগছে।

: একটু ভাল, না অনেক ভাল?

: অনেক ভাল।

: তাহলে একটু হাস, আমি দেখি।

শাহানা হাসল। জহির পাশেই চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, আমি সারারাত হাসপাতালেই ছিলাম।

: জানি।

: কি ভাবে জানলে? কেউ বলেছে?

: না, কেউ বলেনি। আমার মনে হয়েছে।

: এখন আমি চলে যাব, আবার বিকেলে আসব।

: আচ্ছা।

: তোমার জন্যে কিছু ভিউকার্ড নিয়ে এসেছি। শরীরটা যদি ভাল লাগে তাহলে কার্ডগুলিতে নাম ঠিকানা লিখে রেখো, বিকেলে আমি পোস্ট করে দেব।

: আচ্ছা।

: অসুখের কথা কিছু লেখার দরকার নেই। সবাই চিন্তা করবে। অবশ্যি অসুখ তেমন কিছু হয়ও নি। থ্রোট ইনফেকশন। ডাক্তার সাহেব বললেন, পরশুর মধ্যে রিলিজ করে দিতে পারবেন। পরশু পর্যন্ত একটু কষ্ট কর।

: আমার কষ্ট হচ্ছে না।

: তোমার এখান থেকে হিমালয় দেখা যায়। উঠে বসে জানলা দিয়ে তাকাও—হিমালয়

দেখবে।

ঃ আমার হিমালয় দেখতে ইচ্ছা করছে না।

ঃ ইচ্ছা না করলেও দেখ। এসো তোমাকে হাত ধরে দাঁড় করাই—ঐ যে চূড়াটা দেখছ না, ওর নাম অন্নপূর্ণা। সুন্দর না?

ঃ হ্যাঁ, সুন্দর।

ঃ তুমি সুস্থ হয়ে উঠলেই তোমাকে পোখরা বলে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। আমার মতে পোখরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।

শাহানা হাই তুলল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল।

ঃ তোমার ঘুম পাচ্ছে শাহানা?

ঃ হ্যাঁ পাচ্ছে।

ঃ তাহলে ঘুমাও। ইন্টারেস্টিং একটা এ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল, তাই না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ঢাকায় গিয়ে গল্প করতে পারবে। তুমি ঘুমাও, আমি পাশে বসে আছি।

ঃ তোমাকে বসতে হবে না, তুমিও বিশ্রাম কর। রাত জেগে যা বিশ্রী তোমাকে দেখাচ্ছে!

ঃ খুব বিশ্রী?

ঃ হ্যাঁ, খুব বিশ্রী।

শাহানা মিষ্টি করে হাসল। হাসপাতালের ধবধবে সাদা বেডে কি সুন্দর তাকে লাগছে। মুখের ওপর তেরচা করে রোদের আলো এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে এটি স্বপ্নে দেখা একটি ছবি। বন্দী রাজকন্যা শুয়ে আছে—এক্ষুণি জেগে উঠবে।

সমস্তটা দিন জহির ঘুমিয়ে কাটাল। দুপুরে উঠে দু'টি স্যাণ্ডউইচ মুখে দিয়ে আবার ঘুম। সেই ঘুম ভাঙ্গল সন্ধ্যায়। তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বেচাবী শাহানা! অপেক্ষা করে আছে নিশ্চয়ই। খুবই অন্যায় হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ঘুমিয়ে পড়াটা উচিত হয়নি। সন্ধ্যার পর এরা ফিমেল ওয়ার্ডে পুরুষদের যেতে দেয় না। নিয়মটি হয়ত বিদেশীদের জন্য, কারণ কাল বেশ কিছু পুরুষদের সে ঢুকতে দেখেছে—এরা সবাই যে হাসপাতালের কর্মচারী তাও মনে হয় নি।

গতকালের ডাক্তার ভদ্রলোকের নাম জানা হয়নি। আজ হয়ত তার ডিউটি নেই—পরপর দু'রাত নাইট ডিউটি না থাকারই কথা। আজ হয়ত আছে বদমেজাজী কোন ডাক্তার যে কোন কথাই বলবে না।

আগের ডাক্তারকেই পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি রুগিণীর কাছে যাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। কয়েকদিন আগে ফিমেল ওয়ার্ড নিয়ে লেখা নানান কেচ্ছাকাহিনী কোন এক কাগজে ছাপা হয়েছে, তারপর থেকে এই কড়াকড়ি। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি বসুন, আমি খবর এনে দিচ্ছি, তবে আপনার স্ত্রী বেশ সুস্থ—এইটুকু বলতে পারি। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনি বসুন, আমি আসছি।

ভদ্রলোক মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এলেন। হাসিমুখে বললেন, কাল সন্ধ্যায় আপনার স্ত্রীকে রিলিজ দেয়া যেতে পারে। জ্বর রেমিশন হয়েছে।

ঃ থ্যাঙ্ক ইউ।

ঃ এই ভিউ কার্ডগুলি তিনি দিলেন। আপনাকে পোস্ট করতে বলেছেন।

চারটা ভিউ কার্ড। প্রতিটিতেই কয়েক লাইনের চিঠি। নীলুর জন্য একটি, শারমিনের জন্য একটি, বাবা ও মায়ের জন্য একটি এবং চতুর্থটি আনিসের জন্য। জহির বিস্মিত হয়ে আনিসের ভিউ কার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে গোটা গোটা হরফে লেখা—"আনিস ভাই, আমার খুব অসুখ করেছে।"

লম্বা একটা মানুষ বসার ঘরে।

কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। গায়ে হলুদ রঙের চাদর। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। লোকটা বসে আছে মূর্তির মত। যেন সে আসলেই একটা মূর্তি—মানুষ নয়।

টুনী অনেকক্ষণ ধরেই লোকটিকে দেখছে। একবার তার চোখের উপর চোখ পড়ল। তবু লোকটা নড়ল না। টুনী সাহসে ভর করে বলল, আপনি কে ?

লোকটি হেসে ফেলল। হাত-ইশারা করে কাছে ডাকল। টুনী পর্দার আড়াল থেকে বেরুল না। তার কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। লোকটি বলল, তোমার নাম টুনী?

হ্যাঁ। আপনার নাম কি?

আমার নাম সোবাহান। তোমাদের বাসায় বাবলু থাকে?

হ্যাঁ থাকে।

তাকে ডেকে আনতে পারবে?

না, পারব না। বাবলু ছাদে, আমি ছাদে যাই না।

যাও না কেন? ছাদে কি ভূত আছে?

আছে। দিনের বেলা থাকে না—রাতে আসে।

তাই নাকি?

হু। রাতের বেলা এরা ছাদে লাফালাফি করে।

তুমি শুনেছ?

হু।

ভেতর থেকে নীলু বলল, কার সঙ্গে কথা বলছিস রে?

টুনী বলল, সোবাহানের সঙ্গে।

এই কথায় লোকটি শব্দ করে হেসে উঠল। নীলু পর্দার ফাঁক দিয়ে বসার ঘরের দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে বিস্ময়। সে কঠিন গলায় বলল, আপনি কি মনে করে?

ঃ তোমাদের দেখতে এলাম। ভাল আছ নীলু?

ঃ আমাদের দেখতে এসেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ দুলাভাই, আপনার অসীম দয়া। আমরা ধন্য হলাম।

ঃ কেন ঠাট্টা করছ নীলু?

ঃ ঠাট্টা? ঠাট্টা করব কেন? আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করবার মত সাহস কি আমার আছে? আপনি হচ্ছেন মহাপুরুষ ব্যক্তি। সাধারণ প্রেম ভালবাসা আপনাকে আকর্ষণ করে না। আপনার ছেলে কোথায় আছে কি করছে তা জানারও আপনার আগ্রহ নেই। আপনার মত মহাপুরুষকে ঠাট্টা করব?

ঃ বস নীলু—বস আমার সামনে।

নীলু বসল না। তার রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। সোবাহান বলল, একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে মনে হয় হাঁপিয়ে গেছ।

ঃ চা খাবেন?

ঃ যদি দাও তাহলে খাব।

নীলু রান্নাঘরে আসতে আসতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এই লোকটির সঙ্গে রাগারাগি করা অর্থহীন। রান্নাঘরের সামনে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। সে কৌতূহলী গলায় বলল, কার সঙ্গে কথা বলছিলে ভাবী?

ঃ কারো সঙ্গে না।

ঃ স্বগত ভাষণ? কিন্তু আমি যেন পুরুষের গলা শুনলাম?

ঃ আমার বড় দুলাভাই।

ঃ বাবলু সাহেবের গ্রেট ফাদার?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আমি কি উনার সঙ্গে কথা বলতে পারি? মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার!

ঃ এটা আবার কি ধরণের কথা রফিক? তোমার কথা বলতে ইচ্ছা করলে তুমি কথা বলবে।

ঃ মেজাজ মনে হচ্ছে—নট গুড?

নীলু রান্নাঘরে ঢুকল। শুধু চা দিতে ইচ্ছে করছে না অথচ ঘরে কিচ্ছু নেই। বিস্কিটের টিনে আধখানা বিস্কিট, সেখানে পিঁপড়া ধরেছে। অথচ দুলাভাইকে শুধু চা দিতে ইচ্ছা করছে না। নীলু আনিসের খোঁজে দোতলায় গেল। আনিস নেই। বাবলু ছাদে একা একা কি যেন করছে। হাত পা নাড়ছে—নিজের মনে বিড় বিড় করছে।

ঃ বাবলু?

ঃ কি?

ঃ কতবার বলেছি, জ্বি বলবে। একটা জিনিস ক'বার বলতে হয়? যাও নীচে যাও। তোমার আব্বা এসেছে। এক্ষুণি নীচে যাও। এই সার্টটা বদলে একটা ভাল সার্ট পরে যাও।

একটা মানুষ নেই যাকে পাঠিয়ে দোকান থেকে কিছু আনাবে। এতদিন পর এসেছে মানুষটা, শুধু চা খাবে? নিজে গিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়? সফিক বাসায় নেই, নয়ত সফিককে বলা যেত। দুলাভাইয়ের সঙ্গে একটু আগেই খুব কড়া কড়া কথা সে বলেছে। মনটা এই জন্যেই বেশী খারাপ লাগছে। এই দুঃখী মানুষটিকে সে খুব পছন্দ করে।

বসার ঘরে রফিক খুব জমিয়ে গল্প করছে। সোবাহান কিছু বলছে না। তবে তার মুখও হাসি হাসি। রফিক বলল, তারপর ভাই, কিছু মনে করবেন না একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি— আপনি করেন কি?

: কিছুই করি না।

: বলেন কি? কিছু না করলে আপনার চলে কি করে? আপনি কি সন্ন্যাসী? অবশ্যি সন্ন্যাসীরাও তো কিছু একটা করেন—ভিক্ষা করেন।

: আমি মানুষের হাত দেখে ভাগ্য বলি।

: ভাগ্য বলেন?

: হ্যাঁ।

: আপনি একজন পামিস্ট?

: জ্বি।

: বিশ্বাস করেন এসব?

: জ্বি না। বিশ্বাস না করেও তো আমরা অনেক কিছু করি।

: উদাহরণ দিন।

: দেশের কিছু হবে না এই জেনেও আমরা দেশের জন্যে জীবন দিয়ে দেই। দেই না?

: গুড। আপনি তো ভাই ফিলসফার কিসিমের মানুষ। নিন আমার হাত দেখে দিন।

: আজ থাক, আরেকদিন দেখব।

: অসম্ভব, আজই দেখতে হবে। হাত দেখে শুধু বলুন— টাকাপয়সা হবে কিনা। আর কিছু জানতে চাই না, সুখ-দুঃখের কিচ্ছু আমার দরকার নেই, টাকা থাকলেই হল।

সোবাহান রফিকের হাতের দিকে তাকাল। মৃদু স্বরে বলল, বুধের ক্ষেত্র প্রবল। চন্দ্র শুভ। মঙ্গলে আছে ত্রিভূজ চিহ্ন। আপনি অত্যন্ত ধনবান হবেন, তবে তা নিজের চেষ্টায় হবে না। হৃদয়-রেখা থেকে একটি রেখা ভাগ্যরেখাকে স্পর্শ করেছে— কাজেই আপনি ধনবান হবেন স্ত্রী-ভাগ্যে।

: বেইজ্জতি কথা বলছেন ভাই—স্ত্রী-ভাগ্যে ধন?

: হ্যাঁ তাই।

: একটু আগে বললেন, আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন না কিন্তু এখন এত জোরের সঙ্গে কথা বলছেন কেন?

: জোর দিয়ে বলাবই নিয়ম। যে হাত দেখাতে আসে সে এতে মনে করে এই লোক বড় জ্যোতিষী।

: তার মানে এটা হচ্ছে আপনার একটা ব্যবসায়িক চাল?

: হ্যাঁ তাই।

: তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি যে নিজের ভাগ্যেও আমি বড়লোক হতে পারব?

: না, পারবেন না। আপনার যা হবে স্ত্রীভাগ্যে।

: আরে আপনাকে নিয়ে তো মহামুশকিল!

: হাতে যেমন দেখছি তেমনি বলছি।

: এক মিনিট দাঁড়ান, আমার স্ত্রীর হাতটা দেখে দিন। পালিয়ে যাবেন না যেন।

ঃ রফিক সাহেব, আজ থাক।

ঃ অসম্ভব। আজই দেখবেন। এক্ষুণি নিয়ে আসছি। যাব আর আসব— এক মিনিট।

শারমিন ভেতরের বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে। গতকাল সকালে সে একটি চিঠি পেয়েছে। আমেরিকা থেকে পাঠিয়েচে সাব্বির। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে, নতুন জীবন কেমন লাগছে তাই জানতে চাওয়া। এবং সে যে সুইডেনে একটি চাকরি পেয়েছে এই খবর জানানো। চিঠি পাওয়ার পর থেকে শারমিন অস্বাভাবিক গম্ভীর। রাতে রফিকের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। রফিক হাত ধরতেই ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে— হাত ধরবে না!

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, হাত ধরব না কেন? এই হাত কি আমেরিকায় বন্ধক?

কি কুৎসিত কথা! এর জবাব দিতে ইচ্ছা করেনি। আজ বারান্দায় একা একা বসে তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। কাঁদতে পারলে মন হালকা হত, কিন্তু বাড়িটা এত ছোট যে কাঁদবার জন্যে গোপন জায়গাও নেই।

ঃ এই যে শারমিন, এখানে বসে আছ? আস আমার সঙ্গে।

ঃ কোথায় যাব?

ঃ এক গ্রেট পামিস্ট এসেছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব ফড়ফড় করে বলে দেয়। তাকে হাত দেখাবে।

ঃ আমাকে বিরক্ত করবে না। একা থাকতে দাও।

ঃ সে কি? তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জানতে চাও না?

ঃ না।

ঃ জানতে চাও না যে স্বামীর সঙ্গে জীবন কেমন কাটবে?

ঃ কেমন কাটবে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তার জন্যে জোতিষীকে হাত দেখাতে হবে না।

ঃ তোমার হয়েছে কি বল তো?

ঃ কিছুই হয়নি।

ঃ এটা তো সত্যি বললে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমেরিকার চিঠি আসার পর থেকেই মেজাজ ফোরটি নাইন।

শারমিন কড়া গলায় বলল, কি হয়েছে সত্যি জানতে চাও?

ঃ হ্যাঁ, চাই।

ঃ তাহলে এস আমার সঙ্গে, ঘরে এস। এখানে বলব না।

ঃ কি এমন কথা যে মন্দিরের ভেতর গিয়ে বলতে হবে! চল যাই।

শারমিন দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলল, বস এখানে।

রফিক বসল। তার বেশ মজা লাগছে। শারমিনের প্রচণ্ড রাগের কারণ ধরতে পারছে না। রাগে শারমিনের মুখ লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।

ঃ তুমি আমেরিকার চিঠিটা গতকাল আমাকে দিয়েছ।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কিন্তু তার আগে খাম খুলে তুমি চিঠি পড়েছ।

ঃ মুখবন্ধ খামই তোমাকে দিয়েছি।

ঃ তা দিয়েছ। কিন্তু খাম খুলে চিঠি পড়ে তারপর আবার মুখ বন্ধ করেছ।

ঃ এ রকম সন্দেহ হবার কারণ?

ঃ কারণ খামের মুখ ভাত দিয়ে বন্ধ করা ছিল। আমেরিকা থেকে কেউ ভাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে খাম পাঠায় না।

রফিক চুপ কবে রইল। কথা সত্যি। শারমিন বলল, আমাব চিঠি তুমি কেন পড়লে?

ঃ হ্যাজবেন্ড তার স্ত্রীর চিঠি পড়তে পারবে না?

ঃ নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু চুরি করে না।

ঃ আমার ভুল হয়েছে, এ রকম আর হবে না।

শারমিন ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। শোকের এমন তীব্র প্রকাশ রফিক আগে দেখেনি, তার লজ্জার সীমা রইল না। সে নরম স্বরে বলল, শোন শারমিন, এই যে— তাকাও আমার দিকে।

ঃ প্লীজ, আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

ঃ কথা না বলে আমি থাকতে পারি না।

শারমিন জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেল।

বাবলুকে কোথাও পাওয়া গেল না। ছাদে ছিল এখন নেই। আশপাশেব কোন বাড়িতেও নেই। টুনী খুঁজে এসেছে।

সোবাহান বলল, থাক বাদ দাও। আর এক দিন না হয় আসব।

নীলু বলল, ঢাকাতেই থাকেন তো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তাহলে না হয় ছেলের জন্যে আরেকবার কষ্ট করে আসুন। দেখে যান সে কেমন আছে।

ঃ সে ভালই আছে। ওকে নিয়ে আমি ভাবি না।

ঃ কাউকে নিয়েই ভাবেন না। এটা কোন গুণ না দুলাভাই।

সোবাহান তার ঝুলির ভেতরে হাত দিয়ে প্লাস্টিকের সস্তা ধরণের একটা খেলনা বের করে এগিয়ে দিল টুনীর দিকে। নীলু বলল, টুনীকে দিতে হবে না দুলাভাই। বাবলুর জন্যে এনেছেন—রেখে দিন, বাবলুকেই দেবেন।

সোবাহান হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, এইখানে তুমি একটা ভুল করলে নীলু। এটা আমি টুনীর জন্যেই এনেছি। দেখ এটা একটা পুতুল। মেয়েরাই পুতুল খেলে। বাবলুর জন্যে আমি একটা পিস্তল এনেছি। নাও এটা, ওকে দিও।

নীলু বেশ লজ্জা পেল। সোবাহান হাসছে। নীলুর এই লজ্জা সে যেন উপভোগ করছে।

ঃ যাই নীলু।

ঃ আমার কথায় কিছু মনে করবেন না দুলাভাই।

ঃ যাদের আমি পছন্দ করি তাদের খুব কড়া কথাও আমার ভাল লাগে।

সোবাহান রাস্তায় নেমে গেল। নীলু অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার খুব খারাপ লাগছে। শুধু শুধু এতগুলি কঠিন কথা বলা হল। সে কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না। ভেতর থেকে মনোয়ারা ডাকছেন, বৌমা, ও বৌমা?

কোন্ বৌকে ডাকছেন কে জানে? দুই ছেলের বৌকেই তিনি বৌমা ডাকেন—বড় বৌমা বা ছোট বৌমা নয়। কিন্তু একজনের জায়গায় অন্যজন এলে রেগে আগুন হন। বিরক্ত গলায় বলেন—তোমাকে তো ডাকিনি বৌমা, তুমি এসেছ কেন?

এখন তিনি কাকে ডাকছেন কে জানে? নীলু ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকল। মনোয়ারা বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর মুখ থমথম করছে।

ঃ আমাকে ডেকেছেন মা?

ঃ হ্যাঁ। কে এসেছিল?

ঃ আমার বড় দুলাভাই, বাবলুর বাবা।

ঃ আমাকে ডাকলে না কেন? আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না যে? নাকি আমাকে তোমরা মানুষ বলে মনে কর না?

ঃ আপনি শুয়েছিলেন তাই।

ঃ শুয়েছিলাম— মরে তো যাই নি? নাকি তোমার ধারণা মরে গিয়েছি?

ঃ ছিঃ মা, কি বলছেন এসব?

ঃ আত্মীয়-স্বজন এলে দেখাসাক্ষাতের একটা ব্যাপার আছে।

ঃ তা তো আছেই।

ঃ ঠিক আছে মা, তুমি যাও। বেশী দিন বেঁচে থাকার এইটাই সমস্যা। কেউ মানুষ মনে করে না। মনে করে ঘরের আসবাবপত্র। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ। দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও?

মনোয়ারা রাগ করে রাতের বেলা ভাত খেলেন না।

রফিকের আজ হঠাৎ করে তিনশ টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। বায়োডাটা দিয়ে চাকরির দরখাস্ত করবে জাপানের এক ফার্মে। দরখাস্তের সঙ্গে ওদের দশ ডলার পাঠাতে হবে। দশ ডলার কেনার জন্যেই টাকাটা দরকার। ব্যাপারটা হয়তো পুরোপুরি ভাঁওতা। তবে কোম্পানীটা বিদেশী। বিদেশীরা এতটা চামার নাও হতে পারে। হয়ত সত্যি সত্যি কিছু হবে।

মুশকিল হচ্ছে তিনশ' টাকার যোগাড় এখনো হয়নি। নীলুর কাছে চেয়েছিল, নীলু দিতে পারেনি। পঞ্চাশ টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে—বেতন পেলে বাঁকিটা নিও। টাকা আমার কাছে কিছু ছিল—বাবা নিয়ে নিয়েছেন।

রফিক বিরক্ত হয়ে বলেছে—বাবার আবার টাকার দরকার কি?

ঃ তোমার টাকার দরকার থাকলে তাঁরও থাকতে পারে।

ঃ তাঁর পেনশনই আছে।

ঃ পেনশনের টাকার সবটা তো মাকে দিয়ে দিতে হয়।

রফিক রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেল। শারমিনের কাছে হয়ত কিছু টাকা আছে। কিন্তু এখন চাওয়া যাবে না। কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ। সামান্য এক চিঠি নিয়ে এই কাণ্ড। কতদিন এরকম

চলবে কে জানে। বফিকেব মাঝে মাঝে মনে হয, এবকম আবেগপ্রবণ একটি মেযেকে বিযে কবে সে বোধহয় ভুল কবেছে। তাব জন্য দবকাব ছিল হাসিখুশী ধবণেব একটি মেযে যে খুব বাগ কববে আবাব পবমুহূর্তেই সব কিছু ভুলে হেসে ফেলবে। বাত একটাব সময ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে যাব আপত্তি থাকবে না। কিন্তু শাবমিন মোটেই সে বকম নয।

বফিক শেষ পর্যন্ত ঠিক কবল সফিকেব অফিসেই যাবে। ভাইযাব অফিসে গিযে টাকা চাওযাব একটা সুবিধা আছে। ভাইযা কখনো না বলবে না। সঙ্গে টাকা না থাকলে বলবে ঘণ্টাখানেক পবে আয। এই এক ঘণ্টা কোন না কোন ভাবে সে ম্যানেজ কববেই।

বফিকেব জন্যে বড বকমেব বিস্ময অপেক্ষা কবছিল। সফিক অফিসে নেই। যে ঘবটায বসতো সে ঘবে অপবিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি বিবক্ত মুখে বললেন, কাকে চাই?

ঃ সফিক সাহেবকে, এখানে বসতেন।

ঃ তাঁব সঙ্গে আপনাব কি দবকাব?

ঃ উনি আমাব বড ভাই।

ঃ ও আচ্ছা আচ্ছা আসুন আসুন বসুন এখানে।

ভদ্রলোক অতিবিক্ত বকমেব ব্যস্ত হযে পডলেন। সরু গলায বললেন, আপনাব ভাইযেব সঙ্গে আপনাব যোগাযোগ নেই?

ঃ যোগাযোগ থাকবে না কেন? আমবা তো একসঙ্গেই থাকি।

ঃ ও, আচ্ছা।

ভদ্রলোক খুবই অবাক হলেন। তাবপব যা বললেন তা শুনে বফিকেব মাথা ঘুবতে লাগল। কি সর্বনাশেব কথা! শুনেও বিশ্বাস হতে চায না।

ঃ ভাইযাকে সাসপেণ্ড কবা হযেছে?

ঃ জ্বি।

ঃ তিনি অফিসে আসেন না?

ঃ জ্বি না। আপনাবা এ সর্ম্পকে কিছুই জানেন না?

ঃ জ্বি না। এই প্রথম জানলাম। ভাইযা খুব চাপা স্বভাবেব মানুষ।

ঃ আমাব বোধ হয এটা আপনাকে বলা ঠিক হল না। অফিসেব আমবা সবাই ব্যাপাবটায খুব আপসেট।

ঃ উনাব বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?

ঃ বেশ কিছু অভিযোগ আছে।

ঃ আমাব বিশ্বাস কবতে অসুবিদা হচ্ছে। কোন বকম অন্যায কবাব ক্ষমতা ভাইযাব নেই। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে।

ঃ তা তো হচ্ছেই। অভিযুক্ত হবাব জন্যে সব সময কিন্তু অন্যায কবতে হয না। নিন সিগাবেট নিন। চা খাবেন?

ঃ জ্বি না। চা সিগাবেট কিছুই খাব না। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি খাওয়াতে পাবেন?

ঃ নিশ্চযই পাবি।

ভদ্রলোক কোল্ড ড্রিংক আনালেন। রফিক দীর্ঘ সময় ভদ্রলোকের সামনে বসে রইল। উঠে যাবার মত শক্তিও তার নেই। এই বিশাল সমস্যার কি সমাধান হবে?

সে সেখান থেকে সরাসরি নীলুর অফিসে চলে গেল। নীলু কি একটা ফাইল নিয়ে খুব ব্যস্ত। চোখে চশমা। এই চশমা সে বাসায় পড়ে না। অফিসে এলে চোখে দেয়, তখন তাকে একেবারেই অন্যরকম লাগে। নীলু হাসি মুখে বলল. কি খবর রফিক?

ঃ কোন খবর নেই ভাবী। আমি যখনই আসি তখনই দেখি তুমি ব্যস্ত। একটা দিন দেখলাম না তুমি কলিগদের নিয়ে জমিয়ে গল্প কবছ।

ঃ কি করব, তুমি বেছে বেছে কাজের দিনগুলিতেই শুধু আস। আজ কি ব্যাপার?

ঃ তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে ভাবী। চল তোমাদের ক্যান্টিনে যাই।

ঃ এখানে বলা যাবে না?

ঃ না।

ক্যান্টিন পুবো ফাঁকা। চা পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ আওয়ার শুরু হবে। এখানে লাঞ্চ আওয়ারে চা হয় না। নীলু বলল, কি বলবে তাড়াতাড়ি বল। জরুরী কথার নাম দিয়ে তুমি যা বল সেটা কখনো জরুরী হয় না।

ঃ এবারেবটা হবে।

ঃ বল, শুধু শুধু দেরী করবে না।

ঃ তার আগে একটা হাসির গল্প শুনে নাও ভাবী। এতে খারাপ খবর সহ্য করা সহজ হবে। গল্পটা হচ্ছে—এক লোক এক্সিডেন্ট করেছে। গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেছে। ট্রাফিক সার্জেন বলল. তুমি গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেলে, ব্যাপারটা কি?

নীলু বিবক্ত হয়ে বলল, তুমি কি বলতে এসেছ বলে চলে যাও।

ঃ ভাইয়াকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে। তদন্ত কমিটি বসেছে, তদন্ত হচ্ছে। গত এক সপ্তাহ ভাইয়া অফিসে যায় নি। ঘর থেকে বেব হয়ে পার্কে-টার্কে কোথাও বসে সময় কাটাচ্ছে হয়ত।

নীলু হতভম্ব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না।

ঃ যা বলছ ঠিক বলছ?

ঃ সব জিনিস নিয়ে কি ভাবী রসিকতা করা যায়?

ঃ এত বড় একটা ঘটনা সে আমাকে বলবে না?

ঃ কি করবে বল—স্বভাব।

ঃ স্বভাব-টভাব কিছু না, এতদিন হয়েছে আমাদেব বিয়ের, এখনো সে আমাকে দূরে দূরেই রেখেছে। কেন, আমি কি এতই তুচ্ছ, এতই ফেলনা?

নীলু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ক্যান্টিনের বয়গুলি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, কি শুরু করলে এসব? তোমাদের এই জিনিসটা দু'চোখে দেখতে পারি না। এটার মধ্যে কেঁদে ফেলবার কি আছে?

নীলু চোখ মুছে বলল, না, কাঁদবার তো কিছুই নেই। খুব আনন্দের সংবাদ। মনিপুরী নাচ শুরু করলে তুমি বোধ হয় খুশী হও।

রফিক হেসে ফেলল। লাঞ্চের আগেই নীলু ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এল। সফিক নেই।

হোসেন সাহেব মনোয়ারাকে নিয়ে খিলগাঁয়ে গিয়েছেন। টুনী, বাবলু স্কুল থেকে ফেরেনি। বাড়ি একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। বিকেল পর্যন্ত নীলু বিছানায় শুয়ে রইল। মাঝখানে শারমিন একবার এসে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি শরীর খারাপ, ভাবী?

নীলু তিক্ত গলায় বলল, প্লীজ, আমাকে বিরক্ত করবে না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

ঃ ও সরি। তোমার কার্ডটা নাও।

ঃ কিসের কার্ড?

ঃ শাহানা পাঠিয়েছে। ভিউ কার্ড।

ঃ টেবিলের উপর রেখে দাও।

শারমিন চলে যেতে গিয়ে আরেকবার জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে বল। এসো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

ঃ ডাক্তারের কাছে নেওয়ার মত কিছু হয়নি।

এ বাড়িতে শরীর খারাপ অজুহাতে বেশীক্ষণ শুয়ে থাকার কোন উপায় নেই। হোসেন সাহেব তাঁর হোমিওপ্যাথিক বাক্স নিয়ে এসে পড়লেন।

ঃ মা, দেখি উঠে বস তো।

ঃ আমার তেমন কিছু হয়নি বাবা। মনটা শুধু খারাপ।

হোসেন সাহেব বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।

ঃ মন-খারাপও একটা অসুখ। সব অসুখের মূলে হচ্ছে এই অসুখ। ইংরেজীতে একে বলে— ম্যালাংকলি। মন খারাপ সারাতে পারলে সব অসুখই সারানো যায়। মাথাব্যাথা আছে?

ঃ অল্প আছে।

ঃ চাপা ব্যথা না কি সূচের মত ব্যথা?

ঃ চাপা ব্যথা।

ঃ দেখি মা, জিভ দেখি। হজমেরও অসুবিধা হচ্ছে? হাতের তালু কি খুব ঘামে?

ঃ একটু একটু ঘামে।

ঃ যা ভেবেছি তাই। তোমার কি মৃত্যুচিন্তা হয়? চট করে উত্তর দিও না, ভাল করে ভেবে বল।

এত দুঃখেও নীলু হেসে ফেলল। হোসেন সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, লক্ষণ বিচারটাই হচ্ছে আসল। ঠিকমত লক্ষণ বিচার করে একটা ডোজ দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। এই যে দেখ তোমার শাশুড়ির মেজাজ, এরও ওষুধ আছে। তিনটে ডোজ দিতে পারলে মেজাজ কন্ট্রোল হয়ে যাবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে।

ঃ দিচ্ছেন না কেন তিনটা ডোজ?

ঃ দিলেই কি সে খাবে? তাকে চিন না তুমি? সকাল থেকে হৈ চৈ করছে। দুপুরেও কিছু খায়নি।

ঃ কেন?

ঃ জানি না কেন? তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ তো মা। আমি এই ফাঁকে তোমার অসুখটা

নিয়ে একটু ভাবি। এটা তো তোমার এ্যালোপ্যাথি না যে চোখ বন্ধ করে ব্রড স্পেকট্রাম এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেব। লক্ষণ বিচার করতেই দুই তিন ঘণ্টা লাগবে। বইপত্র দেখতে হবে। বড় কঠিন জিনিস মা হোমিওপ্যাথি—বড় কঠিন।

মনোয়ারার আজকের রাগের কারণ হচ্ছে—শাহানা সবাইকে কার্ড পাঠিয়েছে তাঁকে পাঠায় নি। নিজের পেটের মেয়ে এই কাণ্ড কি করে করল? তিনি কি তাকে অন্যদের চেয়ে কম ভালবাসেন? অপছন্দ কবার মত কি আছে তাঁর মধ্যে?

নীলু দরজার কাছে এসে বলল, মা আসব?

ঃ আসতে ইচ্ছে হলে আস।

ঃ আপনি নাকি দুপুরে কিছু খাননি?

ঃ তাতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়েছে? আমি খেলেই কি, না খেলেই কি?

ঃ খাবার গরম করে টেবিলে দিয়েছি মা।

ঃ খামাখা আগবাড়িয়ে কাজ করতে যাও কেন? কে তোমাকে টেবিলে খাবার দিতে বলেছে?

নীলু বেশ কড়া করে বলল, আপনি মা শুধু শুধু অশান্তি করেন। সবাইকে বিরক্ত করেন।

মনোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়ে তাঁর মুখের উপর এসব কি বলছে? এত সাহস এই মেয়ে পেল কোথায়? তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, নীলু, এই ঘর থেকে বের হয়ে যাও।

এই প্রথম তিনি বৌমা না বলে নীলু বললেন। তাঁর মনে হল তাঁর চারপাশের ঘর বাড়ি থর থর করে কাঁপছে। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। নীলু ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। হোসেন সাহেব ডাক্তার আনতে ছুটলেন. ডাক্তার বলল, প্রেসার খুবই হাই। একবার সোহরাওয়ার্দিতে নিয়ে যাওয়া উচিত।

সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করিয়ে নিল। এতগুলি ঘটনা ঘটল খুব দ্রুত। নীলু বলল, বাবা, রাতে আমি থাকব হাসপাতালে, আপনি শারমিনকে নিয়ে চলে যান। ডাক্তার তো বলেছেন ভয়ের কিছু নেই।

হোসেন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, এত বড় একটা ঝামেলা, রফিক-সফিকের কোন খোঁজ নেই, রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে মা।

ঃ ওরা বোধহয় এতক্ষণে এসে পড়েছে। ওদের গিয়ে খবর দিন।

ঃ যাচ্ছি। তোমার একা একা খারাপ লাগবে না তো?

ঃ একা কোথায়? মা আছেন—তাছাড়া হাসপাতাল-ভর্তি রুগী।

ঃ রাতে তুমি ঘুমুবে কোথায়?

ঃ এক রাত না ঘুমুলে কিছু হবে না। বাবা, আপনারা একটা বেবী টেক্সি নিয়ে চলে যান।

মনোয়ারা বেশ খুশী, তাঁকে নিয়ে যে এতবড় একটা হৈ-চৈ হচ্ছে এই আনন্দে তিনি উৎফুল্ল। নীলুকে ডেকে একবার বললেন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তো খবরটা দেয়া দরকার। কখন কি হয়—হার্টের ব্যাপার!

ঃ হার্টে আপনার কিছু হয়নি মা। খুব প্রেসার ছিল, তাতেই ....

ঃ তুমি কি ডাক্তারদের চেয়ে বেশী জান? যা করতে বলেছি কর। সবাইকে খবর দাও।

ঢাকার বাইরে যারা তাদের চিঠি দিয়ে দিও।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ রফিক সফিকের কাণ্ডটা দেখ তো। নিজের মা মরে যাচ্ছে, কোন খেয়াল নেই।

ঃ এখনো খবর পায় নি।

ঃ তোমার কি ধারণা, খবর পেলেই ছুটতে ছুটতে চলে আসবে? নিজের ছেলেদের আমি চিনি না? খুব চিনি।

নীলু তার শাশুড়ির পাশে বসে মৃদুস্বরে বলল, মা, আপনি আমার কথায় রাগ করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আমার কি যে খারাপ লাগছে।

বলতে বলতে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। গলা ভার-ভার হল। মনোয়ারা বিরক্ত গলায় বললেন, বলেছ ভাল করেছ। আমি দিনে এক হাজার কড়া কথা বলি, আর তুমি একটা বলতে পারবে না? কাঁদতে শুরু করবে না তো মা! গায়ের মধ্যে কুট কুট করছে, বিছানায় ছাবপোকা আছে কিনা কে জানে। মা, তুমি ঐ নার্সটিকে জিজ্ঞেস করে আস তো, বিছানায় ছারপোকা আছে কিনা।

নীলু বাধ্য মেয়ের মত উঠে গেল। মনোযাবা মনে মনে বললেন, আল্লাহ, তুমি আমার এই লক্ষ্মী বৌটাকে সুখে রেখো। কোন রকম দুঃখ তাকে দিও না।

রফিক এল রাত ন'টার দিকে। নীলু অবাক হয়ে বলল, তুমি একা? তোমার ভাই আসেনি?

সকালে আসবে।

ঃ বল কি তুমি? সকালে আসবে মানে? অসুস্থ মাকে দেখতে আসবে না?

রফিক চুপ করে গেল। সে টিফিন কেবিয়াবে করে খাবার নিয়ে এসেছে। ভাত, কৈ মাছ ভাজা, ফুলকপির ভাজি।

ঃ খেয়ে নাও ভাবী। ক্ষিদে লেগেছে নিশ্চয়ই।

ঃ ক্ষিদে লেগেছে কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। তোমার ভাইয়ের কি মন টন বলে কিছু নেই?

ঃ সেটা ভাইয়াকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই।

ঃ তুমি এখানে রাত করে কি করবে? মাকে দেখে চলে যাও।

ঃ আমিও আছি তোমার সঙ্গে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে থাকব। তুমি একা একা রাত জাগবে তা হয় নাকি? একটা চায়ের দোকান দেখে এসেছি, সারারাত খোলা থাকে। ঐখানে গিয়ে এক ঘন্টা পর পর চা খাব আর হাসপাতালের বারান্দায় বসে মশার কামড় খাব। রাতটা ভালই কাটবে।

নীলু হেসে ফেলল। বফিক সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, হাসপাতাল নিয়ে একটা জোক শুনবে? খুব হাসির!

ঘটনার উত্তেজনায় মনোয়ারা এখন খানিকটা ক্লান্ত। ডাক্তাররা ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। তাতে ঘুম ঠিক আসছে না, ঝিমুনির মত আসছে। নীলুকে তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে শুয়েছেন। জেগে আছে নীলুও। কিছুতেই তার মনের গ্লানি কাটছে না। এক সময় মনোয়ারা বললেন,

বৌমা, ঘুমিয়ে পড়েছ?

ঃ জ্বি না।

ঃ তোমার শ্বশুরের কাণ্ডটা দেখেছ? তার উচিত ছিল না হাসপাতালে থাকা? একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, আর সে আরাম করে ঘুমাচ্ছে! ছিঃ ছিঃ! বৌমা, ঘুমিয়ে পড়লে?

ঃ জ্বি না।

ঃ রফিক আছে তো?

ঃ জ্বি, বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে।

ঃ ব্যাটাছেলে একজন থাকা ভাল। কখন কি দরকার হয়। তাই না? হার্টের অসুখ!

ঃ জ্বি। আপনি ঘুমান মা—মাথায় হাত বুলিয়ে দেই।

ঃ দাও।

নীলু মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকদিন পর গভীর তৃপ্তি নিয়ে মনোয়ারা ঘুমুতে গেলেন।

সাতদিন হাসপাতালে কাটিয়ে মনোয়ারা আজ বাড়ি ফিরবেন। এই উপলক্ষে রফিকের ইচ্ছা ছিল একটা নাটকের মত করা। দরজার বাইরে লেখা থাকবে শুভ প্রত্যাবর্তন। ফুল-টুল দিয়ে ঘর সাজানো হবে। রাতে ছোট্ট একটা ঘরোয়া গানের আসর। রফিক তার এক বন্ধুকে খবর দিয়েছে, সে সন্ধ্যাবেলায় এসে গজল গাইবে। এই জিনিসটির আজকাল বেশ প্রচলন হয়েছে। ঘরে ঘরে গজল।

কিন্তু অবস্থাগতিকে মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব হবে না। ভোরবেলায় ভাবী এবং ভাইয়ার মধ্যে তুমুল ঝগড়া। এরা দু'জন যে এভাবে ঝগড়া করতে পারে তা রফিক কল্পনাও করেনি।

একবার ভেবেছিল ঝগড়ার ধাক্কাটা কমানোর জন্যে সে কিছু বলবে। শারমিন তাকে বেরুতে দেয়নি।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে এভাবে—অফিসের সময় সফিক যথারীতি কাপড় পরছে। কাপড় পরতে পরতে বলল, এক কাপ চা দিতে পার নীলু?

নীলু চা এনে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আজ মা হাসপাতাল থেকে ফিরবেন, জান বোধ হয়?

ঃ হ্যাঁ জানি। আমিও সকাল সকাল ফিরব।

ঃ কোথায় যাচ্ছ তা জানতে পারি কি?

ঃ তোমার কথা বুঝতে পারছি না। রোজ যেখানে যাই সেখানে যাচ্ছি।

ঃ অফিসে যাচ্ছ?

সফিক এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জুতা-ব্রাশে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়ল। নীলু বলল, কি, কথা বলছ না কেন? অফিসে যাচ্ছ?

ঃ না।

ঃ কোথায় গিয়ে বসে থাক, জানতে পারি?

ঃ আস্তে কথা বল, চেঁচাচ্ছ কেন?

ঃ তোমার চাকরি নেই এই খবরটা আমাকে কেন অন্যের কাছ থেকে শুনতে হল? কেন তুমি বলতে পারলে না?

ঃ চাকরি নেই এই কথাটা তো ঠিক না। তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলেই আমি আগের জায়গায় ফিরে যাব।

ঃ ফিরে যাবে ভাল কথা, আমাকে কেন বলবে না?

ঃ কি মুশকিল তুমি চেঁচাচ্ছ কেন?

ঃ চেঁচাব— চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলব।

ঝগড়ার এই পর্যায়ে শারমিনের আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে রফিক এসে বলল, ভাবি, একটু শুনে যাও তো, খুব দরকার।

নীলু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। শান্তমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রফিক বলল, তোমার অফিসের গাড়ি অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছে। হর্ণ দিচ্ছে। যাও অফিসে যাও। এইসব কি হচ্ছে?

ঃ আজ অফিসে যাব না।

ঃ সেই খবরটা গাড়িতে যারা আছে তাদের দিয়ে আসতে হবে তো? নাকি তোমার একার জন্যে সবাইকে লেট করাবে?

নীলু খবর দিতে গেল, কিন্তু ফিরে এল না। শেষ মুহূর্তে মনে হল, বাসায় ফিরে কি হবে? এরচে অফিসে সময় কাটানোই ভাল। তার শাশুড়ি সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় আসবেন, তার আগে ফিরে গেলেই হবে।

সফিক আজ প্রথম অফিসে গেল। বিনা প্রয়োজনে নয়। প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে টাকা তুলতে হবে। বাড়িভাড়া হাসপাতালের খরচ— নানান ফ্যাকরা। অফিসে ঢুকতে তার লজ্জা লজ্জা লাগছে। নিজের অফিস অথচ নিজের মনে করে আসতে পারছে না। অফিসের কর্মচারীরাও কেউ এই কদিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। সিঁড়ির মাথায় সিদ্দিক সাহেবের সঙ্গে দেখা।

ঃ আরে সফিক সাহেব, আপনি? আসুন আসুন। আজ কেন জানি মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন।

ঃ তাই নাকি? আপনার যে সিক্সথ সেন্স ডেভেলপ করেছে তা তো জানতাম না সিদ্দিক সাহেব।

ঃ আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, তাই না? আপনার সামনেই আমি মুজিবুরকে জিজ্ঞেস করছি। আধ ঘণ্টা আগে আমি মুজিবুরকে বলেছি যে আপনি আজ আসবেন। আসুন আমার ঘরে আসুন। প্লীজ!

ঃ আমি একটু ক্যাশ সেকশনে যাব, কিছু টাকা তুলব।

ঃ ক্যাশ সেকশনের পাখা গজায়নি, পালিয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া টাকা আপনি আমার ঘরে

বসেও তুলতে পারবেন।

ঃ অফিসের খবর কি?

ঃ তদন্তের খবর জানতে চাচ্ছেন তো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তদন্ত পরশু শেষ হয়েছে। সাহেবদের তদন্ত একটা দেখবার জিনিস রে ভাই। চা খেতে খেতে চার পাঁচ জন লোককে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করল, ব্যস, তদন্ত শেষ।

ঃ ফলাফল কি?

ঃ তাও তো জানি না। ব্যাটা কিছু বলে না। আমি গতকাল জিজ্ঞেস করলাম, সে বকের মত ঠোঁট সরু করে বলল, এই খবরের জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন? ব্যাটার কথায় গা জ্বলে যায়। অফিসের খবরে আমার আগ্রহ থাকবে না? আপনি কি খাবেন— চা না কফি?

ঃ আমি কিছুই খাব না।

ঃ এসব বলে কোন লাভ হবে না। খেতেই হবে। ক্যাশিয়ারকে ডাকাচ্ছি, টাকা পয়সার ব্যাপার সেরে নিন। ইন্টারকমের ব্যবস্থা হয়েছে দেখেছেন? টলম্যান ব্যাটা দারুণ একটিভ। ছ'কোটি টাকার একটা নতুন প্ল্যান্ট হচ্ছে। ব্যাটার এক চিঠিতে হেড অফিস প্ল্যান স্যাংশন করে দিয়েছে।

ঃ কিসের প্ল্যান্ট?

ঃ সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যান্ট। বাংলাদেশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে জয়েন্ট কোলাবরেশন। সিক্সটি ফোর্টি শেয়ার। সিক্সটি কোম্পানী আর ফোরটি লোকাল গভর্ণমেন্ট।

ঃ ভালই তো।

ঃ আমাদের জন্যে ভাল। কোম্পানী গ্রো করবে, আমরাও গ্রো করব।

সিদ্দিক সাহেব ইন্টারকমের বোতাম টিপে ক্যাশিয়ারকে আসতে বললেন। তার এক মিনিট পরই টলম্যান খবর পাঠাল, সফিককে যেন তার ঘরে পাঠানো হয়। সিদ্দিক সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, আপনি এসেছেন ব্যাটার কাছে খবর চলে গেছে। নাৎসী জার্মানীর অবস্থা হয়েছে, বুঝলেন? জীবন অতিষ্ঠ। চারদিকে ব্যাটার স্পাই।

টলম্যান হাসিমুখে বলল, কেমন আছ সফিক?

ঃ ভাল আছি স্যার।

ঃ অফিসে এসেছিলে কেন?

ঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কিছু তুলব।

ঃ তুলেছ?

ঃ না, এখনো তোলা হয় নি।

ঃ বস— আরাম করে বস। অফিসের খোঁজখবর কিছু রাখ?

ঃ না, তবে আজ কিছু শুনেছি। কোম্পানী বড় হচ্ছে।

ঃ হ্যাঁ, বড় হচ্ছে। বিগ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। কিন্তু তোমাদের সরকারী অফিস কুমীরের মত হাঁ করে আছে। সারাক্ষণ এদের মুখে কিছু না কিছু দিতে হচ্ছে। হা হা হা। চা খাবে?

ঃ না।

ঃ তদন্তের রিপোর্ট জানতে চাও?

ঃ হ্যাঁ, চাই।

ঃ তোমার কি ধারণা বল? তুমি কি মনে কর তদন্তে তোমাকে নির্দোষ বলা হবে?

ঃ আমার তাই ধারণা। আমি কোন অন্যায় করি নি। এসবের কিছুই আমি জানি না।

ঃ যে এসবের কিছুই জানে না, অথচ যার সিগনেচার নিয়ে এত চুরি-জুয়াচুরি হয়, সে কি বড়রকমের একজন অপদার্থ নয়?

সফিক চুপ করে রইল। টলম্যান থেমে থেমে বলল, নিতান্তই অক্ষম ব্যক্তিদের এই ভাবে ব্যবহার করা হয়, ঠিক না?

ঃ হ্যাঁ, ঠিক।

ঃ তদন্তে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদিও আমি এবং তদন্ত কমিটির মেম্বাররা ভালই জানি, অন্যায়টা তোমার করা নয়।

ঃ তদন্ত কমিটি দোষী ব্যক্তিদের বের করতে পারেনি, এটা কি কমিটির একটা বড় রকমের ব্যর্থতা নয়?

ঃ হ্যাঁ, ব্যর্থতা তো বটেই। বিগ ফেইলিয়ুর।

ঃ স্যার, আমি কি এখন উঠব?

ঃ না, একটু বস। আমি হাতের কাজ সেরে নিই— ধর দশ মিনিট।

ঃ ঠিক আছে স্যার, বসছি।

ঃ কিংবা আরেকটা কাজ করতে পার। যে কাজে এসেছিলে সেটা শেষ করে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

ঃ আর দেখা করে কি হবে?

ঃ কথাবার্তা বলব। আজ আমার কাজ করার মুড নেই। কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

সফিক বের হয়ে গেল। টলম্যান দু'টি অর্ডারে সই করল। একটি হচ্ছে সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যান্টের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসাবে সফিকের নিয়োগপত্র। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঢাকা জোনাল অফিসের জি. এম. পদে সফিকের পদোন্নতি।

তদন্ত কমিটি সফিকের কোন ত্রুটি ধরতে পারে নি। তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে টলম্যান তার রিপোর্টে লিখেছে— সৎ এবং দক্ষ এই দুই ধরনের গুণের সমন্বয় সাধারণত হয় না। সফিকের মধ্যে তা লক্ষ্য করেছি। বড় রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ একে দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া সফিক আহমেদের বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো উচিত।

সফিক বাড়ি ফিরে যাবার আগে টলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সে নেই লাঞ্চ করতে চলে গিয়েছে। টলম্যানের পি এ. দু'টি খাম এগিয়ে দিল। নরম গলায় বলল, বড় সাহেব আপনাকে দিতে বলেছেন। আর আপনার জন্যে এই চিঠি লিখে রেখে গেছেন। চিঠিটা আগে পড়তে বলেছেন।

সফিক চিঠি পড়ল। চিঠির বক্তব্য হচ্ছেঃ "আজ রাতে অবশ্যই তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কোন একটা ভাল রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে। খাবার এবং পানীয়ের অর্ডার দেবার পর খাম দু'টি খুলে পড়বে। আশা করি এর অন্যথা হবে না।"

সফিক অফিসে বসেই খাম খুলে পড়ল। তার বেশ মন খারাপ হল। টলম্যান যে ভাবে

বলেছিল কাজটা সেভাবেই করা উচিত ছিল। নীলু কত খুশী হত। আনন্দ একা ভোগ করা যায় না।

সিদ্দিক সাহেব বললেন, কি ব্যাপাব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছেন? স্যাবেব সঙ্গে দেখা হয় নি?

ঃ হয়েছে।

ঃ ব্যাটা কি বলল?

ঃ তেমন কিছু না।

সফিক একটা রিকশা নিল। যাবে মতিঝিল। নীলুর অফিসে। নীলুর অফিস এখনো দেখা হয় নি। নীলু আজ অফিসে গিয়েছে কিনা কে জানে। আজ হয়ত অফিসেই যায় নি। ঝগড়া-টগড়া করে বাসায় বসে আছে।

নীলু অফিসেই ছিল। সফিককে ঢুকতে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

ঃ কি ব্যাপার, তুমি?

ঃ দেখতে এলাম তুমি কি কর না কর। নিজের কিছু করার নেই, সময়টা তো কাটাতে হবে।

সফিক নীলুর সামনে চেয়ার টেনে বসল। পকেটে হাত দিয়ে হাসি মুখে বলল, সিগারেট খেতে কোন বাধা নেই তো?

অফিসের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। নীলুর কেন জানি খুব লজ্জা লাগছে।

সফিকেব হঠাৎ এখানে আসার কারণটা ধরতে পারছে না। সে চাপা গলায় বলল, সত্যি করে বল কি জন্যে এসেছ।

ঃ তোমার যখন কাজকর্ম ছিল না, তখন তুমি আসতে না আমার অফিসে?

ঃ অকারণে যেতাম না, কোন একটা কাজ নিয়ে যেতাম।

ঃ বেশী সময়েই যেতে টাকার জন্যে, হঠাৎ টাকার দরকার হয়ে পড়লে তখন.......

ঃ তুমি নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যে আস নি।

সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, আমার উদ্দেশ্যও তাই। গোটাপাঁচেক টাকা দিতে পারবে?

সফিক হাসছে। সমস্ত রহস্য নীলুর কাছে এখন পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। ভাল খবর আছে, নিশ্চয়ই খুব ভাল খবর। আজ সকালে এই নাটকটা সে যদি না করত! বেচারা জানাতে চায় নি, কেন সে জোর করে জানল? জানাতে চায় নি লজ্জায় এবং অপমানে, সে স্ত্রী হয়ে স্বামীর লজ্জা এবং অপমানকে সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। তারপরও এই লোকটি রাগ করে নি। ভাল খবরটি নিয়ে হাসি মুখে এসেছে তার কাছে। রহস্য করার চেষ্টা করছে। রহস্য করার তার ক্ষমতা নেই। মোটেই জমাতে পারছে না। নীলুর চোখ ভিজে উঠল।

নীলু বলল, কিছু খাবে? আমাদের এখানে খুব ভাল ক্যান্টিন আছে।

সফিক হাসতে হাসতে বলল, এক কাজ করলে কেমন হয়, চল না বাইরে কোথাও খেয়ে বাসায় চলে যাই। আজ একটু সকাল সকাল ফেরা দরকাব।

একটু বস, আমি স্যারকে বলে আসি।

নীলু কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এল। নরম স্বরে বলল, তুমি একটু আসবে আমার সঙ্গে?

ঃ কেন?

.ঃ স্যারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতাম।

ঃ কি পরিচয় দেবে? বেকার স্বামী?

ঃ হ্যাঁ, তাই। প্লীজ আস।

সফিক হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল।

মনোয়ারা সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন। ডাক্তার বলে দিয়েছে, ইনাকে নিজের মত থাকতে দিতে হবে। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা করা একেবারেই চলবে না।

মনোয়ারার মন ভাল নেই। তিনি আরো কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে চেয়েছিলেন।

গৃহপ্রবেশের আয়োজন মোটামুটি ভালই। রফিক সত্যি সত্যি একটা কাগজে লিখেছে—'শুভ প্রত্যাবর্তন'। সেটা টানানো হয়েছে দরজার সামনে। ফুলের একটি তোড়া টুনীর হাতে। সেই ফুলের তোড়া টুনী তার দাদীর হাতে তুলে দিল। মনোয়ারা গম্ভীর হয়ে ফুলের তোড়া নিলেন। মনে হচ্ছে তিনি জানতেন একরকম একটা কিছু হতে যাচ্ছে।

আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা তাঁকে দেখতে আসছে। তিনি সবার সঙ্গেই হাসপাতালের ভয়াবহ গল্প করছেন।

"বাঁচার কোন আশাই ছিল না। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিল। নেহায়েৎ ভাগ্যগুণে ফিরে এসেছি।"

কথা পুরোপুরি মিথ্যা। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করছে।

রফিকের বন্ধু সেই গজলগায়ক সন্ধ্যা থেকেই বসে আছে। মনোয়ারা শুনলেন তাঁর ফিরে আসা উপলক্ষে গানবাজনার আয়োজনও আছে। তাঁর বেশ আনন্দ হল। শাহানা আর তার বর এখনো আসেনি। এইটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। এরা দু'জন তাঁকে দেখতে হাসপাতালেও যায় নি। নেপাল থেকে ফিরেছে তো বেশ কিছুদিন হল। তিনি উঁচু গলায় ডাকলেন, বৌমা, ও বৌমা?

শারমিন এসে ঢুকল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, তোমাকে তো ডাকিনি, তুমি এসেছ কেন? বড় বৌমাকে আসতে বল।

নীলু ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, শাহানাদের খবর দেওয়া হয়েছে?

ঃ জ্বি হয়েছে।

ঃ ওরা আসছে না কেন?

ঃ কোন কাজ পড়েছে বোধ হয়।

ঃ যমেমানুষে টানাটানি হচ্ছে, আর তার কাজ পড়ে গেল? বড় কাজের মেয়ে হয়ে গেছে দেখি। রফিককে বল, ওদের নিয়ে আসুক।

ঃ ওকে বললে এখন যাবে না মা। বন্ধুবান্ধব এসেছে, ওদের নিয়ে হৈ-চৈ করছে।

ঃ তোমাকে বলতে বললাম তুমি বল। তোমরা সবাই মিলে আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছ। ডাক্তার কি বলেছে মনে নেই?

রফিক নীলুর কথার কোন পাত্তাই দিল না। পাত্তা দেবার প্রশ্নও উঠে না। তার গায়ক বন্ধু মাথা দুলিয়ে মেয়েলী গলায় গান ধরেছে— " মেরা বালাম না আয়ে।"

বালাম না আসার কারণে তাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে।

হোসেন সাহেবের এই গান খুবই পছন্দ হচ্ছে। তিনি চোখ বন্ধ করে হাতে তাল দিচ্ছেন। টুনী এবং বাবলু একটু পর পর হেসে উঠছে। তিনি এতে খুব বিরক্ত হচ্ছেন। গজল-গায়কও বিরক্ত হচ্ছে।

কবির মাস্টারের ঘুম ভাঙ্গে সূর্য ওঠার আগে। কিন্তু গত ক'দিন ধরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। তিনি আটটা ন'টার আগে বিছানা থেকে নামতে পারছেন না। সকাল বেলা গাঢ় ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে থাকে। শরীরে কোন রকম জোর পান না। ঘুম ভাঙ্গার পরও অনেকক্ষণ তাঁকে বিছানার উপর বসে থাকতে হয়। নড়াচড়া করতে পারেন না। তাঁর মনে ভয় ঢুকে গেছে, হয়ত বা একসময় পুরোপুরি বিছানা নিতে হবে। জীবন কাটবে অন্যের করুণায়। এবড়ে দুঃখের ব্যাপার আর কি হতে পারে? চট করে মরে যাওয়া ভাল, কিন্তু দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভয়াবহ ব্যাপার। এটা তিনি চান না।

আজ অবশ্যি তাঁর ঘুম সূর্য ওঠার আগেই ভেঙ্গেছে। শওকত তাঁকে ডেকে তুলেছে। শওকতের মুখ গম্ভীর। বড় রকমের কোন ঝামেলা হয়েছে বোধহয়। কিন্তু শওকত তাঁকে কিছু বলছে না। ঘুম ভাঙ্গিয়ে চা বানাতে গিয়েছে। একেক সময় শওকতের উপর রাগে তাঁর গা জ্বলে যায়।

ঃ হয়েছে কি রে শওকত? ব্যাপারটা বল?

রান্নাঘর থেকে শওকত বলল, চা খান, তাবপরে কইতাছি। খবর খারাপ।

চা খাবার পরও শওকত কিছু বলল না। কবির মাস্টার বড় বিরক্ত হলেন।

ঃ ব্যাপারটা কি?

ঃ আসেন আমার সাথে। নিজের চউক্ষে দেখেন। মুখের কথায় কাম কি?

এর সঙ্গে বাক্যালাপ করা অর্থহীন। কবির মাস্টার গায়ে চাদর জড়ালেন। ছাতা হাতে নিলেন। কতদুর যেতে হবে কে জানে?

বেশীদুর যেতে হল না। স্কুলের পুকুরের কাছে এসে শওকত বলল, দেখেন নিজের চউক্ষে— দেখেন।

কবির মাস্টার কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলেন না। পুকুরের সব মাছ মরে ভেসে উঠেছে। দুধের সরের মত মাছের সর পড়ে গেছে। অনেক লোকজন জড় হয়েছে এর মধ্যেই। তারা কবির মাস্টারের দিকে এগিয়ে এল কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

কবির মাস্টার বসে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরছে। বহু যত্নে তিনি এই পুকুর তৈরী করেছেন। মাটি ভরাট হয়ে গিয়েছিল, মাটি কাটিয়েছেন। পোনা মাছের চারা ছেড়েছেন। ফিশারী ডিপার্টমেন্টের লোক এনে পানিতে সার দিয়েছেন। শ্যাওলা পরিষ্কার করিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের জন্যে তো এটা তিনি করেননি? করেছেন সুখী নীলগঞ্জের জন্যে। মাছের

আয় পুরোটা যেত স্কুলে। স্কুল নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু এটা কি করল?

শওকত বলল, স্যার উঠেন, বাড়িতে যাই। বইস্যা থাইক্যা কি করবেন? কার জন্যে বসবেন?

তিনি উঠলেন, বাড়ি গেলেন না। পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসলেন। এই বছরই ঘাট পাকা করেছেন। ছেলে বুড়ো এখন পুকুরপাড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। কেউ কেউ বড় বড় মাছ তুলে নিচ্ছে ভয়ে ভয়ে। রান্না করবে। খাবে। মাছের শরীরে বিষ কতটুকু গিয়েছে কে জানে। বিষাক্ত মাছ খেয়ে হয়ত অসুস্থ হবে অনেকে। তাঁর ইচ্ছা হল একবার বলেন, এই মাছ খেয়ো না। কিন্তু বললেন না। বলতে ইচ্ছা হল না। কেনই বা বলবেন?

বেশ কিছু সাপ মরে ভেসে উঠেছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেই সব সাপ কঞ্চির আগায় নিয়ে মহানন্দে ছোটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে এ ওর গায়ে ফেলে দিচ্ছে। কবির মাস্টার ঘাটে বসে শিশুদের খেলা দেখতে লাগলেন। শওকত বেশ কয়েকবার চেষ্টা করল স্যারকে বাসায় নিয়ে যেতে, পারল না। তিনি মূর্তির মত বসে রইলেন। রোদ বাড়তে লাগল।

দুপুর এগারটায় থানার ও সি সাহেব তদন্তে এলেন। দু'জন কনস্টেবল নিয়ে পুকুরের চারদিকে কয়েকবার ঘুরলেন। স্কুলের হেড-মাস্টার সাহেবের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে কবির মাস্টারের পাশে এসে বসলেন। আশেপাশের সবাইকে অবাক করে দিয়ে কবির মাস্টারের পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। খাকি পোশাক পরা কেউ সাধারণত পা ছুঁয়ে সালাম করে না। কবির মাস্টার বললেন, ভাল আছ বাবা?

ঃ জ্বি স্যার। আপনার দোয়া।

ঃ তাহলে তো ভাল থাকার কথা না, কারণ দোয়া আমি তোমার জন্যে করিনি।

ঃ এখন করবেন। রোদের মধ্যে বসে আছেন কেন? বাড়ি চলে যান।

ঃ বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। রোদে বসে থাকতে ভালই লাগছে।

ঃ এনড্রিন দিয়ে মেরেছে। আপনার সঙ্গে কি স্যার কারো শত্রুতা আছে? চট করে কিছু বলবেন না স্যার। ভাল করে ভেবে বলুন।

ঃ ভেবেই বললাম, শত্রুতা থাকবে কেন?

ঃ স্যার, আপনি ঘরে গিয়ে কিছু মুখে দিন। শীতকালের রোদই গায়ে লাগে বেশী।

ঃ হ্যাঁ যাব। খানিকক্ষণ পরেই যাব। শুধু শুধু বসে থেকে লাভ কি? কেনই বা বসব?

তিনি কিন্তু উঠলেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত একই জায়গায় একই ভাবে বসে রইলেন। মনে হচ্ছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন।

নীলগঞ্জ স্কুলের হেড মাস্টার অন্য স্যারদের সঙ্গে নিয়ে অনেকক্ষণ বোঝালেন, কি জন্যে বসে আছেন? নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভটা কি হচ্ছে? সারাদিন কিছু মুখে দেন নি। হিম পড়তে শুরু করেছে। বড় রকমের অসুখ না বাধিয়ে আপনি ছাড়বেন না মনে হচ্ছে। তাতে লাভটা হচ্ছে কার?

কবির মাস্টার ক্লান্ত গলায় বললেন, লাভ লোকসান দিয়ে ভাবি না।

ঃ আপনি না ভাবলেন, আমরা তো ভাবি। কেন আপনি শুধু শুধু বসে আছেন?

ঃ একটা প্রতিবাদ করছি, বুঝলে? একটা প্রতিবাদ— যে এই কাজ করেছে সে একসময় আমার কাছে ক্ষমা চাইবে। তখন আমি উঠব। তার আগে আমি উঠব না। সারারাত বসে

থাকব।

সন্ধ্যার পর শওকত বলল— কাজটা সেই করেছে। ক্ষমা চায়। আর কোনদিন কববে না।

শুধু শওকত নয়, একের পর এক অনেকেই আসতে লাগল। সবাই বলছে কাজটা তারই করা। পাশের দু'একটি গ্রাম থেকেও লোকজন এসে বলল, কাজটা তারা কবেছে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারলেন না, অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে। সেখান থেকে তিন দিন রেখে ঢাকায় পিজিতে। ঢাকায় পঞ্চম দিনের বিকেলে তিনি চোখ মেললেন। শুনলেন কে যেন বলছে— বুড়ো মনে হচ্ছে এই যাত্রায় টিকে গেল।

কথা বলছে রফিক। তিনি ভাবতে চেষ্টা কবলেন, রফিক এখানে এল কি করে? মাথা ঘুরাতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না— শরীর সীসার টুকরার মত ভারী হয়ে আছে।

ঃ মামা, কথাবার্তা কিছু শুনতে পারছ? তাকাও দেখি আমার দিকে? বল তো কে?

ঃ রফিক।

ঃ মনে হচ্ছে আরো কিছুদিন আমাদের যন্ত্রণা দেবে।

ঃ তুই এখানে কোত্থেকে?

ঃ আমি যেখানকাব সেখানেই আছি। তুমি বর্তমানে আছ ঢাকায়। পিজিতে। বেঁচে উঠবে এরকম কোন আশা ডাক্তারদের ছিল না। তুমি তাদের বোকা বানিয়ে বেঁচে উঠেছ! বুঝতে পারছ?

ঃ পারছি।

ঃ রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আমরা পালা করে তোমাকে পাহারা দিচ্ছি। বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আমার ডিউটি।

ঃ তোর সঙ্গে উনি কে?

ঃ ইনি হচ্ছেন বাবলুর বাবা। সোবাহান সাহেব। বিখ্যাত জ্যোতিষী। তুমি আরেকটু সুস্থ হলেই তোমার হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব বলে দিবে। এমন কি তোমার পুকুরের মাছ কে মারল সেই খবরও বলে দিবে।

সোবাহান বলল, রফিক সাহেব, ওনাকে এখন ঘুমাতে দিন, বিরক্ত করবেন না। আসুন আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।

কবির মাস্টার কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। গভীর ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। চেষ্টা করেও তিনি জেগে থাকতে পারছেন না।

রফিক বলল, বুড়ো তো মনে হয় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে। এখন আর পাহারা দেবার কোনো মানে নেই। চলুন বাড়ি চলে যাই।

ঃ বাড়ি গিয়ে কি করবেন?

ঃ তাহলে চলুন আপনার আস্তানায় যাই। আপনি কি ভাবে জীবনযাপন করেন দেখে আসি।

ঃ দেখার মত কিছু না। বস্তির মত একটা জায়গায় বাস করি। ওখানে গেলে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

ঃ বন্ধ হলে হবে, চলুন যাই।

ঃ সত্যি যাবেন?

ঃ আরে কি মুশকিল, আমি কি ভদ্রতা করে যাবার কথা বলছি?

ঃ কি করবেন আমরা ওখানে গিয়ে?

ঃ গল্প করব। যদি চা খাওয়ান চা খাব।

ঃ আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

ঃ তা আছে। আপনি খুব ভাল করে আরেকবার আমার হাত দেখবেন। ঐ দিন তেমন মনোযোগ দেননি। ভাসা ভাসা কথা বলেছেন।

ঃ ব্যাপারটা তো ভাই ভাসা ভাসা।

ঃ ভাসা ভাসা হলেও যতদুর সম্ভব আপনি একটু তলিয়ে দেখবেন। আপনার কাছে হাত দেখার ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে না?

সোবাহান হেসে ফেলল।

রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, হাসবেন না, ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস। আপনার হাত দেখার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বাসায় চলুন, সেখানে আমি সব বলব।

ঃ বেশ তো, চলুন। কিন্তু তার আগে আপনি কি একটা খবর দেবেন না?

ঃ কি খবর?

ঃ আপনার মামার যে জ্ঞান ফিরেছে সেই খবব।

ঃ খবর দেবার দরকার নেই। আটটাব সময নীলু ভাবী এসে নিজের থেকেই জানবে। মরবার খবর চটাচট দিতে হয়, বাঁচার খবব না দিলেও চলে।

সোবাহান যেখানে থাকে তাকে ঠিক বস্তি বলা যাবে না। কাঁচা ঘর নয়, হাফ বিল্ডিং। দু'টি কামরা। আসবাবপত্র যা আছে তা বেশ গোছানো। হাত দেখা, কোষ্ঠী গণনার প্রচুব বইপত্র। রফিক বলল, এইসব বই পড়েছেন নাকি?

ঃ হ্যাঁ পড়েছি।

ঃ তারপরেও বলেন, আপনি এসব বিশ্বাস করেন না?

ঃ জ্বি না, করি না।

ঃ অদ্ভুত লোক ভাই আপনি। দেখি চায়ের ব্যবস্থা করুন।

সোবাহান কেরোসিনের চুলা ধরাল। চায়ের কাপ সাজাল। সহজ গলায় বলল, রফিক সাহেব, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন?

ঃ ক্ষিধে ক্ষিধে অবশ্যি লাগছে। কি আছে ঘরে?

ঃ মুড়ি খাবেন? তেল মরিচ দিয়ে মেখে দেই?

ঃ দিন। লোকজন আসে কেমন আপনার কাছে?

ঃ বেশী আসে না। তবে আসে কিছু কিছু। টাকা যা পাই তার থেকে বাড়িভাড়া দেই। খাবার খরচ উঠে।

ঃ জমে না কিছু?

ঃ না। সঞ্চয়ের ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই। কার জন্যে সঞ্চয় করব বলুন। আমরা নগ্ন হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম, নগ্ন হয়ে ফিরে যেতে হবে।

ঃ কিন্তু যতদিন বাঁচবেন, নগ্ন হয়ে বাঁচতে পারবেন না। কিছু একটা গায়ে দিতে হবে।

ঃ দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কেউ কেউ জীবনও নগ্ন গাত্রে কাটিয়ে দেন।

ঃ কাইন্ডলি আপনার হাইফিলসফি রেখে আমার হাতটা দেখুন। আপনি বলেছিলেন আমি প্রচুর পয়সা করব।

ঃ তা বলেছিলাম।

ঃ সে রকম লক্ষণ অবিশ্যি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্ত্রীভাগ্যে ধন, তা তো মনে হচ্ছে না। যা হচ্ছে বন্ধুভাগ্যে হচ্ছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জ্বি তাই। আজ একটু সময় নিয়ে হাতটা দেখুন। ম্যাগনিফাইং গ্লাস ফ্লাস যা আছে বের করুন। বিনা পয়সায় হাত দেখাব না, রীতিমত ফি দেব। কত নেন আপনি? রেট কত?

ঃ বাঁধা কোন রেট নেই। যার যেমন খুশী দেয়।

ঃ আমার কাছে কুড়িটা টাকা আছে, এর অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। দেরী করে লাভ নেই। এখনি নিয়ে নিন।

সোবাহান হাসল। চায়ের পানি ফুটছে। কেতলীতে চায়ের পাতা ছাড়ল। রফিক ছেলেটিকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। চমৎকার ছেলে।

রফিকের ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটা অনেকটা গুপ্তধন পাওয়ার মত। ঢাকা কলেজে তার সঙ্গে ইদরিস বলে একটা ছেলে পড়ত। মহা হাবামী। সবার সঙ্গে ফাজলামী করত। ফিজিক্স-এর নবী স্যারের মত কড়া লোকের ক্লাসেও একদিন বাঘের একটা মুখোশ পড়ে হাজির। নবী স্যার বেশ অনেক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয় রইলেন। সবার নিশ্বাস বন্ধ। না জানি কি হয়। নবী স্যার খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কি ব্যাপার?

ইদরিস বলল, কোন ব্যাপার না স্যার। ছোট ভাইয়ের জন্যে কিনেছিলাম। একটু পরে দেখলাম। এখন খুলে ফেলব।

ঃ খুব ভাল কথা। নাম কি তোমার?

ঃ আমার নাম ইদরিস।

ঃ ক্লাসের শেষে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

ঃ জ্বি স্যার।

নবী স্যার ইদরিসকে পঁচিশ টাকা ফাইন করে দিলেন।

সেই ইদরিস একদিন বাসায় এসে উপস্থিত। গলায় মাইক লাগিয়ে চিৎকার— তুই দেখি ব্যাটা দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেছিস।

ঃ চেষ্টা করছি।

ঃ শুনলাম বেকার?

ঃ আগে তো শুনেছিস, এবার স্বচক্ষে দেখ।

ঃ হা হা হা। ব্যাটা তোর রস কমেনি দেখি। চল আমার সঙ্গে।

ঃ কোথায়?

ঃ একটা ব্যবস্থা করে দেই।

ঃ কি ব্যবস্থা করবি?

ঃ বিজনেসে লাগিয়ে দেই। একটা ইনডেনটিং ফার্ম খুলে ফেল।

ঃ সেটা আবার কি?

ঃ কাগজে কলমে ব্যবসা। দালালী যাকে বলে।

ঃ করতে হয় কি?

ঃ কিছুই করতে হয় না। বড় বড় কানেকশন থাকতে হয়। তোর তা আছে। তোর শ্বশুর তো বিরাট মালদার পার্টি। চল তোকে নিয়ে বের হই।

রফিক বের হল। সারাদিন ঘুরল। ব্যবসার কথা-টথা বলল।

ঃ বুঝলি রফিক, তোর ব্রেইন আছে, তুই এই লাইনে উন্নতি করবি। ব্যবসা বুঝে নিতে মাস ছয়েক লাগবে তারপর দেখবি আঙুল ফুলে বটগাছ। মানুষের বেলায় সাধারণত কলাগাছ হয়, আমার ধারণা তোর বেলা হবে বটগাছ— যাকে বলে বটবৃক্ষ।

ঃ ক্যাপিটেল লাগবে না?

ঃ তা তো লাগবেই। লাখ তিনেক টাকা শুরুতে লাগবে।

ঃ সর্বনাশ! নয় মন তেলও হবে না রাধাও নাচবে না। তিন লাখ টাকা কে দেবে আমাকে?

ঃ ব্যাংক দেবে।

ঃ ব্যাংক কেন দেবে?

ঃ কেনর প্রশ্ন তুলিস না। ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ টাকা দশ ভূতে লুটে খাচ্ছে। ব্যাংকগুলি হচ্ছে কিছু সুবিধাবাদী লোকের টাকা মারার যন্ত্র। আমি তোকে লোন পাইয়ে দেব।

ঃ তোর স্বার্থ কি?

ঃ আছে, স্বার্থ আছে। বিনা স্বার্থে আমি কিছু করব নাকি? ইদরিস সেই ইদরিস নয়। এখনই সেটা বলব না। তুই আগে মনস্থির কর, বিজনেস করবি, না আদর্শ বাঙ্গালী ছেলের মত দশটা পাঁচটা অফিস করবি? তোকে সাতদিন সময় দিলাম। সাতদিন বসে বসে ভাব। এই সাতদিন আমার অফিসের কাজকর্ম দেখ। লোকজনের সঙ্গে কথা-টথা বল। তারপর এসে বল - ইয়েস অর নো।

আজ রফিকের সেই সাতদিনের শেষ দিন। সন্ধ্যাবেলায় ইদরিসকে কিছু একটা বলতে হবে। রফিক ঠিক করেছে সোবাহানের এখান থেকে বের হয়েই সে সোজাসুজি ইদরিসের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হবে। হ্যাঁ বলবে। না বলার কোন অর্থ হয় না।

সোবাহান দীর্ঘ সময় হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, আপনার ব্যবসা হবে। লেগে যান।

ঃ সত্যি বলছেন?

ঃ যা দেখছি তাই বললাম। আপনার হবে।

ঃ মেনি থ্যাংকস। তাহলে উঠি?

ঃ উঠবেন?

ঃ আমার একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। একজনের কাছে যাব।

ইদরিসের বাসা কলাবাগানে লেক সার্কাসে। বিশাল তিনতলা দালান। বাড়ির সামনে

ফুলের বাগান। ফোয়ারায় কালো পাথরের কি একটা মূর্তি, অনেকটা ময়ূরের মত দেখতে। যদিও এটা ময়ূর না। ইদরিস বাসায় ছিল না। সে এল রাত এগারোটায়। অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে রফিক। যায়নি— এখনো বসে আছে। ক্ষিধের যন্ত্রণায় প্রাণ যাবার মত অবস্থা। একফাঁকে রাস্তার এক রেষ্টুরেন্ট থেকে দু'টো পরোটা এবং এক টাকার ভাজী কিনে খেয়েছে। এইসব জিনিস সহজে হজম হতে চায় না। তাও হজম হয়ে দ্বিতীয়বার যখন ক্ষিধে পেল তখন ইদরিসের গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকল। গাড়ি থেকে নিজে নামার সামর্থ্য নেই। দু'তিনজন ধরে ধরে নামাল। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, তোর কি হয়েছে?

ইদরিস হাসিমুখে বলল, কিছুই হয় নাই দোস্ত। মদিরা পান করেছি। সপ্তায় একদিন মোটে খাই। আজ হচ্ছে সেই দিন। তোর কি ব্যাপার?

ঃ আজ থাক, অন্য একদিন বলব।

ঃ অন্য দিন বলার দরকার কি, আজই বল। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না কিন্তু মাথা পরিষ্কার আছে। হ্যাঁ নাকি না?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ গুড। কাল অফিসে আসবি। এগারোটার আগে আসবি।

ঃ ঠিক আছে -আসব।

ঃ মুনির মিয়া, আমার দোস্তকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

বলতে বলতেই ইদরিস হড়হড় করে বমি করল। যে দু'জন তাকে ধরে রেখেছিল তাদের একজন নোংরায় মাখামাখি হয়ে গেল। কিন্তু মুখ বিকৃত করল না। এই দৃশ্য সম্ভবত এদের কাছে নতুন নয়।

ঃ রফিক আছিস এখনো?

ঃ আছি।

ঃ জিনিসটা সহ্য হয় না, তবু খাই। তোর কাছে মিথ্যা বলেছিলাম, সপ্তাহে একদিন না রোজই খাই। রোজই এই অবস্থা।

ঃ তাহলে তো চিন্তার কথা।

ঃ চিন্তার কথা তো ঠিকই। মদ খেয়ে কোম্পানী লাটে তুলে দিয়েছি। তোর কাছে মিথ্যা বলব না রে ভাই, লাখ লাখ টাকা আমার দেনা। ডুবে যাচ্ছি, বুঝলি? তোর লেজ ধরে এখন ভেসে উঠতে চাই।

ইদরিস আবার বমি করতে লাগল। গেটের দারোয়ান এগিয়ে এসে রফিককে বলল, স্যার, আপনি চলে যান—একটা রিকশা নিয়ে চলে যান।

রফিক যেতে পারছে না। মাতালরা বমি করতে করতে সত্যি কথা বলতে থাকে। এই দৃশ্য সে কোন ছবিতেও দেখেনি। বড় অবাক লাগছে।

ঃ রফিক, আছিস?

ঃ আছি।

ঃ আমার জীবন নষ্ট হয়ে গেল রে দোস্ত। এক বেশ্যা মেয়ের জন্য নষ্ট হয়ে গেল।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ, মাগীর নাম কাঞ্চন। বুঝলি, আমি এক নরাধম। আচ্ছা দোস্ত, নরাধম কি সন্ধি না

সমাস? সব ভুলে মেরে বসে আছি।

দারোয়ান আরেকবার রফিকের কানেব কাছে ফিস ফিস করে বলল, বাড়ি যান স্যার। আপনি থাকলেই সমস্যা।

রফিক নড়ল না। দৃশ্যের শেষটা তার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আজ শাহানা এসেছে। বিয়ের পর এই তাব তৃতীয়বার আসা। বাড়িটা তার এখন কিছুতেই আগের মত লাগে না। এটা যেন অচেনা কোন মানুষের বাড়ি। নিজের বাড়ি নয়। অথচ সব আগের মতই আছে। শাহানার লাগানো টবের গাছগুলি আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে। সে এ বাড়িতে নেই, তাতে এদের যেন কিছু যায় আসে না। সে যদি এসে দেখতো তার অনুপস্থিতিতে এ বাড়ির সবাই পানি দিতে ভুলে গেছে, গাছগুলি মরা-মরা হয়েছে, তাহলে তার ভালো লাগতো।

সুন্দর সতেজ গোলাপ গাছগুলি দেখে তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। কত ফুল ফুটেছে। বিরাট বিরাট ফুল। সে প্রতিটি গাছেই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে লাগল। গোলাপের দু'টি কচি পাতা নিয়ে দু'আঙুলে পিষে নাকের সামনে ধবল। ফুলের ঘ্রাণের চেয়ে তার পাতার ঘ্রাণ ভাল লাগে। টুনী এবং বাবলু কৌতূহলী হয়ে দেখছে। টুনী বলল, কি করছ ফুপু?

ঃ গাছগুলিকে আদর করছি।

ঃ আদর করছ কেন?

ঃ অনেকদিন পরে এসেছি তো, তাই। বাবলু সাহেবের কি খবর?

বাবলু জবাব দিল না। পর্দার আড়ালে সরে গেল। তার লজ্জা বড় বেশী। তা ছাড়া শাড়ি গয়নায় এখন শাহানাকে অপরিচিত লাগছে। টুনী বলল— ফুপু, বাবলুর বাবা এসেছিল।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হুঁ। মা খুব বকা দিয়ে দিয়েছে।

ঃ বকা দিয়েছে?

ঃ হুঁ। মা একদিন আব্বুকেও বকা দিল।

ঃ ভাবী মনে হচ্ছে বকা দেয়ায ওস্তাদ হয়ে যাচ্ছে।

ঃ হ্যাঁ হচ্ছে। দাদীকেও বকা দিল, এই জন্যে দাদীর অসুখ হয়ে গেল।

ঃ আমি থাকলে হয়ত আমাকেও বকা দিত। কি, দিত না?

ঃ হ্যাঁ দিত।

টুনী মুগ্ধ হয়ে শাহানাকে দেখছে। তাব খুব ভাল লাগছে। এত সুন্দর হয়েছে ফুপুমণি, শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

ঃ এমন ড্যাব ড্যাব করে কি দেখছিস বে টুনী?

ঃ তোমাকে দেখছি, তুমি কত সুন্দর হয়েছ।

ঃ নতুন করে আবার হব কি রে বোকা? আমি তো আগে থেকেই সুন্দর, তাই না?

ঃ হুঁ।

ঃ আচ্ছা টুনী, আনিস ভাই আব ফুল নিতে আসে না? গোলাপের ম্যাজিক দেখাতে তার ফুল লাগে না?

ঃ ম্যাজিক দেখায় না তো।

ঃ সে কি! কি করে এখন?

ঃ মাস্টারী করে।

ঃ বলিস কি?

শাহানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন কথাটা সে বিশ্বাস করতে পাবছে না। তার চেহারাটা কেমন দুঃখী হয়ে গেল। সে মৃদু গলায় বলল, চট করে ছাদে গিয়ে দেখে আয় তো, আনিস ভাই আছে কিনা। আমার কথা কিছু বলবি না, খবরদার! বললে চড় খাবি।

শাহানা মা'র ঘরে ঢুকল। মনোয়ারা গম্ভীর মুখে শুয়ে আছেন। গলা পর্যন্ত চাদর টানা। শাহানাকে ঢুকতে দেখেও কিছু বললেন না। শাহানা বলল, অসময়ে শুযে আছ যে মা? জ্বর নাকি?

মনোযারা [illegible] দিলেন না। মেয়ের মুখেব উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

ঃ আমাব উপর রাগ করেছ নাকি মা?

ঃ না, রাগ করব কেন?

ঃ তাহলে এমন রাগী বাগী মুখ করে রেখেচ কেন?

ঃ বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের উপর রাগ করব কোন্ সাহসে?

ঃ তাব মানে?

ঃ পরের বাড়ির মেয়ে রাতের পর রাত হাসপাতালে থেকে আমার সেবা করে। আর নিজের পেটের মেয়ে একবাব খোঁজ নিতেও আসে না।

শাহানা লজ্জিত স্বরে বলল, আমরা চিটাগাং চলে গিয়েছিলাম মা। আমার একেবারেই যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ও এমন করে বলল. ...

ঃ গিয়েছ ভাল করেছ। শুধু চিটাগাং কেন, হিল্লী যাও দিল্লী যাও— কাশ্মীর যাও।

মনোয়ারা পাশ ফিরলেন। শাহানা কিছু সময় বসে বইল তাঁব বিছানায়। মা'র রাগ মনে হচ্ছে চট কবে ভাঙ্গানো যাবে না। মাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করতে হবে। কিন্তু কেন জানি না তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে না। সে যে মাকে দেখতেও যায় নি তার জন্যে খুব অনুশোচনাও বোধ হচ্ছে না। সে এমন বদলে গেল কেন?

শাহানা মা'র ঘরে থেকে বের হয়ে আবার বারান্দায় তাব টবের গাছগুলির কাছে গেল। সেখান থেকে বসার ঘরে। তার কিছু করার নেই।

বসার ঘরে জহির চুপচাপ বসে আছে। হোসেন সাহেব অতি উৎসাহে হোমিওপ্যাথির গল্প করছেন।

ঃ বুঝলে জহির, যাকে বলে মিরাকল। কিডনি ভর্তি গজগজ করছিল পাথর। সবচে বড়টার সাইজ পায়রার ডিমের মত। দাস বাবু রোগীকে দিলেন থ্রি হানড্রেড পাওয়ারের কেলিফস। মজার ব্যাপার কি জান?

ঃ কি?

ঃ কিডনিব পাথবেব জন্যে কিন্তু কেলিফস না।

ঃ কাজ হল কেলিফসে?

ঃ হবে না মানে? বললাম না, মিবাকল। দু'টা মাত্র ডোজ, প্রথম ডোজেব আটচল্লিশ ঘন্টা পব সেকেন্ড ডোজ। অল ক্লিয়াব।

ঃ বাহ্, খুব আশ্চর্য।

ঃ আশ্চর্য তো বটেই। এক্সবে কবে দেখা গেল পাথবেব বংশটাও নেই, ভ্যানিশ- অন্তর্ধান।

শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনল। এমন মজা লাগছে শুনতে। কেমন শিশুর মত ভঙ্গিতে বাবা কথা বলেন। বিস্মিত হবাব কি অসাধাবণ ক্ষমতা এই মানুষটিব।

হোসেন সাহেব মেয়েব দিকে এক পলক তাকিয়ে ছোট একটা ধমক দিলেন, জহিবকে চা টা কিছু দে। তোব কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?

শাহানাব কাছে এই ধমক বড মধুব লাগল। ঠিক আগেব মত বাবা তাকে ধমক দিলেন। যেন এখনো তাব বিয়ে হয নি। সে বাডিবই একটি আদুবে মেয়ে যে কোন কাজকম শেখেনি। শুধু গল্প শোনে।

আবেগে শাহানাব চোখ ভিজে উঠল। সে এগিয়ে গেল বান্নাঘবেব দিকে।

বান্নাঘবে নীলু খুব ব্যস্ত। একটি চুলায সে ফুলকপিব বডা ভাজছে। অন্যটিতে চায়েব পানি ফুটছে।

ঃ বাবা চা চাচ্ছেন, ভাবী।

ঃ দিচ্ছি। বডাগুলি হয়ে যাক।

ঃ চা-টা আমি বানাই।

ঃ তোমাকে কিছু কবতে হবে না। মা'ব সঙ্গে গিয়ে গল্প কব।

ঃ তুমি আজ অফিসে যাও নি?

ঃ না, আমি দশ দিনেব ছুটি নিয়েছি।

ঃ কেন?

ঃ অনেক বকম ঝামেলাব মধ্যে আছি। কবিব মামাব জন্যে হাসপাতালে খাবাব পাঠাতে হয। এদিকে মা'ব অসুখ। তোমাব কিন্তু একবাব কবিব মামাকে দেখতে যাওযা উচিত শাহানা।

ঃ যাব। কাল-পবশুব মধ্যে যাব।

ঃ কবিব মামা তোমাব কথা আব জহিবেব কথা জিজ্ঞেস কবছিলেন। নাও একটা বডা খেয়ে দেখ তো, কেমন হয়েছে। সস দিয়ে মাখিয়ে খাও। কি, ভাল?

ঃ খুব ভাল হয়নি ভাবী। কেমন যেন ঘাসেব মত লাগছে।

নীলুব মুখ কালো হয়ে গেল। সে খুব যত্ন কবে বানিয়েছে। শাহানা বলল, ঠাট্টা কবছিলাম ভাবী। খুব চমৎকাব হয়েছে।

ঃ সত্যি?

ঃ এই যে, তোমাব গা ছুঁয়ে বলছি। ছোট ভাবী কোথায?

ঃ নিউ মার্কেটে গিয়েছে, এসে পডবে। যাও তো শাহানা, এগুলি দিয়ে আস। আমি চা নিয়ে আসছি।

শাহানা ট্রেতে খাবাব সাজাতে সাজাতে বলল এ বাডিব কেউ আমাকে পছন্দ কবে না

ভাবী।

নীলু চুপ করে রইল। লক্ষবার শাহানার মুখে এই কথা শুনতে হয়েছে। জবাব দিতে হয়েছে। জবাব শাহানার পছন্দ হয়নি। যে কোন কারণেই হোক, ব্যাপারটা শাহানার মনে গেঁথে গিয়েছে। এই কাঁটা সহজে তোলা যাবে না।

ঃ ভাবী!

ঃ শুনছি, বল কি বলবে?

ঃ মা'র অসুখ হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, এই খবর কেউ আমাকে দেয় নি।

ঃ সঙ্গে সঙ্গে দেয়নি, কিন্তু দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ দেয়ার উপায় ছিল না। তোমার ভাই এবং রফিক কেউ বাসায় ছিল না। ওরা ফিরেছে অনেক রাতে।

ঃ ইচ্ছে করলে কিন্তু দেয়া যেত ভাবী। হাসপাতাল থেকে সহজেই টেলিফোন করতে পারতে। আমার টেলিফোন নাম্বার তোমরা জান।

ঃ ঝামেলার মধ্যে এটা মনে আসেনি।

ঃ আমাকে যদি তোমরা পছন্দ করতে তাহলে ঠিকই মনে আসতো।

নীলু হেসে ফেলল।

শাহানা শুকনো গলায় বলল, ভাইয়া এত বড় প্রমোশন পেয়েছে, এই খবরও কিন্তু দাও নি।

ঃ দিতে চেয়েছিলাম। তোমার ভাইয়া নিষেধ করল। তার স্বভাব তো তুমি জান। কাউকেই কিছু জানাতে চায় না।

নীলুর কথা শেষ হবার আগেই শাহানা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেন সে এ বাড়িতে এসেছে? কোন দরকার ছিল না। কেউ তাকে নিয়ে ভাবে না, সে কেন ভাববে? তার এমন কি গরজ? টুনীকে আনিস ভাইয়ের খবর আনতে পাঠিয়েছিল, সেও ফিরে আসেনি। কেনই বা আসবে? সে তাদের কে— কেউ না।

শাহানা খাবার কিছুই মুখে দিল না। দু'চুমুক চা খেয়ে ছাদে গেল। আনিসের ঘর খোলা। সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হালকা স্বরে বলল, আসব আনিস ভাই?

আনিস নিজের বিস্ময় চাপা দিয়ে হাসিমুখে বলল, আরে কি মুশকিল, এসো!

ঃ করছেন কি?

ঃ তেমন কিছু না। বস শাহানা।

ঃ বসবার সময় নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাব। ম্যাজিক নাকি ছেড়ে দিয়েছেন?

ঃ কে বলল?

ঃ টুনী। এখন নাকি মাস্টারী করবেন?

ঃ পাগল হয়েছ? মাস্টারী করব কোথায়? দু'টা প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় করেছি। সন্ধ্যাবেলা তাই করি। খাদ্য যোগাড় করতে হবে না? ম্যাজিক দিয়ে পেটে ভাত আসছে না। একটু বস না শাহানা।

শাহানা বসল। আনিস বলল, চা খাবে? চা বানাব?

ঃ হুঁ খেতে পারি। আচ্ছা আনিস ভাই, আপনাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছিলেন?

ঃ পেয়েছি।

ঃ একবার তো জিজ্ঞেস করলেন না, আমার কি অসুখ হয়েছিল?

ঃ চোখের সামনে তোমাকে এত সুস্থ দেখছি যে অসুখের কথা আর মনে এল না।

ঃ এখন অন্তত জিজ্ঞেস করুন।

ঃ কি হয়েছিল?

ঃ খুব খারাপ ধরনের অসুখ। আমি বোধহয় বেশীদিন বাঁচব না।

ঃ কি বলছ তুমি?

ঃ সত্যি বলছি। বিশ্বাস করুন। এই খবরটা আর কাউকে বলিনি, শুধু আপনাকে বললাম।

ঃ অসুখটা কি?

ঃ তা আমি জানি না।

শাহানা তার মুখ খুব করুণ করতে চেষ্টা করল। যেন তার সত্যি সত্যি খারাপ একটা অসুখ হয়েছে। মৃত্যু অবধারিত। আর মাত্র অল্প ক'দিন সে বাঁচবে। পৃথিবীর চমৎকার সব দৃশ্য আগের মতই থাকবে। বর্ষারাতে বৃষ্টি পড়বে ঝম ঝম করে। চৈত্র মাসে উথালপাথাল জোছনা হবে। শুধু সে দেখতে পাবে না। ভাবতে ভাবতে তার চোখে পানি এসে গেল। গাল বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে, কিন্তু আনিস সেটা দেখছে না— সে চা বানানোয় ব্যস্ত। অথচ শাহানার খুব ইচ্ছা আনিস দৃশ্যটা দেখুক।

আনিস না দেখলেও জহির দৃশ্যটি দেখল। সে ছাদে এসেছিল সিগারেট খাবার জন্যে। আনিসের ঘর খোলা দেখে উঁকি দিয়েই চট করে সরে গেল। ছাদের এক কোণায় দাঁড়িয়ে পর পর দু'টি সিগারেট শেষ করে নিঃশব্দে নেমে গেল। আনিসের খোলা দরজা দিয়ে তার আরেকবার তাকানোর ইচ্ছে ছিল কিন্তু তাকাল না। সব ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিতে নেই। সে নীচে নেমে এল।

বসার ঘরে দ্বিতীয়বার ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। হোসেন সাহেবের হোমিওপ্যাথিক গল্প তাকে কখনো আকর্ষণ করেনি, আজ আরো করছে না। ঘরে ঢুকলে তিনি আবার শুরু করবেন।

হাসি হাসি মুখে গল্প শুনতে হবে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে হবে যাতে মনে হয় খুব আগ্রহ নিয়েই শুনছে।

ঃ এই যে জহির, তুমি এখানে?

ঃ জ্বি।

হোসেন সাহেবের হাতে মোটা একটা বই। তিনি দ্রুত বইয়ের পাত ওল্টাতে লাগলেন, তোমাকে খুব ইন্টারেস্টিং একটি কেইস হিস্ট্রি পড়ে শুনাই।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ বিরক্ত হচ্ছ না তো আবার?

ঃ জ্বি না, বিরক্ত হব কেন?

ঃ আস ঘরে আস।

তারা ভেতরে গিয়ে বসল। জহির প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল মুখ হাসি হাসি রাখতে। হোসেন সাহেব কি বলছেন তা শুনতে। কিন্তু মন বসছে না। হোসেন সাহেব চোখ বড় বড় করে বলছেন— বিমলা নামের একটি মেয়ের কেইস হিস্ট্রি। বয়স একুশ, বিবাহিতা, গাত্রবর্ণ গৌর, একাহারা গড়ন, মৃদুভাষী, ভোগী স্বভাব, কিছুটা অলস। পয়েন্টগুলি মন দিয়ে শুনছ

তো? প্রতিটি পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ডায়াগনোসিস এই পয়েন্টগুলির উপর হবে।

ঃ আমি মন দিয়েই শুনছি।

ঃ আরেক কাপ চা খেয়ে শুরু করা যাক, কি বল তুমি?

ঃ না থাক।

ঃ থাকবে কেন? খাও আরেক কাপ। আমি বৌমাকে বলে আসছি। তোমাকে পেয়ে ভালই হল। কারও সঙ্গে ডিসকাস করতে পারি না। কেউ উৎসাহ দেখায় না। তোমার ভাল লাগছে না শুনতে?

ঃ জ্বি লাগছে।

ঃ লাগতেই হবে। গল্প উপন্যাসের চেয়ে এগুলি অনেক বেশী ইন্টারেস্টিং।

হোসেন সাহেব চায়ের কথা বলতে গেলেন।

জহিরদের রাতে এ বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল না, নীলুর পীড়াপিড়িতে খেয়ে যেতে হল। অল্প সময়েই ভাল আয়োজন হয়েছে। রফিক নিউ মার্কেট থেকে বিশাল সাইজের কই মাছ নিয়ে এসেছে। মটরপোলাও, কইমাছ ভাজা এবং ভুনা গোসত। খেতে বসে শাহানা বলল, আনিস ভাইকে ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয়? বেচারা বোধ হয় আলুভর্তা দিয়ে ভাত খাবে।

নীলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল শাহানার দিকে। শাহানা সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝল না। সে হাসি মুখে বলল, ভাবী, আনিস ভাইকে আমি ডেকে নিয়ে আসি? তোমাদের খাবারে কম পড়বে না তো আবার?

নীলু কিছু বলার আগেই জহির বলল, কম পড়বে কেন? তোমরা খাওয়া শুরু কর, আমি ডেকে নিয়ে আসছি।

শাহানা বলল, তোমায় যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি। যাব আর আসব।

শাহানা বের হয়ে গেল। জহির তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। নীলু কি তা বুঝতে পারছে? সে একবারও জহিরের দিকে তাকাচ্ছে না। হোসেন সাহেব বললেন, হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন, খাওয়া শুরু কর।

জহির বলল, আনিস সাহেব এলেই শুরু করব।

আনিসকে পাওয়া গেল না। সে প্রাইভেট ট্যুশানীতে গিয়েছে। শাহানাকে দেখে মনে হল সে খুব মন খারাপ করেছে। তার মুখ শুকনো। চোখ দুটি ছায়াচ্ছন্ন।

হোসেন সাহেব বললেন, অপূর্ব রান্না হয়েছে বৌমা! অপূর্ব! কই মাছ আর একটা নেওয়া যাবে?

রফিকের ধারণা ছিল মাতাল অবস্থায় লোকজন সত্যি কথা বলে। সে অবশ্যি মাতাল দেখেছে খুব কম। যাদের দেখেছে তাদের সবাই কুলী বা রিকশাওয়ালা শ্রেণীর। এদের

একজন কাপড়চোপড় খুলে মেয়েদের দিকে অশ্লীল ভঙ্গি করছিল। এতে আশপাশের পাবলিক খেপে গিয়ে তাকে ধোলাই দিতে শুরু করে। হাত জোড় করে সে বার বার বলতে থাকে— ভাই মাপ করেন। আর জীবনে মদ খামু না। এই কানে ধরলাম ভাই। দ্বিতীয় মাতালটি একটি ঠেলাগাড়ির উপর বসে বেশ করুণ সুরে গান গাচ্ছিল। ঠেলাওয়ালা সবাইকে বলতে বলতে যাচ্ছে— ব্যাটা মদ খাইছি। ঠেলাওয়ালাকে খুব খুশী মনে হচ্ছিল। একজন মাতাল তার গাড়িতে বসে সবার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করছে, এটা বোধহয় তাকে খুব আনন্দ দিচ্ছিল। পাবলিকও দৃশ্যটিতে মজাই পাচ্ছিল।

মাতালরা সত্যবাদী হয়, এরকম ধারণা হবার মত কোন কারণ রফিকের জানা ছিল না। তবু কেন জানি সে এটা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নিয়েছিল। ব্যাপারটা সেই কারণে তাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিল। ব্যাটার মতলবটা কি?

বেশ কয়েকবার যাওয়া আসা করেও তার মতলব পরিষ্কার হল না। বরং মনে হল সত্যি সত্যি ইদরিস রফিকের জন্যে কিছু করতে চায়। ব্যাংক লোনের জন্যে ক্লান্তিহীন ছোটাছুটিও সে আগ্রহ নিয়ে করছে। তার চেয়েও অদ্ভুত কথা, মাতাল অবস্থায় ঐ রাতে সে যা বলেছে তার কোনটিই দেখা গেল সত্যি নয়। ধার-দেনা তার একেবারে নেই। মদ সে সপ্তাহে একদিন খায়, তাও নিজের পয়সায় নয়, অন্যদের পয়সায়।

কাঞ্চন বলে একটা মেয়ের অস্তিত্ব অবশ্যি আছে। কলগার্ল ধরনের মেয়ে। ইদরিস তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মেয়েটিকে প্রায়ই ক্লায়েন্টের কাছে পাঠায়। কাঞ্চন সেই উপলক্ষে মোটা কমিশন পায়। ব্যাপার এইটুকুই।

রফিক একদিন বেশ অবাক হয়েই বলল, মাতাল অবস্থায় তুই তাহা মিথ্যা কথাগুলি বললি?

ইদরিস হাসি মুখে বলল, সত্যি কথা বলব আমি? পাগল হয়েছিস? ব্যবসা করে খাই না? সত্যি কথা বললে ভাত জুটবে?

ঃ ব্যবসায়ী হলেই সারাক্ষণ মিথ্যা কথা বলতে হবে?

ঃ তা তো হবেই। সত্যি কথাগুলি এমন ভাবে বলতে হবে যাতে শুনলে মনে হবে মিথ্যা। হা হা হা। তারপর যখন ব্যবসা ফুলেফেঁপে বিশাল হয়ে যাবে তখন কথাবার্তা বলা একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। তখন কথা বলবে ভাড়া করা লোক। বুঝতে পারছিস?

ঃ এখনো পারছি না, তবে চেষ্টা করছি।

ঃ বিরাট ব্যবসায়ীরা দেখবি ব্যবসা নিয়ে একেবারেই কথাবার্তা বলে না। তারা কথাবার্তা বলে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ তোকে একদিন এরকম একজনের কাছে নিয়ে যাব। বিড়ির বিজনেস করে লাল হয়ে গেছে। এখন রবীন্দ্র-চর্চা করে। বিরাট এক প্রবন্ধও লিখেছে— রবীন্দ্র কাব্যে মুসলমানী শব্দ।

ঃ পয়সা হয়েছে বলেই সে রবীন্দ্র-চর্চা করতে পারবে না, এমন তো কোন কথা নেই।

ঃ তা নেই। রবীন্দ্র-চর্চা, পিকাশো চর্চা—সব চর্চার মূল হচ্ছে টাকা। এইটা থাকলে সব কলার চর্চা করা যায়।

ইদরিসের যোগাযোগ এবং কাজ করবার, কাজ গোছাবার কায়দা দেখে রফিক সত্যিকার

অর্থেই মুগ্ধ। একটি পয়সা এডভান্স না দিয়ে সে মতিঝিলে রফিকের জন্যে দু'কামরার এক অফিস যোগাড় করে ফেলল। টি এণ্ড টির বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সে কি বলল কে জানে, তাঁরা আশ্বাস দিলেন এক মাসের মধ্যে টেলিফোন লাইন পাওয়া যাবে। ফার্নিচারের দোকান থেকে বাকিতে ফার্নিচার চলে এল। রফিক মুখ শুকনো করে বলল, আমার তো ভাই ভয় ভয় লাগছে। সামাল দেব কি ভাবে?

ঃ সামাল দেয়ার লোকও তোর জন্যে ব্যবস্থা করেছি। এই লাইনের মহা ঘাগু লোক। তোর নতুন ম্যানেজার। নাম হল সাদেক আলি। তবে ব্যাটাকে বিশ্বাস করবি না। তোর বিশ্বাস অর্জনের সব চেষ্টা সে করবে। তুইও ভাব দেখাবি যে বিশ্বাস করছিস, কিন্তু আসলে না।

ঃ এ রকম একটা লোককে তুই আমার সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছিস কেন?

ঃ তোর ভালর জন্যেই দিচ্ছি। সাদেক আলি তোর ফার্মকে দাঁড় করিয়ে দেবে। যখন দেখবি তুই নিজে মোটামুটি দাঁড় হয়ে গেছিস তখন ব্যাটাকে লাথি দিয়ে বের করে দিবি।

ঃ এটা কেমন কথা?

ঃ খুবই জরুরী কথা। নয়ত ব্যাটা তোর সর্বনাশ করে ভাগবে।

রফিক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সব কিছু হচ্ছে ঝড়ের গতিতে। এটা কি ঠিক হচ্ছে? শেষ পর্যন্ত বড় বকমের ঝামেলায় পড়তে হবে না তো? আমও যাবে ছালাও যাবে? তার ভরাডুবি কি আসন্ন?

এইসব কথাবার্তা সে অবশ্যি বাসায় কিছুই বলেনি। শারমিনের সঙ্গেও নয়। শারমিনের সঙ্গে তার একটা ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলছে। সন্ধির কোন রকম ইশারাও পাওয়া যাচ্ছে না। রাতে দু'জন দু'দিকে ফিরে ঘুমায়। এই অবস্থায় ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা জমে না। তাছাড়া শারমিনের সন্দেহ বাতিক আছে। এক লক্ষ প্রশ্ন করবে— কেন তোমার এই বন্ধু তোমার জন্যে এত কিছু করছে? তার স্বার্থ কি? তোমার কতদিনের বন্ধু? কই আগে তো তার নাম শুনিনি? তার আসল মতলবটা কি?

এই জাতীয় প্রশ্ন রফিকের মনেও আসে বলেই সে অন্য কারো মুখ থেকে শুনতে চায় না। তারচে যে ভাবে আগাচ্ছে আগাক।

নীলুর সঙ্গে একবার অবশ্যি কিছু কথা হয়েছে। তাও ভাসা ভাসা কথা। যেমন একদিন রফিক বলল-- Arron International নামটা তোমার কেমন লাগে ভাবী?

ঃ ভালই লাগে।

ঃ এটা হচ্ছে আমার ফার্মের নাম।

ঃ ফার্ম আবার কবে দিলে?

ঃ দেই নি এখনো, দেব।

ঃ ও তাই বল। এখনো পরিকল্পনার স্টেজে আছে।

ঃ হুঁ, তবে খুব শীগগিরই ড্রামাটিক একটা ডিক্লেরেশন আমার কাছ থেকে শুনতে পারবে। তখন আকাশ থেকে পড়বে।

ঃ তোমার সব ডিক্লেরেশনই তো ড্রামাটিক।

রফিক আর কিছু বলল না। বেশী কিছু বলতে সাহসও হল না। যদি ব্যাংকলোন শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায়? তরী সাধারণত তীরে এসেই ডোবে, মাঝনদীতে ডোবে না।

রফিক চিন্তিত মুখে ঘুবে বেড়ায়। ব্যাংকলোন নিয়ে ছোটাছুটি কবতে থাকে তার নতুন ম্যানেজার সাদেক আলি। ভালমানুষের মত চেহারা। মনে হয় বুদ্ধিবৃত্তি পুরোপুরি বিকশিত হয় নি। অথচ বফিক এর মধ্যেই বুঝেছে— এ মহা ধুরন্ধর।

সাদেক আলিকে নিয়েও বফিক সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় ভোগে। তার রাতে ভাল ঘুম হয় না। বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নগুলিরও কোন আগা-মাথা নেই। একটা স্বপ্ন ছিল এরকম— সে এবং সাদেক আলি প্রাণপণে ছুটছে। দুজনের গায়েই কোন কাপড় নেই। তাদের তাড়া করছে বাবলুর বয়সী একদল ছেলে। সাদেক আলি বার বার বলছে— এরা বড় যন্ত্রণা কবছে। স্যাব, বন্দুক দিয়ে একটা গুলি করেন। এই জাতীয় স্বপ্নের কোন মানে হয়?

হোসেন সাহেব বসার ঘরে ঢুকে দেখলেন মাঝবয়েসী একজন অপরিচিত লোক বসে আছে। লোকটি খুব কাযদা করে সিগাবেট টানছে এবং পা নাচাচ্ছে। হোসেন সাহেব বললেন, জনাব, আপনাব নাম?

ঃ স্যার, আমাব নাম সাদেক আলি।

বলতে বলতে লোকটি এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম কবল। তিনি হকচকিযে গেলেন। বিব্রত কণ্ঠে বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

ঃ আমি দি এ্যারন ইন্টারন্যাশনালের জেনারেল ম্যানেজার।

ঃ ও, আচ্ছা আচ্ছা।

ঃ স্যার কি আছেন?

ঃ সফিক তো চিটাগাং গিয়েছে।

ঃ আমি রফিক স্যারের কাছে এসেছিলাম।

ঃ ওর কাছে কি জন্যে?

ঃ দি এ্যারন ইন্টারন্যাশনালের ব্যাংকলোন পাওয়া গেছে। এই সুখববটা স্যারকে দেবার জন্যে এসেছিলাম।

হোসেন সাহেব কিছুই বুঝলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ বেশীক্ষণ বসতে পাবব না। স্যারকে খবরটা দিয়ে দেবেন। স্যাব এটা নিযে দুশ্চিন্তা করছিলেন।

ঃ কি খবর দেব?

ঃ বলবেন ব্যাংকলোনটা হয়েছে।

ঃ জ্বি আচ্ছা বলব। একটু চা খান।

ঃ চা আমি খাই না, তবে আপনি মুরুব্বী মানুষ বলছেন এই জন্যেই খাব।

সাদেক আলি কিছুক্ষণেব মধ্যেই জমিয়ে ফেলল। হোসেন সাহেবের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হল যে দেশ থেকে এলোপ্যাথি চিকিৎসা তুলে দেয়া দরকার। প্রতি ডিসট্রিক্টে থাকা দরকার একটা করে হোমিও হাসপাতাল। দরকার একটি হোমিও ইউনিভার্সিটির। হোসেন সাহেব লোকটির আদব- কায়দা-ও ভদ্রতায় মুগ্ধ হলেন। রাতে ভাত খাবাব সময় নীলুকে বললেন, ম্যানেজার সাহেব বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ঃ কোন্ ম্যানেজার?

ঃ সাদেক আলি সাহেব। রফিকের কাছে ব্যাংকের কি একটা কাজে এসেছে। আমার তো মনে থাকবে না। তুমি রফিককে বলে দিও।

ঃ কি বলব?

ঃ ম্যানেজার সাহেব এসেছেন। এটা বললেই হবে।

রফিক এল রাত এগারোটার দিকে। সে হাসপাতালে কবির মামাকে দেখতে গিয়ে আটকা পড়ে গিয়েছিল। কবির মামাব হঠাৎ জ্বর বেড়ে গেছে, আবোলতাবোল কথা বলছেন— অনেকটা বক্তৃতার ঢং। সাধু ভাষায় বক্তৃতা— সুধী সমাজেব নিকট আকুল আবেদন।

হে বন্ধু হে প্রিয়, সংযত হোন। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করুন। শরৎকালের এই সুন্দর মেঘমুক্ত প্রভাত...।

রফিক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ব্যাপার কি? মাঝবয়েসী একজন ডাক্তার শুকনো মুখে বললেন, বুঝতে পারছি না, ডিলেরিয়াম মনে হচ্ছে। ডিলেরিয়াম হবার মত জ্বর তো নয়— একশ দুই।

ঃ কিছু একটা করুন। মামার এই কুৎসিত বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে না। হাসি এসে যাচ্ছে। এখানে হাসা ঠিক হবে না।

ডাক্তার বিরক্ত মখে তাকালেন।

ঃ আপনি রুগীর কে হন?

ঃ ভাগ্নে হই।

ঃ আমার মনে হয় রুগীকে বাড়ি নিয়ে ফ্যামিলির কেয়ারে বাখাই ভাল।

ঃ শেষ অবস্থা নাকি?

ঃ কী ধরনের কথা বলছেন? শেষ অবস্থা হবে কেন?

ঃ এখনি বাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলছেন, এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

ঃ কাল পরশু নিয়ে যান।

ঃ সেখানে যদি এ রকম বক্তৃতা শুরু করেন, তখন কি কবব?

ডাক্তার সাহেব বেশ কিছু সময় কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, দয়া করে আমার সঙ্গে রসিকতা করবেন না। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।

ঃ বাইরে তো বসার কোন ব্যবস্থা নেই।

ঃ বসার ব্যবস্থা না থাকলে হাঁটাহাঁটি করুন।

রফিক আর কথা বাড়াল না। হাসপাতালের বারান্দায় রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। ফেরার আগে দেখে এল, কবির মামা শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। এখন সে বাড়ি চলে গেলে দোষ হবে না।

দরজা খুলে দিল শারমিন। শারমিনের মুখ গম্ভীর। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সে হাই চাপতে চাপতে বলল, খাবে, না খেয়ে এসেছ?

রফিক তার জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। তাদের দু'জনের মধ্যে এখন কথাবার্তা প্রায় নেই বললেই হয়। প্রায় রাতেই রফিক বাড়ি ফিরে দেখে শারমিন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজই ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। এখনো জেগে আছে।

শারমিন তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। রফিককে তোয়ালে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, ভাত খাবে?

ঃ হ্যাঁ খাব। তোমার থাকাব দবকার নেই, ঘুমিয়ে পড়। যা হয় আমিই ব্যবস্থা করব।

ঃ তোমাকে একটি কথা বলার জন্যে জেগে আছি।

ঃ বল।

ঃ খেতে বস, বলছি।

ঃ সিরিয়াস কিছু?

ঃ না, খুবই সাধারণ। তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা কি বলব?

খুবই সাধারণ কথাগুলি রফিক শুনল। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। শারমিনের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, সে পি এইচ ডি কবার জন্যে দেশের বাইরে যাবে। খাওয়া এবং ঘুমানোর এই রুটিন তার আর ভাল লাগছে না।

রফিক হাত ধুতে ধুতে বলল, যাবে কি ভাবে?

শারমিন বলল, অন্য সবাই যে ভাবে যায় সেই ভাবেই যাব। প্লেনে করে। হেঁটে হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব নয়।

ঃ সব ঠিকঠাক নাকি?

ঃ মোটামুটি ঠিকঠাক বলতে পাব। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ফরেন স্টুডেন্ট এ্যাডভাইজার আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন—আমাব একটা টিচিং এ্যাসিসটেন্টশিপ পাওয়ার সম্ভবনা আছে।

ঃ চিঠি কবে এসেছে?

ঃ সপ্তাহখানেক আগে।

ঃ এই এক সপ্তাহ বসে বসে ভাবলে?

ঃ হ্যাঁ। আমি ঘুমুতে গেলাম। তুমি বাতি নিভিয়ে এস।

রফিক বসার ঘরে দীর্ঘ সময় বসে বইল। একবার ভাবছিল জিজ্ঞেস করবে— ব্যবস্থা কে করে দিলেন, সাব্বির সাহেব? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সাব্বির-প্রসঙ্গে সে কোনদিন কিছু বলবে না এরকম প্রতিজ্ঞা একবার কবেছে। প্রতিজ্ঞা কবা হয় প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার জন্যেই। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা সে ভাঙ্গবে না। তার চা খেতে ইচ্ছে কবছে। রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই বানিয়ে নিতে পারে কিন্তু আলসী লাগছে। ঘুম-ঘুমও পাচ্ছে, যদিও জানে বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম পালিয়ে যাবে। তার পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমুবে শাবমিন। তার গায়ে হাত রাখলে ঘুমের ঘোরেই সে হাতে সরিয়ে দিয়ে বিবক্ত গলায় বলবে— 'আহ'। তারচে এখানে বসে বসে মশার কামড় খাওয়াই ভাল।

অনেক রাতে নীলু টুনীকে বাথরুম কবাবার জন্যে দরজা খুলল।

ঃ কি ব্যাপার রফিক, জেগে আছ যে?

ঃ ঘুম আসছে না ভাবী।

ঃ তোমার কাছে কে যেন এসেছিল। কি এক ম্যানেজার। বাবার সঙ্গে গল্প করছিল।

রফিক কোন রকম উৎসাহ দেখাল না। ক্লান্ত গলায় বলল, শারমিন তোমাকে কি কিছু বলেছে ভাবী?

ঃ কোন্ প্রসঙ্গে?

ঃ বাইরে যাবার ব্যাপারে।

ঃ না তো। কোথায় যাচ্ছে?

রফিক জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল। বাতি নেভাতে নেভাতে বলল, সকালে বলব।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। ঘুম আসছে না। পাশেই শারমিন।

গায়ের সঙ্গে গা লেগে, তবুও দু'জনের মধ্যে অসীম দূরত্ব। এই দূরত্ব কমানোর কোনই কি উপায় নেই? রফিক ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। কবির মামার কথাটা ভাবীকে বলা হয় নি। তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। ঝামেলার উপর ঝামেলা।

রফিক একটু লজ্জিত বোধ করল। নিজের সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য সব এখন ঝামেলা।

নীলুও জেগে আছে। সফিক বাড়িতে না থাকলে তার এ রকম হয়। সারাক্ষণ একটা চাপা ভয় বুকের উপর বসে থাকে। মনে হয় এ বাড়িতে যেন কোন পুরুষমানুষ নেই। বড় কোন বিপদ আপদ হলে কে সামলাবে? হয়ত আগুন লেগে গেল, চোর এল বাড়িতে কিংবা ডাকাত পড়ল— তখন কি হবে?

নীলু মাঝে মাঝে ভাবে, সব মেয়েরাই কি তার মত ভাবে? এই নির্ভরশীলতার কারণটা কি?

টুনী শক্ত করে তার গলা চেপে ধরে আছে। ফাঁসের মত লাগছে। বিশ্রী অভ্যাস মেয়েটার। ঘুমের সময় হাতের কাছে যা পাবে তাই শক্ত করে ধরবে। নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল, টুনী ঘুমাচ্ছিস?

টুনী জবাব দিল না।

ঃ হাতটা একটু আলগা কর মা। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

টুনী আরো শক্ত করে গলা চেপে ধরল। ঘুমের ঘোরেই বলল, কমলা খাব না। বললাম তো খাব না।

কবির মামা বাড়ি ফিরে এসেছেন। বাড়ি মানে নিজের বাড়ি নয়— নীলুদের ভাড়াটে বাসা। এ বাসায় কত অসংখ্যবার তিনি এসেছেন, এমনও হয়েছে টানা একমাস কেটে গেছে— নড়ার নাম নেই। কিন্তু এবারে এসে কিছুটা অদ্ভুত আচরণ করছেন। যেন তিনি অপরিচিত একটা জায়গায় এসেছেন— লোকজন ভাল চেনা নেই, শারমিনকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, বাথরুমটা কোন দিকে? বাথরুম কোন দিকে তাঁর না-জানার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্নের ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি জানেন না।

রাতে খাবার টেবিলে বসলেন কিন্তু কিছু মুখে দিলেন না। মনোয়ারা বললেন, ভাইজান, আপনাকে দুটো রুটি বানিয়ে দেবে?

তিনি বললেন, জ্বি না। আপনাদেব কষ্ট দিতে চাই না।

মনোয়ারার বিস্ময়েব সীমা বইল না। ভাইজান তার সঙ্গে আপনি আপনি করছেন কেন? তিনি তাকালেন নীলুর দিকে। নীলু বলল, মামা, আপনাব শবীব খারাপ লাগছে?

ঃ না, আমি ভাল।

ঃ মামা আসুন, আপনাকে শুইয়ে দি। দুধ গবম করে দিচ্ছি। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

কবির মামা নিঃশব্দে উঠে পড়লেন। তাঁব খুব খাবাপ লাগছে। তিনি এ রকম করছেন কেন? তাঁব গায়ে জ্বর নেই। এ রকম কবার তো কথা নয।

মাখন লাগানো দু স্লাইস রুটি আব এক গ্লাস দুধ নিয়ে নীলু কবির মামার ঘরে ঢুকল। মৃদু স্বরে ডাকল, মামা!

ঃ আয় বেটি, আয়।

ঃ আপনার জন্যে রুটি আর দুধ এনেছি।

ঃ রেখে দাও মা, ক্ষিদে পেলে খাব।

ঃ না, আপনাকে এখনই খেতে হবে। আপনাকে খাইয়ে তাবপব আমি যাব।

কবির মামা একটু হাসলেন, তাবপব নেহাৎ যেন নীলুকে খুশী কববার জন্যেই পাঁউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুধে ডুবিয়ে মুখে দিতে লাগলেন।

ঃ মাখন দেয়া রুটি মামা দুধে ডুবাচ্ছেন কেন?

ঃ নরম হয়, খেতে সুবিধা।

ঃ আপনাব খেতে ইচ্ছা না হলে খাবেন না মামা। শুধু দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলুন।

তিনি বাধ্য ছেলেব মত দুধ খেয়ে ফেললেন।

ঃ পান খাবেন মামা? একটু পান এনে দেই? মুখের মিষ্টি মিষ্টি ভাবটা যাবে।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে বললেন, পান তো আমি খাই না। ঠিক আছে, তোমাব যখন ইচ্ছা দাও।

পান এনে নীলু দেখল মামা চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়। সে চাপা গলায় বলল, মামা, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

ঃ না, জেগে আছি। দাও পান দাও। আর একটু বস আমাব পাশে।

নীলু বসল। তিনিও উঠে বসলেন। নরম গলায় বললেন, আচ্ছা মা, তোমার বিয়েতে কি আমি কিছু দিয়েছিলাম?

নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, হঠাৎ এই কথা কেন মামা?

ঃ না, মানে হঠাৎ মনে হল। এ জীবনে তোমার কাছ থেকে শুধু সেবাই নিয়েছি, কিছু ফেরৎ দেয়া হয়নি।

ঃ আপনার ভালবাসা যা পেয়েছি সেটা বুঝি কিছু না মামা? তাছাড়া আপনার মনের শান্তির জন্যেই বলছি, আপনি বিয়েতে খুব দামী একটা শাড়ি দিয়েছিলেন। নীল বঙেব একটা কাতান। চারশ টাকা দাম ছিল শাড়িটার। তখন চারশ টাকায় একটা গয়না হয়ে যেত।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ মামা। আমাব বিয়ের শাড়ির দাম ছিল তিনশ টাকা। আমার বড় বোন বলল, বিয়েব শাড়িটা থাক, এইটা দিয়ে সাজিয়ে দেই।

কবির মামা গভীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাই বুঝি?

ঃ না মামা, বিয়েতে নাকি লাল শাড়ি পরতে হয়, তাই সবাই মিলে আমাকে লালটা পরাল কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা করছিল নীলটা পরতে।

কবির মামা হাসতে লাগলেন। কোন এক বিচিত্র কারণে এই গল্পে তিনি খুব আনন্দ পাচ্ছেন। তাঁর চোখেও পানি এসে যাচ্ছে। যদিও চোখে পানি আসার মত গল্প এটা না।

ঃ মামা!

ঃ বল মা।

ঃ তখন তো আপনার নীলগঞ্জ ছিল না। টাকা পয়সা যা পেতেন আমাদের পেছনেই খরচ করে ফেলতেন। শুয়ে পড়ুন মামা।

ঃ রফিক কি বাসায় আছে মা?

ঃ জ্বি আছে। এই কিছুক্ষণ আগে এসেছে।

ঃ ওকে কি একটু আমার কাছে পাঠাবে?

ঃ পাঠাচ্ছি।

রফিক খেতে বসেছে। কবির মামা ডেকেছেন শুনে মুখ বাঁকা করে বলল, ওল্ড ম্যান আমার কাছে কি চায়? এখন যেতে পারব না।

নীলু বলল, চট করে "না" বলে ফেল কেন? একজন অসুস্থ মানুষ ডাকছে, তুমি যাবে না?

ঃ শুধু ভ্যাজর ভ্যাজর করবে।

ঃ যদি করে, হাসি মুখে শুনবে সেই ভ্যাজর ভ্যাজর।

ঃ তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন ভাবী? আমি তো জাস্ট কথার কথা হিসেবে বলেছি। তুমি খুব ভাল করে জান আমি মুখে 'না' বললেও কবির মামাকে দেখতে ঠিকই যাব। হাসি মুখে তাঁর সব ফালতু কথা শুনব। যে ক'দিন উনি হাসপাতালে ছিলেন আমি কি রোজ দেখতে যাই নি?

নীলু লজ্জা পেয়ে গেল। রফিক ভাত শেষ না করেই উঠে পড়েছে। নীলু বলল, তুমি কি আমার উপর রাগ করলে রফিক?

ঃ না, তা করিনি। আমি তো মেয়েমানুষ না, যে কথায় কথায় রাগ করব। আর যদি করিও তাতে কার কি যায় আসে?

রফিক কবির মামার ঘরে ঢুকল।

ঃ মামা, জেগে আছ?

ঃ বস রফিক।

ঃ বসব না। যা শুনবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনব। বল কি বলবে?

ঃ তুই আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবি?

ঃ কোন্ জায়গায়?

ঃ আগে বল নিয়ে যাবি কিনা?

ঃ নিয়ে যাব।

ঃ বারাসাতে যাব। ঐখানে আমাকে নিয়ে যা।

ঃ সেটা আবার কোথায়?

ঃ চব্বিশ পরগণা জেলা।

ঃ ইণ্ডিয়া?

ঃ হ্যাঁ। বেনাপোল বর্ডাব দিয়ে.. ....

ঃ তুমি কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে নাকি মামা?

ঃ জন্মস্থান দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি আর বাঁচব না।

ঃ তুমি একা কেন, আমরা কেউ বাঁচব না। জন্মস্থান দেখলে হবেটা কি? ঐখানে গিয়ে মরতে চাও?

তিনি জবাব দিলেন না। রফিক খাটে বসল। নবম স্বরে বলল, জন্মস্থানে মরতে যেমন কষ্ট বিদেশে মরতেও ঠিক সে রকম কষ্ট। মরার কষ্ট সব জায়গায় সমান।

ঃ তুই তাহলে নিতে পারবি না?

ঃ না মামা, পারব না। পাসপোর্ট-ফাসপোর্টেব অনেক ঝামেলা। আমাব মনে হয় মরতে চাইলে তুমি তোমার সুখী নীলগঞ্জেই মর। সেটাই ভাল হবে।

তিনি হেসে ফেললেন। রফিকও হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, তুমি আমার উপর বাগ করলে না তো?

ঃ না, তোব কোন কথায় আমি বাগ করি না।

ঃ খুব ফালতু কথা বলি, এই জন্যে?

ঃ তাও না। তোর কথাবার্তা ঠিকই আছে। তোর কথাবার্তা আমাব পছন্দ। যা শুয়ে পড়।

ঃ বারাসাতে যেতে চাচ্ছ কেন?

ঃ মনটা হঠাৎ টানছে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি। বারাসতে শৈশব কেটেছে। একটা বিরাট পুকুর ছিল— নাম হল গিয়ে ভূতের পুকুর। ছোটবেলায় ভূত দেখার জন্যে এর পাড়ে বসে থাকতাম।

ঃ দেখেছ?

ঃ না, দেখিনি।

ঃ মামা আমার কথা শোন— এখন যদি যাও তোমাব খুবই খারাপ লাগবে। দেখবে সব বদলে গেছে। ভূতের পুকুর হয়ত ভরাট করে দালান তুলেছে। এরচে শৈশবের স্মৃতিটাই থাকুক।

কবির মামা শুয়ে পড়লেন। রফিক মশারি গুঁজে দিতে দিতে বলল, এবপরেও যদি তোমার যেতে ইচ্ছা করে তাহলে কি আর করা— নিয়ে যাব। কি, ইচ্ছা করে?

তিনি গাঢ়স্বরে বললেন, হ্যাঁ, করে।

রফিক নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মাস তিনেক তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে মামা। আমি একটা কাজ শুরু করেছি। একটু গুছিয়ে নেই।

ঃ কি কাজ?

ঃ ব্যবসা। মতিঝিলে রুম নিয়েছি। কাউকে কিছু বলিনি। বুধবারে বলব। সবাইকে অফিস দেখিয়ে আনব। তুমি থাকছ তো বুধবার পর্যন্ত?

ঃ থাকব। দেখে যাই তোর কাণ্ডকারখানা।

ঃ মামা, এখন যাই?

ঃ আচ্ছা যা। বাতি নিভিয়ে যা।

শারমিন জেগে আছে। আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। মেয়েদের চুল বাঁধার দৃশ্যটি বেশ সুন্দর। দেখতে ভাল লাগে। রফিক খানিকক্ষণ দেখল। ছন্দবদ্ধ ব্যাপার। চিরুনি উঠছে নামছে। উঠানামা হচ্ছে নির্দিষ্ট তালে। রফিক সিগারেট ধরাল। শারমিন বলল, দয়া করে সিগারেটটা বাইরে গিয়ে খাও।

ঃ কেন?

ঃ ঘরে কুৎসিত গন্ধ হয়, আমার ভাল লাগে না।

ঃ গন্ধ তো আগেও হত, তখন তো কিছু বলনি।

ঃ তখন বলিনি বলে কখনো বলতে পারব না এমন তো কোন কথা নেই— এখন বলছি।

রফিক সিগারেট ফেলে দিল।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে শারমিন চুল বাঁধা শেষ করে উঠল। দরজা বন্ধ করে বাতি নেভাল। মশারি ফেলে হালকা গলায় বলল, তুমি কি ঘুমুবে, না আরো কিছুক্ষণ জেগে বসে থাকবে?

ঃ ঘুমুব।

ঃ বিছানায় উঠতে উঠতে শারমিন বলল, তোমার মতিঝিলের অফিস স্টার্ট হচ্ছে কবে?

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, অফিসের খবর তুমি কোথায় পেলে?

ঃ কেন, এটা কি গোপন কিছু?

ঃ না, গোপন কিছু না। কাউকে তো বলিনি। তুমি জানলে কি ভাবে? কে বলল?

ঃ আজ বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাবা বলল।

ঃ তিনি জানলেন কোত্থেকে?

ঃ তিনি জানবেন না কেন? সব তো তাঁরই করা। বেকার জামাই বোধ হয় সহ্য হচ্ছিল না। দূর থেকে কলকাঠি নাড়লেন।

রফিক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এই সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি। রহস্য পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। কেন সব এমন ঘড়ির কাঁটার মত সহজ হচ্ছিল এটা বোঝা গেল।

শারমিন বলল, দেখে মনে হচ্ছে অধিক শোকে পাথর! শ্বশুরের সাহায্য নিতে চাও না?

রফিক সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বারান্দায় চলে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানবে। মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে। ঘুমুতে যাবে অনেক রাতে। যখন যাবে তখন দেখবে শারমিন পরম তৃপ্তিতে ঘুমুচ্ছে। তার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসবে না। নানা আজে-বাজে চিন্তা তার মাথায় ভীড় করবে। একেক দিন একেক জিনিস নিয়ে সে ভাবে। আজ ভাববে শারমিন হঠাৎ করে বাবার কাছে কেন গেল? পিতা-কন্যার মিলন তাহলে হয়েছে? কি ভাবে হল কে জানে? শারমিন নিশ্চয়ই কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, খুব ভুল করেছি বাবা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আর কোনদিন তোমার অবাধ্য হব না। তুমি যা বলবে তাই শুনব। এবারকার মত আমাকে ক্ষমা কর।

কবির মামার জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না। সকালের দিকে সুস্থ থাকেন, বিকেল থেকেই কাতর। গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে। ম্যালেরিয়ার রুগীর মত লেপ জড়িয়েও শীত মানানো যায় না। যদিও অসুখটা ম্যালেরিয়া নয়। ডাক্তাররা নিঃসন্দেহ, জীবাণুঘটিত কিছু নয়। হোসেন সাহেব এই জ্বর নিয়ে খুব উত্তেজিত। তাঁর ধারণা, এক সপ্তাহ চিকিৎসা করবার সুযোগ দিলে তিনি হোমিওপ্যাথি যে কি তা প্রমাণ করে দেবেন। এই সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না। কবির মাস্টার পরিষ্কার বলেছেন, সারাজীবন যে কয়েকটি জিনিস অবিশ্বাস করে এসেছি হোমিওপ্যাথি হচ্ছে তার একটা। এখন শেষ সময়ে যদি হোমিওপ্যাথিতে সেরে উঠি সেটা খুব দুঃখজনক হবে। আমাকে অবিশ্বাস নিয়েই মরতে দাও।

হোসেন সাহেব হাল ছাড়লেন না। নীলুর সঙ্গে পরামর্শ করে গোপনে কবির মাস্টারের খাবার পানিতে এক পুরিয়া 'কেলিফস' মিশিয়ে দিলেন। নীলুকে বললেন— এক ডোজেই কাজ হবে। দেখবে আজ আর জ্বর আসবে না। একশ টাকা তোমার সঙ্গে বাজি।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যি সত্যি জ্বর এল না। আনন্দে ও উত্তেজনায় হোসেন সাহেব অন্যরকম হয়ে গেলেন। রান্নাঘরে ঢুকে নীলুকে বললেন— কি, যা বলেছিলাম তা হল? বিশ্বাস হল আমার কথা? এত যে তোমাদের অবিশ্বাস! আশ্চর্য।

নীলু হেসে ফেলল।

ঃ আমার অবিশ্বাস নেই তো?

ঃ আছে আছে— তোমারও আছে, সবই বুঝি। টুনীব মাথাব্যথা হচ্ছিল, সেই চিকিৎসা কি করিয়েছ আমাকে দিয়ে? অবিশ্বাস কর আর যাই কর, চিকিৎসাটা একবার তো করিয়ে দেখবে? দেখা উচিত নয়?

ঃ জ্বি বাবা, উচিত।

ঃ আমি যা চিন্তা করছি একটা ঘর ভাড়া করে প্রফেসন্যাল চিকিৎসা করব। ফার্মেসী দেব। তুমি একটা নাম ঠিক কর ফার্মেসীর।

হোসেন সাহেব হৃষ্টচিত্তে রান্নাঘর থেকে বেরুলেন। টুনী ও বাবলু বইপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের বললেন— তোরা নিজে নিজে পড়, আজ আমি ব্যস্ত। কাজ আছে। তিনি হোমিওপ্যাথির বই খুলে বসলেন।

তাঁর আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। ভোররাতে কবির মামাব প্রচন্ড জ্বর এল। জ্বরের ঘোরে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে উঠে বসেন, শূন্যদৃষ্টিতে সবার দিকে তাকান, গম্ভীর গলায় বলেন—"হে বন্ধু হে প্রিয়, দেশের দরিদ্র বন্ধু আমার। হে আমার প্রিয় বন্ধু, আজ এই শরতের মেঘমুক্ত প্রভাত ......।"

কিছুক্ষণ প্রলাপ বকেন, তারপর আবার সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেন কিছুই হয়নি। নীলুকে বললেন, বৌমা, আমার জ্বরটা একটু কমলেই কিন্তু আমি নীলগঞ্জ রওনা হব। সেখানে বড় কোন ঝামেলা হয়েছে।

নীলু বলল, কোন ঝামেলা হয়নি মামা। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। মাথায় পানি ঢালছি।

ঃ ঝামেলা হয়েছে মা। খুব ঝামেলা, নয়ত শওকত আসতো। এতদিন হয়ে গেছে ঢাকায় আছি, কিন্তু শওকতের কোন খোঁজ নাই।

ঃ আপনি এখন কথা বলবেন না তো মামা, প্লীজ।

কবির মামা চোখ বন্ধ করে আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন. "হে বন্ধু হে প্রিয়, হে দেশবাসী! হে আমার দরিদ্র বন্ধু!

রফিক ডাক্তার আনতে গেল।

হোসেন সাহেব হতভম্ব হয়ে বিছানার পাশে বসে রইলেন। টুনী খুব ভয় পেয়েছে। সে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে।

কবির মামা শিং মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। নীলু অফিসে গিয়েছে। অফিসে জরুরী মিটিং, না গেলেই নয়। দায়িত্ব দিয়ে গেছে শারমিনের উপর। শারমিন তার দায়িত্ব পালন করছে চমৎকার ভাবে। কবির মামা বারান্দায় আছেন, সেও আছে বারান্দায়।

ঃ মামা, আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

ঃ না মা, লাগবে না। তুমি খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম কর। আমার শরীর এখন ভাল। বেশ ভাল। ইনসাআল্লাহ, কাল রওনা হব।

ঃ অসম্ভব। কাল কি ভাবে রওনা হবেন?

ঃ রওনা হতেই হবে মা। উপায় নেই। তোমার বাবা একবার বলেছিলেন নীলগঞ্জ যাবেন। আমারও খুব শখ ছিল তাঁকে নিয়ে যাবার। আর সম্ভব হল না।

ঃ সম্ভব হবে না কেন?

কবির মামা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মৃত্যু আমার পাশেই অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে সে হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারি। আমার সময় কোথায় মা? সময় শেষ মা।

ঃ আমি বাবাকে বলব যেন তিনি তাড়াতাড়ি নীলগঞ্জে চলে যান। আমি আজই বলব।

কবির মামা হেসে ফেললেন। বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে তাঁর ঝিমুনি ধরে গেল। শীত শীত করছে। আবার হয়ত জ্বর আসবে। তাঁর লজ্জা লাগছে। এ বাড়ির প্রতিটি মানুষকে তিনি বিব্রত করছেন। সেই অধিকার তাঁর কি সত্যি সত্যি আছে?

পরদিন তিনি অসুস্থ শরীরেই নীলগঞ্জ রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন সোবাহান। রফিকের যাবার কথা ছিল, তার অফিসের উদ্বোধন হবে— সে যেতে পারল না। জুটিয়ে দিল সোবাহানকে। এই লোকটি কোন রকম আপত্তি করল না।

স্টেশন থেকে বাড়ি অনেকটা দূর। কবির মাস্টারের হেঁটে যাবার সামর্থ্য নেই। আবার আকাশপাতাল জ্বর। সোবাহান গরুর গাড়ি যোগাড় করে আনল। রওনা হবার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আশেপাশে কোথাও ডাক্তার নেই নবীনগরে। একজন ডাক্তার আছেন, এল এম এফ। কবির মাস্টার বললেন, নিজের চোখে দেখ, গ্রামগুলির কি খারাপ অবস্থা। ডাক্তাররা কি এই গণ্ডগ্রামে আসবে? তারা যাবে শহরে।

সোবাহান বলল, আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করতে থাকুন, আমি নবীনগর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসব।

ঃ পাগল নাকি তুমি? বহু দূরের পথ!

ঃ কোন অসুবিধা নেই। এই অবস্থায় আপনাকে নিয়ে রওনা হব না। গরুর গাড়িতে বিছানা করে দিচ্ছি, শুয়ে থাকুন। আমি যাব আর আসব।

নবীনগরে ডাক্তার সাহেবকেও পাওয়া গেল না। তিনি বিরামপুরে কলে গিয়েছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। নাও ফিরতে পারেন। বিরামপুরের কাছেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি, রাতটা হয়ত শ্বশুরবাড়িতেই কাটাবেন।

সোবাহান ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল। গরুর গাড়ির চারপাশে অসংখ্য মানুষ।

চারদিকে রটে গিয়েছে অসুস্থ হয়ে কবির মাস্টার গ্রামে ফিরেছে। দলে দলে লোক আসছে। ভীড় ক্রমেই বাড়ছে। বিশাল একদল মানুষ নিয়ে গরুর গাড়ি রওনা হল।

আশেপাশের মানুষ জিজ্ঞেস করে, কে যায় গো?

ঃ কবির মাস্টার যায়।

ঃ কি হইছে মাস্টার সাবের?

ঃ শইল খুব খারাপ। উল্টা পাল্টা কথা কইতাছে।

ঃ কও কি সর্বনাশের কথা!

ঃ ক্ষেতের কাজ ফেলে রেখে চাষীরা উঠে আসে রাস্তায়। তারা এক পলক দেখতে চায় মাস্টার সাহেবকে। দু'টি কথা শুনতে চায়।

সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে। চলমান মানুষগুলির ছায়া ছোট হয়ে আসে। কবির মাস্টার চোখ মেলে একবার জিজ্ঞেস করেন— আর কত দূর সোবাহান?

আর যে কত দূর সোবাহান নিজেও জানে না। এই অঞ্চল তার অপরিচিত। তবু সে বলে, এসে পড়েছি। ঐ তো দেখা যাচ্ছে।

ঃ সোবাহান!

ঃ জ্বি মামা।

ঃ শুধু সাইনবোর্ডটাই আছে। নীলগঞ্জকে সুখী করতে পারলাম না। আফসোস রয়ে গেল।

ঃ এক জীবনে তো হয় না মামা। আপনি শুরু করেছেন, অন্যরা শেষ করবে। শুরু করাটাই কঠিন। শুরু তো হয়েছে।

ঃ ঠিক ঠিক। খুব ঠিক।

ঃ আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে মামা?

ঃ হচ্ছে। আবার আনন্দও হচ্ছে। কত লোক এসেছে দেখলে?

ঃ জ্বি দেখলাম।

ঃ কিছুই করতে পারি নাই এদের জন্যে, তবু এরা আসছে। বড় আনন্দ লাগছে সোবাহান। জীবনটা তাহলে একবারে নষ্ট হয়নি, কি বল?

ঃ জ্বি না। অসাধারণ জীবন আপনার।

ঃ পানি খাওয়াতে পার? বুক শুকিয়ে আসছে।

বট গাছের ছায়ার নীচে গরুর গাড়ি রাখা হল। চার পাঁচ জন ছুটে গেল পানির খোঁজে। আশেপাশের বাড়ির বৌ-ঝিরা সব বেরিয়ে আসছে। এদের মধ্যে অল্পবয়স্ক একটা মেয়ে খুব কাঁদছে। সে নীলগঞ্জের মেয়ে। এই গ্রামে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের দিন খুব গণ্ডগোল হচ্ছিল, জামাইকে সাইকেল দেয়ার কথা— সেই সাইকেল দেয়া হয়নি। বিয়ে ভেঙ্গে বরযাত্রীর দল উঠে যাবে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন কবির মাস্টার। থমথমে গলায় বললেন— সাইকেল আমি দিব। বিয়ে হোক।

কবির মাস্টারের কথাই যথেষ্ট। বিয়ে হয়ে গেল। তার পনেরো দিন পর নতুন সাইকেল নিয়ে কবির মাস্টার এসে উপস্থিত। তিনি সাইকেল নতুন জামাইয়ের হাতে দিয়েই আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, হারামজাদা ছোটলোক। সাইকেলটা তোর কাছে বড় হল? তুই একটা মেয়েকে বিয়ের দিন লজ্জা দিলি? তোর এত বড় সাহস?

ছেলেটা ভাল ছিল। সাতদিন পর সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে গেল। লাজুক গলায় বলল, আপনার দোয়া চাই মাস্টার সাব, আর কিছু চাই না। আপনে খাস দিলে আমার জন্যে দোয়া করেন।

কবির মাস্টার গম্ভীর হয়ে বললেন— দোয়া লাগবে না। সৎ মানুষের জন্যে দোয়া লাগে না। দোয়া দরকার অসৎ মানুষের জন্যে। তোর বৌটাকে আদব-যত্ন করিস। ভাল মেয়ে।

সেই মেয়েটাই এখন চিৎকার করে কাঁদছে। কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। কবির মাস্টার বিরক্ত গলায় বললেন, তুই এরকম করছিস কেন? সালাম করেছিস আমাকে? আদবকায়দা কিছুই শিখিস নাই। নীলগঞ্জের মেয়ে না তুই? গ্রামের বদনাম। আয় সালাম কর। তোর জামাই কই? ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয়।

নীলগঞ্জে ঢোকার ঠিক আগে কবির মাস্টার মারা গেলেন। নিঃশব্দে মৃত্যু। কেউ কিছুই টের পেল না। সবাই ভাবল বোধহয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। সোবাহান তাঁর হাত ধরে বসে ছিল। সে টের পেল, হাত নামিয়ে দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে এল। অসংখ্য লোকজন চারপাশে। সবাই নিঃশব্দে হাঁটছে। সেও হাঁটছে তাদের সঙ্গে। এই মানুষগুলিকে মৃত্যুর খবর দিতে তার মন চাচ্ছে না।

গরুর গাড়ি নীলগঞ্জের সীমানায় এসে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। নীলগঞ্জের সীমানায় বিশাল এক বেণ্টি গাছ। সেই গাছে সাইনবোর্ড ঝুলছে। সেখানে লেখা।

"আপনারা সুখী নীলগঞ্জে প্রবেশ করেছেন। স্বাগতম।"

নীলগঞ্জের সমস্ত বৌ-ঝিরা জড় হয়েছেন সেখানে। ছুটতে ছুটতে আসছে শওকত। আজ সকালেই সে থানা হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে। নীলগঞ্জের চেয়ারম্যান তাকে একটা ডাকাতি মামলায় আসামী দিয়েছিল। ওসি সাহেব নিজ দায়িত্বে তাকে জামিন দিয়েছেন। শওকত চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে— "কি হইল? আমার স্যারের কি হইল?"

দুপুর বেলার শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম। করুণ সুরে ঘুঘু ডাকছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে এগিয়ে চলছে গরুর গাড়ি। সোবাহান দাঁড়িয়ে আছে বেণ্টি গাছের কাছে। তার দৃষ্টি সাইন বোর্ডের দিকে।

"আপনারা সুখী নীলগঞ্জে প্রবেশ করছেন। স্বাগতম।"

সোবাহানের মনে হচ্ছে সুখী নীলগঞ্জ জায়গাটি বড় পবিত্র। এরকম একটা পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করবার মত যোগ্যতা তার নেই। তার উচিত এই সীমানা থেকেই বিদেয় নেয়া।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, কবির মাস্টারের মৃত্যু এ বাড়ির কাউকে তেমন স্পর্শ করল না।

রফিক তার নতুন অফিস, নতুন ব্যবসা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত। ভোরবেলা বেরিয়ে যায় ফেরে অনেক রাতে। সফিকেরও এই অবস্থা। তার দায়িত্ব দিন দিন বাড়ছে। সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যান্টের কাজ এগুচ্ছে দ্রুতগতিতে। সফিকের বেশীর ভাগ সময়ই চলে যাচ্ছে সেখানে। বাসায় ফিরে এমন ক্লান্ত থাকে যে ভাত খেয়ে বিছানায় যেতে না যেতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

দায়িত্ব বেড়েছে নীলুরও। সে একটি প্রমোশন পেয়েছে। অফিসে তার এখন ঘর আলাদা। ঘরের সামনে টুল পেতে একজন বেয়ারা বসে থাকে। অফিসের নানান সমস্যা নিয়ে তাকে প্রতিদিনই মিটিং করতে হয়। এতসব ঝামেলা তার আগে ছিল না।

হোসেন সাহেবও ব্যস্ত। তিনি একটি বই লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। বইটির নাম— সহজ হোমিওপ্যাথি। যে সব ডাক্তার গ্রামে চিকিৎসা করবেন, বইটি লেখা হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ করে। কাজেই লিখতে হচ্ছে খুব সহজ ভাষায়। তিনি জোর দিচ্ছেন কেইস হিস্ট্রিতে। প্রতিটি রোগের জন্যে বেশ কয়েকটা কেইস হিস্ট্রি দিতে হচ্ছে। সে সব খুঁজে বের করতে সময় নিচ্ছে। বেশ কিছু হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করছেন। তাদের এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। এতে হোসেন সাহেবের উৎসাহে ভাঁটা পড়ছে না।

মনোয়ারা আগের তুলনায় খানিকটা শান্ত। কাজের একটি মেয়ে রাখা হয়েছে, নাম নাজমা। তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই কাটছে নাজমার খুঁত ধরে। এই মেয়েটার কোন কিছুই তার পছন্দ নয়। নামটাও অপছন্দ। তাঁর ধারণা নাজমা হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম। কাজের মেয়ের এ রকম নাম থাকবে কেন? নাজমা মেয়েটির বয়স আঠারো উনিশ। এইটিও তাঁর পছন্দ নয়। এই বয়সের মেয়ে ঘরে রাখা মানে আগুন ঘরে রাখা। কোন দিন কি এক ঝামেলা বাধাবে, ছি ছি পড়ে যাবে চারদিকে। মনোয়ারার বেশীর ভাগ সময় এখন কাটছে কি করে মেয়েটিকে তাড়ানো যায় এই বুদ্ধির সন্ধানে। তেমন কোন পথ পাওযা যাচ্ছে না। কারণ নাজমা মেয়েটি খুবই কাজের। অতি অল্প সময়েই সে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে। তবু মনোয়ারা চেষ্টার ক্রুটি করছেন না। আজ ভোরবেলা তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই, তুই ঘর মুছলি কেন? সকাল বেলা পানি দিয়ে ঘর ভাসিয়ে ফেলেছিস?

নাজমা সহজ স্বরে বলল, আপনিই তো কইছিলেন দাদী।

ঃ আমি কখন বললাম?

ঃ আপনে কইছিলেন সপ্তাহে একদিন ঘর ধুইতে।

ঃ এই তোর ঘর ধোয়ার নমুনা? পানিতে চারদিক ছয়লাব!

ঃ কই দাদী, পানি তো নাই। শীতের দিনে পানি শুকায় তাড়াতাড়ি।

আসলেই তাই, ইতিমধ্যেই চারদিক শুকনো খট খট করছে। মনোয়ারা কিছুতেই মেয়েটিকে জব্দ করতে পারেন না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন না। তীক্ষ্ণ নজর রাখেন, যদি বেচাল কিছু চোখে পড়ে।

ঃ এই তুই, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ঃ ছাদে গেছিলাম দাদী।

ঃ তোকে না বললাম, ছাদে যাবি না? ব্যাটাছেলে থাকে?

ঃ কাপড় শুকাতে গিছিলাম।

ঃ কাপড় শুকাতে সারাদিন লাগে?

ঃ গেলাম আর আসলাম দাদী। বেশীক্ষণ তো থাকি নাই।

ঃ আবার মুখে মুখে কথা? তুই কি মনে করিস তোর মতলব আমি বুঝি না? আমি কচি খুকী?

ঃ বিশ্বাস করেন দাদী, আমার কোন মতলব নাই।

ঃ তুই কাল সকালেই বিছানা বালিশ নিয়ে বিদায় হবি। আমার পরিষ্কার কথা।

ঃ সত্যি যাইতে বলেন দাদী?

ঃ আমি কি তোর সাথে মশকরা করছি? ফাজিল কোথাকার। বড় বৌমা আসুক, তোকে আমি আজই বিদায় করব। পাখা উঠেছে।

নীলু এই মেয়েটির বিদায়ের কথা শুনতেই পারে না। নাজমা তাকে অনেক ভাবে নিশ্চিন্ত করেছে, নীলু এই সুখ হারাতে রাজী নয়। উল্টে মেয়েটার কাছে তার নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। যে-সংসার তার দেখার কথা, তা দেখছে সংসারের বাইরের একজন মানুষ। মমতা এবং ভালবাসা নিয়েই দেখছে। এটা যেন ঠিক নয়— অন্যায়। আগে সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব শারমিন পালন করত। তার দায়িত্বও কমেছে। সে এখন পুরো সময় দিচ্ছে পড়াশোনায়।

ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির এ্যাসিসটেন্টশীপের চিঠি এসেছে। ভিসার জন্য আই টুয়েন্টি তারা পাঠিয়েছে, এখনো এসে পৌঁছায়নি। এখন আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শারমিন রাতদিন পড়ে। রফিক দেখে, কিছু বলে না। তারা দু'জন এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন কেউ কাউকে চেনে না।

এই পরিবারের সবক'টি মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল শওকতের একটি চিঠি— কবির মাস্টারের কুলখানি। সবাই যেন আসে। সে থাকার ব্যবস্থা গরীবি হালতে করে রেখেছে।

কারোরই যাওয়ার ইচ্ছা নেই। অনিচ্ছার বিষয়টাও তারা চেপে রাখতে চায়। এই ব্যাপারটা নীলুর মন খারাপ করে দিল। এ রকম কেন হবে? যে মানুষটি এ পরিবারে প্রতিটি সদস্যের জন্যে গাঢ় ভালবাসা পোষণ করেছেন, তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ করেও এরা কেউ সামান্য ত্যাগ স্বীকার কেন করবে না?

একদিন সে রফিককে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, কবে যাচ্ছ রফিক?

রফিক খুব অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাব?

ঃ মামার কুলখানিতে যাবে না?

ঃ মামার কুলখানি তো দূরের কথা, আমার নিজের কুলখানি হলেও যেতে পারব না।

ঃ তোমার কি মনে হয় না, যাওয়া উচিত?

ঃ না, এসব লোক দেখানো ব্যাপার। মারা গেল ফুরিয়ে গেল— আর কি?

ঃ তাই বুঝি?

ঃ হ্যাঁ, তাই। তাছাড়া এইসব কুলখানি হচ্ছে হিন্দুয়ানী ব্যাপার। হিন্দুরা যেমন মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করে, ওদের দেখাদেখি আমরা করি কুলখানি।

ঃ ধর্মজ্ঞানও তোমার হয়েছে মনে হয়।

ঃ তুমি এমন করে তাকাচ্ছ কেন ভাবী? আমার শতেক ঝামেলা। আমি পারছি না।

সফিকও যাবে না। সে ছুটির চেষ্টা করেছিল, টলম্যান ছুটি দেয়নি। বলেছে—অসম্ভব। আগামী দু'মাস কোন ছুটি নেই। সামনের মাস থেকে শুক্রবারেও তোমাকে কাজ করতে হবে।

সফিক, মনে হল, এতে খুশীই হয়েছে। অন্তত তাব না যাওযাব একটা কঠিন অজুহাত আছে। ঠিক হল হোসেন সাহেব সোবাহানকে নিয়ে যাবেন। হোসেন সাহেব শেষ পর্যন্ত যেতে পাবলেন না। ঢাকা থেকে গেল শুধু সোবাহান। বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

কুলখানিব দিন বাতে সফিক হঠাৎ বলল, খুব অন্যায হয়েছে নীলু। আমাদেব সবাব যাওয়া উচিত ছিল। আমাব খাবাপ লাগছে।

ঃ এখন খাবাপ লাগলেও তো কিছু কবাব নেই।

ঃ তুমি কল্পনা কবতে পাববে না নীলু ছেলেবেলায মামাব কি পবিমাণ আদব যে আমবা পেয়েছি।

নীলু চুপ কবে বইল। সে এ বাড়িব সবাব উপব বিবক্ত হয়েছে।

সফিক বলল, আজ অফিসে বসে ভাবছিলাম— কোনদিন মামাকে আমবা কিছু দিই নি।

ঃ তিনি কিছু ফেবৎ পাবাব আশায নিশ্চযই তোমাদেব ভালবাসেন নি।

ঃ কিন্তু আমাদেব এটা দাযিত্ব ছিল।

ঃ হ্যাঁ ছিল।

ঃ এবাব দেখলাম তাব সুয়েটাবটা ছেঁড়া। আমি কি পাবতাম না একটা নতুন সুয়েটাব কিনে মামাকে বলতে— মামা, তোমাব জন্য এনেছি।

ঃ নিশ্চযই পাবতে।

ঃ তাহলে কেন এটা বললাম না?

ঃ এখন আব এসব চিন্তা কবে লাভ নেই, এসো শুয়ে পড।

তাবা বাতি নিভিয়ে দু'জনেই শুযে পডল। কিন্তু কেউ ঘুমুতে পাডল না। বাত একটাব দিকে অদ্ভুত একটা ব্যাপাব হল। প্রচণ্ড শব্দে তাদেব দবজায ধাক্কা পড়তে লাগল।

দবজা খুলে দেখা গেল— বফিক। সে থব থব কবে কাঁপছে। সফিক বলল, কি হয়েছে বে?

বফিক কাঁপা গলায বলল— সাংঘাতিক ভয পেয়েছি। বসাব ঘবে হঠাৎ দেখি কবিব মামা বসে আছেন। আমাকে দেখে হাসলেন। আমি চিৎকাব দিয়ে উঠতেই দেখি কেউ নেই।

দবজা খুলে সবাই বেব হযে এসেছে। বফিক লজ্জা পাচ্ছে।

কিন্তু তাব ভয এখনো কাটেনি। সে মৃদু গলায বলল— আমি সত্যি দেখেছি, স্পষ্ট দেখলাম— মনেব ভুল না।

নীলু বলল, তোমাব মনে অপবাধ-বোধ কাজ কবছিল তাই এসব দেখেছ। যাও শুয়ে পড।

ঃ ভাবী, আমি সত্যি দেখেছি।

ঃ এস তোমাকে চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খেয়ে ঘুমাও।

মনোযাবা বললেন— চা না, ওকে এক গ্লাস লবণপানি দাও। এটা খাওযা দবকাব। দেখ না কেমন ঘামছে।

বফিক ভালই ভয পেয়েছে, কাবণ তাব জ্বব এসে গেল। বেশ ভাল জ্বব, একশ দুই পয়েন্ট পাঁচ। শাবমিনকে অনেক বাত পর্যন্ত মাথায পানি ঢালতে হল। বফিক ক্ষীণ স্ববে বলল, কেমন ছেলেমানুষি কাণ্ড কবলাম বল তো। দিনেব বেলা সবাই এটা নিয়ে হাসাহাসি কববে।

ঃ কবলে কববে, তুমি চুপ কবে থাক।

ঃ আমি কিন্তু সত্যি দেখেছি—- বিশ্বাস কর।

ঃ তুমি কিছুই দেখনি। ভাবী যা বলেছে সেটাই সত্যি।

ঃ স্পষ্ট দেখলাম শারমিন। কমলারঙের স্যুয়েটার গায়ে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

ঃ ঠিক আছে, থাক। এখন এসব গল্প করতে হবে না।

ঃ তোমার ভয় লাগছে?

ঃ না, ভয় লাগছে না। ভয় কেন লাগবে? তাঁকে যদি দেখেই থাক তাতে ভয়ের কি?

রফিক জবাব দিলে না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। শারমিন অনেকদিন পর তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে গেল। রফিক বলল, ভয় পেয়ে একটা লাভ হয়েছে। তুমি কাছে এসেছ। কবির মামাকে ধন্যবাদ।

বসার ঘরে বাকি সবাই গোল হয়ে বসে আছে। তাদের কেউই সেই রাতে ঘুমুল না। সবাই যেন কবির মামার উপস্থিতি অনুভব করছে। যেন এক্ষুণি ছায়াময় কোন জগৎ থেকে তিনি দৃশ্যমান হবেন।

এক সময় ভোর হল। গাছে গাছে পাখি ডাকতে লাগল।

নীলু হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে গভীর বিস্ময়।

ঃ কি রে, এমন করে দেখছিস কেন, চিনতে পারছিস না?

ঃ পারছি, পারব না কেন? তোর এ কি হাল হয়েছে?

বন্যা হাসল। হাসি আর থামেই না। আশপাশের সবাই তাকাচ্ছে। অফিসে এসে কেউ এমন করে হাসে? নীলু বলল, এ্যাই, তোর কি হয়েছে?

ঃ কিছু হয়নি।

ঃ এত হাসছিস কেন?

ঃ জানি না কেন হাসছি। পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছি বোধহয়। তুই আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবি?

নীলু বন্যাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। তার মনে হল বন্যা ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। চেহারা ভীষণ খারাপ হয়েছে। মাথার সামনের দিকের চুল উঠে কপাল অনেক বড়-বড় লাগছে। শাড়িতে ইস্ত্রী নেই। ইস্ত্রী ছাড়া শাড়িতে বন্যাকে কল্পনাও করা যায় না। নীলু বলল, তোর কি হয়েছে বল তো?

ঃ কিছুই হয় নি।

ঃ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস?

ঃ হুঁ, সে তো একবছর আগে। তুই কোন খোঁজখবর নিতিস না, কাজেই জানিস না। কেউ আমার খবর রাখে না।

নীলু লজ্জিত বোধ করল। সে সত্যি কোন খোঁজ নেয়নি। অথচ তার আজকের এই চাকরি

বন্যাই যোগাড় করে দিয়েছে। কত উৎসাহে সে ছুটাছুটি করেছে। কত ঝামেলা করেছে।

ঃ নীলু, আমাকে হাজারখানেক টাকা দিতে পারবি?

ঃ পারব। কাল আসতে হবে। কাল আয়. আমি টাকা যোগাড় করে রাখব।

ঃ এখন তোর কাছে কত আছে?

ঃ পঞ্চাশ টাকার মত আছে।

ঃ পঞ্চাশ টাকাই দে। কাল আবার আসব।

ঃ নীলু ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। নীচু গলায় বলল, তোর আর সব খবব বল। কর্তা কেমন আছে?

ঃ জানি না কেমন আছে। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

ঃ বলছিস কি তুই?

ঃ ডিভোর্স হয়েছে তিন মাস হল।

নীলু ভয়ে ভয়ে বলল, তোব বাচ্চাটা কার কাছে থাকে? তোব কাছে?

ঃ না।

ঃ উনার সঙ্গে থাকে?

ঃ না, কারো সঙ্গেই থাকে না। চা খাওয়া তো নীলু। চায়েব সঙ্গে আব কিছু থাকলে তাও দিতে বল। ক্ষিধে লেগেছে।

ঃ ভাত খাবি?

ঃ না, ভাত খাব না।

বন্যা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগল, বাচ্চাটা মবে গেল, বুঝলি। চার মাস হবার আগেই শেষ। ওর ধারণা হল, আমার জন্যেই মরেছে। আমি যত্ন নেই নি—অফিস নিয়ে থেকেছি। কি যে কুৎসিত ঝগড়া! শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিলাম। তাতেও কিছু লাভ হল না। রোজ ঝগড়া। রোজ হৈ-চৈ, চিৎকার। একদিন কি হয়েছে, জানিস? লোকজনের সামনে হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলল.

ঃ থাক, শুনতে চাই না। এখন কি করছিস তুই?

ঃ কিছু করছি না। বড় ভাইয়ের বাসায় থাকি, আর ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া করি। ভাবী কি যে ঝগড়া করতে পারে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। ঝগড়ায় কোন ডিগ্রী থাকলে ভাবী পিএইচডি পেয়ে যেত।

বন্যা আবার হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। নীলু তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। বন্যা বলল, আমার হাসি রোগ হয়েছে, বুঝলি? গতকাল ভাবী আমাকে কালনাগিনী বলে গাল দিয়েছে। রাগ উঠার বদলে আমার হাসি উঠে গেল। হাসি দেখে ভাবী মনে করল আমি পাগল হয়ে গেছি। ভয়ে তার চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল। হি হি হি!

নীলু বলল, এই বন্যা, চুপ কর তো।

ঃ তোরও কি ধারণা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

ঃ না হলেও শীগগীরই হবে। তুই একটা চাকরি টাকরি কর। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাক।

ঃ হ্যাঁ তাই করব।

বন্যা উঠে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, যাইরে নীলু। কাল আবার আসব, টাকাটা যোগাড় করে রাখবি।

ঃ নিশ্চয়ই রাখব।

ঃ কবে ফেরৎ দেব তা কিন্তু জানি না। নাও দিতে পারি।

ঃ টাকা ফেরৎ দিতে হবে না।

ঃ তাহলে তো আরো ভাল।

নীলু বন্যাকে এগিয়ে দিতে গেল। তার খুবই খারাপ লাগছে। ইচ্ছা হচ্ছে বন্যার সঙ্গে চলে যেতে। দুজনে মিলে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারে। বন্যার ঠিক এই মুহূর্তে একজন বন্ধু দরকার। যে তাকে সাহস দেবে, ভরসা দেবে। মাঝে মাঝে জীবন ভিন্ন খাতে বইতে থাকে, সব কেমন জট পাকিয়ে যায়। তখন একজন প্রিয়জনকে কাছে থাকতে হয়।

ঃ নীলু, যাই রে!

ঃ কাল আসিস।

ঃ আসব। একটা কথা নীলু, আচ্ছা তোর কি মনে হয় আমি যদি চাকরি না করতাম, যদি বাসায় থেকে বাচ্চার দেখাশোনা করতাম, তাহলে সে বাঁচত?

ঃ এখন আর এসব দিয়ে কেন ভাবছিস?

ঃ ভাবছি না তো। এমনি মনে হল তাই বললাম।

ঃ আর ভাবিস না।

ঃ না, ভাবব না। বাচ্চাটার জন্যে বড় কষ্ট হয় নীলু। ওর নাম রেখেছিলাম অভীক। নামটা সুন্দর না?

ঃ হ্যাঁ সুন্দর।

ঃ নামের মানে বল তো?

নীলু তাকিয়ে রইল।

সারাদিন তার আর অফিসের কাজে মন বসল না। বন্যার মত প্রাণময় মেয়ের আজ কি অবস্থা! কি কঠিন দুঃসময়! সন্তানের মৃত্যুর পুরো দায়ভাগ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার উপর। বন্যা নিজেও তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

নীলু ঠিক করল আগামী কাল সে ছুটি নেবে। বন্যা এলেই তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। দূরে কোথাও যাবে বেড়াতে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে কিংবা বলধা গার্ডেনে। কোথায় যেন সে পড়েছিল, গাছপালা মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে পারে।

বন্যা পরদিন এল না। অফিস চারটায় ছুটি হয়, নীলু পাঁচটা পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করল। অফিসের গাড়ি চলে গিয়েছে, সে একা একা বাসায় রওনা হল। রিকশা নিতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভাল লাগছে। সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোয় তার মন কেমন করতে থাকে। জগৎ সংসার তুচ্ছ মনে হয়।

নীলুর হাতব্যাগে এক হাজার টাকা। তার কেন যেন মনে হল, এই টাকা নিতে বন্যা কোনদিনই আর আসবে না।

শাহানা অসময়ে শুয়ে আছে

এখন বাজছে সন্ধ্যা সাতটা। অথচ শাহানা মশারি খাটিয়ে শুয়ে আছে। জহির বিস্মিত হয়ে বলল, ঘুমুচ্ছ নাকি?

শাহানা বলল, হ্যাঁ।

ঃ একটু মনে হয় সকাল সকাল শুয়ে পড়লে।

ঃ ভাল লাগছে না।

ঃ ভাল না লাগলে শুয়ে পড়তে হয় নাকি?

ঃ কি করব তাহলে?

ঃ কত কিছু করার আছে—বই পড়, টিভি দেখ তোমাদের বাসা থেকে বেড়িয়ে আস, শপিং এ যাও।

শাহানা তার মাথার উপর লেপ টেনে দিল। সে আর কোন কথাবার্তায় উৎসাহী নয়। এখন সে ঘুমুবে।

জহির বলল, শাহানা, বাতি নিভিয়ে দেব?

ঃ দাও।

ঃ রাতে কিছু খাবে না?

ঃ না।

ঃ আমার উপর কি কোন কারণে রাগ করেছ?

শাহানা জবাব না দিয়ে পাশ ফিরল। এর মানে পরিষ্কার বোঝা গেল না। হয়ত রাগ করেছে। অনেক চিন্তা করেও রাগের কারণ কি জহির বের করতে পারল না। সে বাতি নিভিয়ে বসার ঘরে চলে গেল টিভি চলছে। পর্দায় নানান ছবি, কিন্তু শব্দ নেই। এও শাহানার কাণ্ড। সে সন্ধ্যা হতেই টিভি ছেড়ে সামনে বসে থাকে। শব্দ ছাড়া টিভি দেখে। এর মানে কি কে জানে। চেনাজানা কোন সাইকিয়াট্রিস্ট থাকলে আলাপ করা যেত। তেমন কেউ নেই। জহিরের মনে হয়, যে কোন কারণে হোক শাহানার মন খুব বিক্ষিপ্ত। প্রচুর কাজে তাকে ডুবিয়ে রাখতে পারলে মানসিক এই অবস্থাটা হয়ত কাটতো। তাও করা যাচ্ছে না। শাহানা আর পড়াশোনা করবে না এরকম একটা ঘোষণা গত সপ্তাহে দিয়েছে। জহির বলেছে— কেন পড়াশোনা করবে না?

ঃ ভাল লাগে না, তাই করব না।

ঃ সময় কাটবে কি করে?

ঃ যে ভাবে কাটছে সেই ভাবে কাটবে। আমাকে নিয়ে তোমায় এত ভাবতে হবে না।

ঃ কেন ভাবতে হবে না?

ঃ জানি না। আমি এত সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।

এই বলেই শাহানা উঠে গিয়ে শব্দহীন টিভির সামনে বসেছে। বসার ভঙ্গি দেখে মনে হয় পর্দার ছবিগুলির নড়াচড়া দেখে সে খুব মজা পাচ্ছে। জহির তার পেছনে এসে বসল তার পাশেই। শাহানা যেন লক্ষ্যই করল না। জহির বলল, সাউণ্ড দাও। বিনা শব্দের ছবিতে কি আছে?

শাহানা ক্লান্ত গলায় বলল, আমার এই ভাবেই দেখতে ভাল লাগে।

ঃ শব্দ তোমার ভাল লাগে না?

ঃ না।

ঃ আগে লাগতো? যখন তুমি তোমাদের বাড়িতে থাকতে?

ঃ জানি না। তোমাকে তো বলেছি, আমি এত সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।

জহির চুপ করে গেল। সে বুঝতে পারছে তাদের দু'জনের ভেতর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। এটাকে আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়। কি ভাবে দূরত্ব কমানো যায় তাও তার জানা নেই। একদিন সে বলল, গান শিখবে শাহানা? গানের মাস্টার রেখে দেই? শাহানা হ্যাঁ না কিছুই বলল না। গানের মাস্টার একজন এলেন। হারমোনিয়াম, তবলা, সেতার এল। হুলুস্থুল ব্যাপার। শাহানা দু'দিন মাস্টারের কাছে বসে তৃতীয় দিনে বলল, উনার কাছে গান শিখব না।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

ঃ উনি কথা বলার সময় মুখ থেকে থুথু বের হয়। আমার গায়ে থুথু লেগে যায়।

ঃ নতুন একজনকে রেখে দেব?

ঃ দাও।

ঃ তোমার উৎসাহ আছে তো, নাকি আমাকে খুশী করবার জন্যে..

শাহানা উত্তর দিল না। দ্বিতীয় মাস্টার এক সপ্তাহের বেশী টিকলেন না। উনি খুব সিগারেট খান। সিগারেটের গন্ধে শাহানার মাথা ধরে যায়। তৃতীয় একজন এলেন। ইনি কি করছেন না করছেন জহিরের জানা নেই। রেয়াজ করতে তাকে সে কখনো শোনে নি। জহির গানটাকে দেখছে সময় কাটানোর একটা পথ হিসেবে। কিছু একটা নিয়ে শাহানা ব্যস্ত থাকুক। মনের অস্থিরতা কমুক। কিন্তু তা কি সত্যিই কমছে?

রফিকের অফিস শুরু হয়েছে গত মাসের গোড়ায়।

শুরুর পনেরো দিন কিছু করার ছিল না। রফিকের কাজ ছিল সকালে এসে অফিসে বসে থাকা। দুপুর বেলা পর্যন্ত একনাগাড়ে বসে থাকা। কথা বলার দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। কারণ সাদেক আলি নানান জায়গায় ছুটাছুটি করছে। টাইপিস্ট হিসেবে একটি মেয়েকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। সেও আসছে না। সাদেক আলিকে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতেই বিচিত্র একটা ভঙ্গি করে বলেছে, সময় হলেই সে আসবে। কাজ নেই কোন, এসে করবেটা কি?

রফিক বিস্মিত হয়ে বলেছে, কাজ না থাকলে অফিসে আসবে না?

ঃ আসবে স্যার আসবে। ওর কাজ তো স্যার অফিসে না। কাজ অন্য জায়গায়।

ঃ তার মানে?

ঃ এইসব স্যার এখন আপনার জানার দরকার নেই। তাহলে খারাপ লাগবে।

রফিক আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছেও হয়নি। দু'দিন মেয়েটির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তার কাছে মনে হয়েছে বেশ ভাল মেয়ে। চেহারা ভাল। স্মার্ট। কথায় কথায় হাসে। এবং বেশ রসিক। রফিকের দু'একটা রসিকতায় সে বেশ শব্দ করে হাসল। একটু গায়েপড়া ধরণের স্বভাব আছে। সেই স্বভাব রফিকের কাছে খুব খারাপ লাগে নি। প্রথম দিনেই সে রফিককে বলেছে, আমার ডাকনাম হল কুসুম। আপনি স্যার আমাকে কুসুম নামে ডাকবেন। আমার ভাল নাম মোটেই সহ্য হয় না। অবশ্যি কুসুমও খুব বাজে নাম।

ঃ আপনি টাইপ কেমন জানেন?

ঃ কাজ চালাবার মত জানি। এইসব অফিসে তো স্যার মিনিটে পঞ্চাশ ওযার্ড টাইপ করার দরকার নেই। সমস্ত দিনে হয়ত তিন থেকে চারটা চিঠি টাইপ করা হয়।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জ্বি স্যার। কাজকর্ম হয় টেলিফোনে এবং টেলেক্সে। এই জাতীয় কাজের সঙ্গে আমি অনেকদিন থেকেই আছি। সবই জানি।

ঃ অনেকদিন মানে কতদিন?

ঃ প্রায় ছ'বছর।

ঃ আগের চাকরিটা ছাড়লেন কেন?

ঃ খাটুনী বেশী ছিল। সেই তুলনায় রোজগার ছিল না। নতুন ফার্মগুলিতে খাটুনী থাকে কম, রোজগার হয় বেশী। স্যার, আপনি কিন্তু আমাকে তুমি করে বলবেন।

ঃ কেন?

ঃ ছোট ফার্ম, সবাই বলতে গেলে ফ্যামিলি মেম্বারের মত। তাই নয় কি স্যার?

ঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই।

একা একা অফিসে বসে থাকার মত যন্ত্রণা অন্য কিছুতেই নেই। টেলিফোন লাইন এসেছে গত সপ্তাহে। ইদরিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু সময় কাটছে। তবে ইদরিসও ব্যস্ত মানুষ। বক বক করার সময় কোথায় তার? টেলিফোন করলেই দু'একটা কথা বলার পরই বলে, দোস্ত তাহলে রাখলাম। রফিক সহজে রাখতে দেয় না।

ঃ ইদরিস, বসে থাকতে থাকতে তো শিকড় গজিয়ে গেল। কাজকর্ম কিছুই নেই।

ঃ হবে দোস্ত হবে। ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর— বাঁধ বাঁধ বুক।

ঃ আর কত ধৈর্য ধরব।

ঃ এইসব অফিসে কর্তাদের হতে হয় মাকড়সার মত। জাল ফেলে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়। জালে কিছু একটা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলতে হয়। একবার তো পড়েছিল, তুই তো পেঁচাতে পারলি না— অন্য পার্টি নিয়ে নিল। চিন্তা করিস না, আমি সাদেক আলিকে একটা বড় টিপস দিয়েছি— হতে পারে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ, হবার সম্ভাবনা আশি ভাগ। তবে এসব লাইনে কিছুই বলা যায় না, শেষ মুহূর্তে দেখবি ডাইস উল্টে গেল। রাখলাম দোস্ত।

ঃ ব্যাপারটা কি বল? কাজটা কি?

ঃ কাজ শুনে তুই করবিটা কি? বসে মাছি মারছিস মাছি মার। যা করার সাদেক আলি করবে। ও টাকাপয়সা যা চায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিবি। কি জন্যে চাচ্ছে জিজ্ঞেস করবি না।

ঃ রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে!

ঃ রহস্য কিছুই না দোস্ত, রাখলাম।

ইদরিসের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে চারদিন আগে। এই চারদিনে কাজের অগ্রগতি কি হচ্ছে রফিক কিছুই জানে না। সাদেক আলিকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে তারও উপায় নেই। তার দেখাই পাওয়া যায় না।

আজ রফিক অফিসে এসে খুব বিরক্তি বোধ করল। গাদাখানিক ম্যাগাজিন যোগাড় করে রেখেছিল— অফিসে নিয়ে আসবে, পড়ে সময় কাটাবে। আসার সময় ভুলে ফেলে এসেছে। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। অফিসে কোন লোকও নেই যাকে পাঠানো যাবে। রফিকের ইচ্ছা ছিল একজন অফিস অ্যাসিসটেন্ট রাখার, সাদেক আলি রাজী হয় নি। দাঁত বের করে বলেছে, এখনো সময় হয় নি স্যার। সময় হলে সব হবে। অফিস অ্যাসিসটেন্ট হবে, পি. এ. হবে, ক্যাশিয়ার হবে, হেডক্লার্ক হবে, কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরেন।

রফিক ধৈর্য ধরেই আছে। ধৈর্যেরও সীমা আছে। এখন একেবারে সীমা অতিক্রান্ত করার মত অবস্থা। রফিক ইলেকট্রিক হিটার বসিয়ে দিল। আপাতত চমৎকার জাপানী কাপে চা খাওয়া যাক। চা খেতে খেতে জীবন সম্পর্কে কিছু ফিলসফিক চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। লেখার অভ্যাস থাকলে সময়টা কাজে লাগবে। দারুণ রোমান্টিক একটা গল্প ফাঁদা যেত। যেখানে তিনটি মেয়ে ভালবাসে একটি ছেলেকে। ছেলেটি আবার চতুর্থ একটি মেয়েকে ভালবাসে। কিন্তু সেই মেয়ে বিবাহিতা। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখেই আছে। জটিল পঞ্চভূজ প্রেম। সবচে ভাল হয় নিজেকে নিয়ে গল্প শুরু করলে। ধনী বাবার কন্যা ভালবাসত প্রবাসী এক ছেলেকে। হঠাৎ মতিভ্রম হল, বিয়ে করে বসল চালচুলা নেই এক বেকার যুবককে। সেই বেকার যুবক হচ্ছে একজন আর্দশবান, অনুভূতিপ্রবণ, কোমল-হৃদয় পুরুষ।

রফিক বসে আছে চুপচাপ। গল্প তরতর করে এগুচ্ছে মনে মনে। গল্প লেখার কাজটা এত সহজ তার ধারণা ছিল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে টেলিফোন ধরল।

ঃ হ্যালো?

ঃ স্যার। আমি সাদেক।

ঃ কি খবর সাদেক সাহেব?

ঃ হাজার পাঁচেক টাকা দরকার স্যার, আধঘন্টার মধ্যে।

ঃ কেন?

ঃ ব্যাপার আছে স্যার। একটা মেয়ে আসবে আপনার কাছে। তাকে টাকাটা দেবেন। নাম হচ্ছে নমিতা। নমিতা নাম বললেই টাকাটা দিয়ে দেবেন। আমি আসতে পারছি না। অন্য যোগাড়যন্ত্র করতে হচ্ছে।

ঃ ক্যাশ টাকা তো নেই।

ঃ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে আসেন স্যার। যাবেন আর আসবেন। মেয়েটা যেন আবার চলে না যায়।

ঃ মেয়েটা কে?

ঃ তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। কাজ হওয়া নিয়ে কথা। বহুকষ্টে একে যোগাড় করা হয়েছে।

ঃ ব্যাপারটা কি একটু বলুন।

ঃ একটা ঘরোয়া ধরনের পার্টির মত হবে। ঐ সব পার্টির শোভা দরকার। শোভা হিসেবে দু'জন মেয়ে যাবে। একজন হচ্ছে আমাদের কুসুম, অন্যজন নমিতা। রাস্তার মেয়ে তো আর পাঠানো যায় না। সবটা নির্ভর করছে ওদের উপর। স্যার, আমি টেলিফোন রাখলাম— আপনি টাকাটার যোগাড় দেখেন।

নমিতা কোন রকম কথা ছাড়া টাকাটা ব্যাগে ভরল। কি মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। চোখ দু'টি বিষণ্ণ। ছায়াময় চোখ বোধহয় একেই বলে। বড় বড় পল্লব ছায়া ফেলেছে চোখে। মেয়েটির গায়ে গাঢ় নীল রঙের একটা চাদর। এই নীল রঙের জন্যেই তাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে?

নমিতা বলল, আমি আপনার অফিসে খানিকক্ষণ বসব। সাদেক আলি সাহেব এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।

ঃ বসুন।

ঃ উনি কি আমার ড্রেস সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

ঃ না, কিছু বলেননি। যা পরে এসেছেন তাতেই আপনাকে চমৎকার লাগছে। মেয়েটি এক পলক তাকাল রফিকের দিকে।

বরফের মত শীতল চোখ। কোনরকম আবেগ উত্তেজনা সেখানে নেই। রফিক বলল, আপনি কি চা খাবেন?

ঃ না।

ঃ আমি খাব। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খান।

মেয়েটি হ্যাঁ না কিছুই বলল না। রফিক দু'কাপ চা বানাল। এক কাপ রাখল মেয়েটির সামনে। সে এই চা ছুঁয়েও দেখল না। ক্লান্ত গলায় বলল, দু'টা প্যারাসিটামল এনে দিতে পারেন?

ঃ এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। যাব আর আসব।

ঃ আপনি নিজেই যাবেন?

মেয়েটি হেসে ফেলল। কি সুন্দর হাসি। রফিকের ইচ্ছা হল বলে, আপনার কোথাও যেতে হবে না। আপনি, বাড়ি যান।

আমরা অধিকাংশ কথাই বলতে পারি না।

শারমিন ছাদে একা একা হাঁটছিল। এ বাড়ির ছাদে সে খুব কম আসে। কেন জানি ছাদটা তার খুব ভাল লাগে না। ছাদে উঠলেই নিজের বাড়ির বিশাল ছাদের কথা মনে হয়। উঁচু রেলিং ঘেরা ছোটখাট ফুটবল মাঠ। সেখানে যখন শারমিন গিয়ে দাঁড়াত, আশপাশের কেউ তাকে দেখতে পেত না। কত সহজেই একা হওয়া যেত। এখানে সে সুযোগ নেই। চিলেকোঠার ঘরে থাকে আনিস। আশপাশের বাড়ির কয়েকজন ছেলেমেয়েও এখানে খেলতে আসে। চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দেয়।

আজ অবশ্যি কেউ নাই। আনিসের দরজার উপর একটা কাগজে বড় বড় করে লেখা--
"আমি এক সপ্তাহের জন্যে বাইরে গেলাম।" সেই এক সপ্তাহ কবে শুরু হবে আবার কবেই বা শেষ হবে কে জানে। শারমিনের খুব ইচ্ছা করল ছোট ছোট করে লেখে— আপনার এই সপ্তাহ কবে শুরু?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। শারমিনের মন খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল সন্ধ্যা মিলানোর আগ পর্যন্ত ছাদে থাকবে। সূর্য ডোবা দেখবে। সেটা আর সম্ভব হল না। পৃথিবী এমন, যারা একা

থাকতে চায় তারা একা থাকতে পারে না। রাজ্যের মানুষ এসে তাদের চারপাশে ভীড় করে।

ঃ শারমিন!

ঃ আরে ভাবী, তুমি?

ঃ নাও চা নাও।

ঃ বুঝলে কি করে আমি ছাদে?

নীলু হাসতে হাসতে বলল, আমি হচ্ছি মহিলা শার্লক হোমস। ছাদে কি করছ?

ঃ তেমন কিছু না। এবার শীত তেমন পড়ল না, তাই না ভাবী?

ঃ হুঁ। ফাল্গুন চলে এসেছে নাকি?

ঃ কি জানি। আমি এখন আর দিন তারিখের হিসাব রাখি না।

শারমিন রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নীলু বলল, তোমার কি হয়েছে শারমিন বল তো।

ঃ কই, কিছুই হয়নি তো।

ঃ কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছ। রফিকের সঙ্গে কি কোন কিছু নিয়ে বাক্যালাপ বন্ধ?

ঃ না।

ঃ ও কি সব অফিস-টফিস খুলেছে, তুমি তো দেখতে যাও নি?

ঃ যাব একদিন, দেখে আসব।

ঃ তুমি বাইরে চলে যাবে এরকম একটা কথা শুনতে পাচ্ছি। এটা কি গুজব না সত্যি?

ঃ সত্যি।

ঃ রফিক এক জায়গায়, তুমি এক জায়গায়?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ এটা কি ভাল হবে?

শারমিন অল্প হাসল। খুব সহজেই সেই হাসি ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বলল, কত ছেলেই তো বৌকে ফেলে পিএইচডি করতে যায়। আমি গেলে সেটা দোষের হবে কেন?

ঃ দোষের হবে না! এখন তোমাদের দু'জনেরই ভালবাসাবাসির সময়। এ সময় আলাদা হওয়াটা ঠিক হবে না। তুমি আরো ভাল করে ভেবে দেখ।

ঃ দিনরাতই ভাবছি।

ঃ বরং একটা কাজ কর, তুমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাক। একটা বৈচিত্র্য আসুক। দিনের পর দিন এক জায়গায় থেকে তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ। কিছুদিন ওখানে থাকলে তোমার ভাল লাগবে।

শারমিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিও তাই ভাবছি ভাবী।

ঃ এত ভাবাভাবির কিছু নেই। বেশ কিছুদিন থেকে আস। এখানে দিনরাত কেমন গম্ভীর হয়ে থাক আমার ভয়-ভয় লাগে। রফিকের না জানি কি অবস্থা।

নীলু তরল গলায় হেসে উঠল। শারমিন, বলল, আমি আজ সন্ধ্যায় চলে গেলে কেমন হয় ভাবী?

ঃ আজই যাবে?

ঃ বাড়িওয়ালার বাসা থেকে টেলিফোন করলেই গাড়ি চলে আসবে। ভাবী যাব?

ঃ বেশ তো যাও। রফিককে আমি পাঠিয়ে দেব।

নীলু লক্ষ্য করল শারমিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দিনের শেষ আলো পড়েছে শারমিনের চুলে। চুলগুলি কেমন লালচে দেখাচ্ছে। সুন্দর লাগছে শারমিনকে।

রফিক বাসায় ফিরল রাত ন'টায়। তাকে দেখেই টুনী বলল, ছোট চাচী চলে গিয়েছে।

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় গেছে?

ঃ উনার নিজের বাড়িতে। সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। মনে হয় আর আসবে না।

রফিক গম্ভীর হয়ে গেল। রাত এগারোটায় ম্যানেজার সাদেক আলি এসে পাংশুমুখে বলল, স্যার কাজটা হয়নি ।

রফিক শান্ত স্বরে বলল, না হলে কি আর করা যাবে। আপনি আপনার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। বাড়ি যান বিশ্রাম করুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবেন।

সাদেক আলি মৃদু স্বরে বলল, ওরা স্যার আগেই অন্য পার্টির সঙ্গে সব ঠিকঠাক করে আমাকে বলেছে একটু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করতে। বলেছে, আমাদের খুশী করে দিন, তাবপর দেখুন আপনাদের খুশী করতে পারি কিনা।

ঃ ঠিক আছে, বাদ দিন। যা হবার হয়েছে।

ঃ আমি বাদ দেব? বলেন কি স্যার? আমার নাম সাদেক আলি না? আমার সাথে মামদোবাজী করবে, আমি চুপ করে থাকব?

ঃ কি করবেন আপনি?

ঃ আমি যে কি পরিমাণ শয়তান আপনি তা জানেন না স্যার।

ঃ সাদেক আলি সাহেব'

ঃ জ্বি।

ঃ কাজটা না হওয়ায় আমি খুশীই হয়েছি। সামান্য একটা কাজের জন্যে মেয়েমানুষ পাঠাব এটা তো হয় না। আমি ভদ্রলোকেব ছেলে। আমার বাবা জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলেননি। আমার এক মামা— কবির মামা, তিনি তাঁব নিজের জীবনটা দিয়েছিলেন অন্যেব জন্যে। সাদেক আলি সাহেব, আমার সারাটা দিন খুব মন খারাপ ছিল। কাজটা হয়নি শুনে মনটা ভাল হয়েছে।

ঃ আপনি তো স্যার ব্যবসা করতে পারবেন না।

ঃ বোধহয় পারব না। বসুন, এক কাপ চা খেয়ে তারপর যান।

সাদেক আলি বলল, আপনার মন ভাল হয়েছে খুব ভাল কথা। আমাব মনটা এখনো খারাপ, ঐ শালাকে শিক্ষা দিতে না পারলে স্যার আমার মন ভাল হবে না। চা খাব না স্যার, আমি যাই। স্লামালিকুম।

নীলগঞ্জ থেকে বাবলুব একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটা কার কাছে লেখা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ কোন সম্বোধন নেই। চিঠির বক্তব্যও সার্বজনীন— আমি ভাল আছি। তুমি কেমন

আছ? ইতি বাবলু। চিঠি যেমনই হোক, চিঠির সঙ্গের শিল্পকর্মটি অসাধারণ— একটি তিন মাথাওয়ালা গরু ঘাস খাচ্ছে।

মনোয়ারা ছবি দেখে আঁতকে উঠে বললেন, তোমাকে কতবার বলেছি বৌমা, ছোঁড়াটার মাথা খারাপ। তুমি তো বিশ্বাস কর না। দেখ একটা গরু এঁকেছে, মাথা তিনটা।

নীলু হাসতে হাসতে বলল, ছেলেমানুষ।

ঃ ছেলেমানুষ হলেই তিন মাথার গরু আঁকতে হবে? ছি ছি, কি ঘেন্নার কথা!

ছবি দেখে টুনী বেশ মন খারাপ করল। বাবলু যে ছবি আঁকতে পারে তাই তার জানা ছিল না। তাও এমন সুন্দর ছবি, যা সবাই কত আগ্রহ নিয়ে দেখছে। টুনী তার মাকে ধরল, মা, গরু আঁকা শিখিয়ে দাও।

নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, গরু আঁকা আমি জানি না মা, তোমার দাদুর কাছে যাও।

ঃ না, তুমি শিখিয়ে দাও।

ঃ দেখছ না আমি একটা চিঠি পড়ছি। কেন বিরক্ত করছ টুনী?

ঃ না, তুমি শিখিয়ে দিবে। তুমি......

নীলু মেয়ের গালে এক চড় বসিয়ে দিল। টুনী ইদানীং খুব বিরক্ত করছে। যা একবার বলবে তাই করতে হবে। গতরাতেও তাই করেছে। রাতে খাবার টেবিলে বলে বসল— পোলাও খাব মা।

নীলু বলল, পোলাও তো রান্না হয়নি, খাবে কি করে?

ঃ এখন রাঁধ।

ঃ কী বলছ টুনী? এখন পোলাও রাঁধব কি?

ঃ না, রাঁধতে হবে। এখনই রাঁধ।

ঃ কাল পোলাও হবে। এখন খেয়ে নাও।

ঃ তাহলে আমি খাব না।

টুনী টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। কিছুতেই তাকে খেতে বসানো গেল না। সত্যি সত্যি রাত দশটায় রান্না চড়াতে হল। মনোয়ারা গজ গজ করতে লাগলেন— একটা মাত্র বাচ্চা, এরকম তো করবেই। তিন-চারটা ভাইবোন থাকলে এমন হত না। কি আর করা যাবে! সবাই হয়েছে আধুনিক। একটা মাত্র বাচ্চা। ছেলে হলেও একটা কথা ছিল। মেয়ে পরের বাড়ি চলে যাবে।

কিছুদিন থেকেই মনোয়ারা এই লাইনে কথাবার্তা বলছেন। কথার সারমর্ম হচ্ছে, আরো ছেলেপুলে দরকার। বংশরক্ষার জন্যে হলেও ছেলে দরকার । তাছাড়া এক সন্তান সংসারে অলক্ষ্মী ডেকে আনে। এইসব কথাবার্তা হয় কাজের মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু উদ্দেশ্য নীলু। সেদিন নীলু অফিসে যাবার সময় শুনল মনোয়ারা কাজের মেয়েটিকে বলছেন, এক সন্তান সংসারে থাকলে কি হয়, জানিস? একা একা থাকে তো, কাজেই অলক্ষ্মীকে ডাকে। তখন অলক্ষ্মী এসে সংসারে ঢুকে পড়ে। আর অলক্ষ্মী একবার সংসারে ঢুকলে উপায় আছে? সব ছারখার হয়ে যায়।

নীলু শুনেও না শোনার ভান করে। মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত হয়। তার শাশুড়ির মাথায় একবার কোন জিনিস ঢুকে পড়লে খুব মুশকিল। তিনি সেটা নিয়ে দিনের পর দিন কথা বলবেন। অন্যে কি ভাবছে তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাবেন না। মানুষ এরকম একচোখো

হয় কি ভাবে?

তবে টুনী যে বেশ নিঃসঙ্গ তা নীলু বুঝতে পারে। নিঃসঙ্গ মানুষ খুব জেদী হয়। টুনী যেমন হয়েছে। একটু আগে চড় খেয়েছে। চোখে পানি আসেনি। মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু বলল, কি হল, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমি গরু আঁকতে পারি না, একবার তো বললাম।

ঃ তুমি পার।

ঃ তুমি বললেই তো হবে না। আমাকে আঁকা জানতে হবে।

ঃ তুমি জান।

নীলু দ্বিতীয় চড়টা বসাল। টুনী এতেও কাঁদল না। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। মনোয়ারা পুরো দৃশ্যটা দূর থেকে দেখছিলেন, তিনি বললেন, বেশ করেছ। শুধু যন্ত্রণা করে।

নীলুর বেশ মন খারাপ হল। তার শাশুড়ি এ রকম কেন বলবেন? দাদু নানীরা সংসারে থাকতেন তাদের সঙ্গে। চোখে ভাল দেখতেন না। হাঁটাচলাতেও কষ্ট হত। অথচ কেউ যদি নীলুকে কড়া কোন কথা বলেছে উনি ছুটে এসে চিলের মত ছোঁ দিয়ে নীলুকে নিয়ে গেছেন। আর কি রাগ। একবার নীলু কানের দুল হারিয়ে ফেলেছে। নীলুর মা তাকে খুব মার দিলেন। নীলুর দাদী এসে বললেন, বৌমা, তোমার এত সাহস! তুমি আমার সামনে মেয়েটাকে মারলে? কানের দুল হারিয়েছে তো কি হয়েছে? জিনিস হারায় না? তুমি কি সারাজীবনে কিছু হারাও নি?

নীলুর মা বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে মা। এ রকম আর হবে না।

নীলুর দাদী সেদিন ভাত খেলেন না। সবার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। নীলুর মা অনেক কান্নাকাটি করে হাত-পা ধরে তাঁর রাগ ভাঙ্গালেন।

সংসারে দাদী নানীরা এ রকম হবেন। টুনীর দাদীর মত মুখ কুঁচকে বলবেন না— মেরেছ বেশ করেছ। ভাল করেছ। শুধু যন্ত্রণা করে।

নীলুর মনে হল চাকরি করতে গিয়ে সে অফিসের সঙ্গে বড় বেশী জড়িয়ে পড়েছে। অবহেলা করছে তার মেয়েকে। মা'রা বাচ্ছাদের হাত ধরে ধরে স্কুলে নিয়ে যান, ফিরিয়ে আনেন। সারা পথে বাচ্চারা মনের আনন্দে কত গল্প করে মা'র সঙ্গে। স্কুলের গল্প, বন্ধুবান্ধবদের গল্প। টুনীর সে সুযোগ নেই।

নীলু ঠিক করল আজ অফিসে দেরী করে যাবে। টুনীকে নিজেই স্কুলে পৌছে দেবে। বিকেলে তাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে যাবে। কয়েকটা গল্পের বই, একটা স্কুল ব্যাগ, এক বাক্স ভাল চকলেট। বাবলু না থাকায় মেয়েটা খুব একা হয়ে গেছে। মামার কুলখানি তো কবেই হয়েছে, এখনো তারা আসছে না কেন কে জানে। দুলাভাই মানুষটা কান্ডজ্ঞানহীন, কে জানে হয়ত নীলগঞ্জেই খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। ছেলের স্কুলের কি হবে কিছুই ভাবছে না।

টুনী তার মার সঙ্গে স্কুলে যাবার কোন আগ্রহ দেখাল না। কঠিন মুখে বলল— আমি তোমার সঙ্গে স্কুলে যাব না।

ঃ কেন, আমি কি দোষ করেছি?

ঃ আমি যাব না।

ঃ দুজনে গল্প করতে করতে যাব।

ঃ বললাম তো যাব না।

ঃ বিকেলে তোমাকে নতুন স্কুল ব্যাগ কিনে দেব।

ঃ না না না।

ঃ তুমি খুব অবাধ্য হয়েছ টুনী।

ঃ হয়েছি ভাল করেছি।

মনোয়ারা ভেতর থেকে বললেন—বৌমা, একটা চড় দাও। তেজ বেশী হয়ে গেছে। তেজ কমুক।

নীলু অফিসে চলে গেল। তার মন বিষণ্ণ। মেয়েটা অনেকটা দূরে সরে গেছে। সে বুঝতে পারেনি। আজ মেয়েটাকে নিয়ে বেরুতে হবে। সারা সন্ধ্যা ঘুরবে।

অফিসে পৌঁছতেই শরিফ সাহেব বললেন—আপা, আপনাকে বড় সাহেব আর্জেন্ট মেসেজ দিয়ে রেখেছেন। আপনি যেন আসামাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। খুব জরুরী।

ঃ ব্যাপার কি ?

ঃ আপনাকে চিটাগাং যেতে হবে।

ঃ কেন?

ঃ আছে অনেক ব্যাপাব।

ঃ কবে যেতে হবে?

ঃ আজই। আজ দুপুরের মধ্যেই রওনা হতে হবে।

ঃ সে কি ?

ঃ বড় সাহেব নিজেও যাবেন আমিও যাচ্ছি। দু'দিনের মামলা। কোম্পানীর মাইক্রোবাস যাবে।

নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। দুপুরে রওনা হতে হলে হাতে একেবারেই সময় নেই। বাসায় যেতে হবে। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হবে। সফিককে খবর দিতে হবে। আচ্ছা টুনীকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না? না, তা কি আর হয়। সে থাকবে অফিসের কাজে ব্যস্ত, টুনী গিয়ে কি করবে? কি বিশ্রী ঝামেলা।

নীলু রওনা হল একটার সময়। সে সফিকের সঙ্গে দেখা করে গেল। কিন্তু টুনীর সঙ্গে দেখা হল না, টুনীর পড়ার টেবিলে একটা চিঠি লিখে গেল—

"মাগো, আমার দশটা নয় পাঁচটা নয় একটা মাত্র মেয়ে। সেই মেয়ে যদি আমার উপর রাগ করে আমার খুব কষ্ট হয়।"

আনিস গিয়েছিল দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে। সেখানে হাত সাফাইয়ের একজন বড় ওস্তাদ থাকেন। ঠিকানা জানা ছিল না। ষ্টার ফার্মেসির উল্টো দিকে তার বাসা। নাম— ইনাম শেখ।

ষ্টার ফার্মেসি নামে কোন ফার্মেসির সন্ধান পাওয়া গেল না। ইনাম শেখের নামও কেউ শুনেনি। এতগুলি টাকা খরচ করে আসা। আনিসের ইচ্ছা কবছে ডাক ছেড়ে কাঁদে। যাদের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে তারা ভুল খবর দেবে এটা বিশ্বাস্য নয়। ইনাম শেখ আছে নিশ্চয়ই—কেউ খোঁজ জানে না। ম্যাজিশিয়ানদের খোঁজখবব কে আর রাখবে? এক কালে মুগ্ধ ও বিস্মিত হবার জন্যে মানুষ ম্যাজিক দেখতো। আজকাল মানুষকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার আয়োজনের কোন অভাব নেই।

আনিস হাল ছাড়ল না। রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, চায়ের দোকানের মালিক, সিনেমা হলের গেটকিপার সবাইকে জিজ্ঞেস করে—ভাই, আপনারা একটা খোঁজ দিতে পারেন? ইনাম শেখ, ম্যাজিক দেখায়, হাত সাফাইয়ের খেলা জানে..!

উত্তরে সব্াই বলে—উনার বাসা কোথায়? মানুষের নির্বুদ্ধিতায় তার গা-জ্বালা করে। বাসা কোথায় জানা থাকলে সে জনে জনে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে কেন? নিজেই তো উপস্থিত হত সেখানে।

আনিস ঠিক করল সে সব মিলিয়ে একশ জনকে জিজ্ঞেস করবে। তারপর মাইক ভাড়া করে হারানো বিজ্ঞপ্তি দেবে—ভাইসব! ইনাম শেখ নামে একজন ম্যাজিশিয়ানের সন্ধান-প্রার্থী। বয়স পঞ্চাশ। মুখে দাড়ি আছে, রোগা, লম্বা। পরনে নীল লুঙ্গী।

আনিস অবশ্যি জানে না ইনাম শেখের বয়স পঞ্চাশ কি না। মুখে দাড়ি, রোগা, লম্বা এসব তার কল্পনা। দরিদ্র মানুষ এবকমই হয়।

শেষ পর্যন্ত মাইকে বিজ্ঞপ্তি দেয়াব দরকার হল না। ইনাম শেখকে পাওয়া গেল। বয়স ষাটের উপরে। দু'টি চোখেই ছানি পড়েছে। চলাফেরার সামর্থ্য নেই। ছেলের বাড়িতে থাকে। ছেলে মটর-মেকানিক। বাসা মেয়েদের হাই স্কুলের পেছনে। দু'কামরার একটা টিনের ঘর। চট দিয়ে ঘেরা বারান্দায় ইনাম শেখের জন্যে খাটিয়া পাতা। বিকট দুর্গন্ধ আঁসছে লোকটির গা থেকে। কিছুক্ষণ পরপরই সে প্রবল বেগে মাথা চুলকাচ্ছে এবং বিড় বিড় করে বলছে—শালার উকুন!

ঢাকা থেকে একজন লোক তার কাছে হাত সাফাইয়ের কাজ শিখতে এসেছে শুনে সে বলল—"যা শালা, ভাগ!"

বাড়ির ভেতর থেকে দশ এগারো বছরের একটি বালিকা বের হয়ে বলল, দাদার মাথা খারাপ। আপনে যান গিয়া। আপনেরে মারব।

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, সবাইকে মারে নাকি?

ঃ হ মারে। থুক দেয়। খুব বজ্জাত।

বুড়ো ছানি পড়া চোখে তাকিয়ে আছে। যে ভাবে তাকিয়ে আছে তাতে মনে হচ্ছে কিছু একটা করে বসতে পারে।

ঃ তোমার দাদা ম্যাজিক জানে?

ঃ না। খালি মানুষের শইলে থুক দেয়। খুব বজ্জাত। আফনে যান গিয়া, আপনেরে থুক দিব।

আনিস একটু সরে দাঁড়াল। এ বুড়োর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। এত দূর এসে চলে যেতেও মন সরছে না। আনিস অনুনয়ের স্বরে বলল, চাচামিয়া, হাতের কাজ কিছু

জানেন?

বুড়ো কুৎসিত একটা গাল দিয়ে আনিসের দিকে সত্যি থুথু ফেলল। অদ্ভুত নিশানা। সেই থুথু এসে পড়ল আনিসের প্যান্টে। ছোট মেয়েটা মজা পেয়েছে খুব। হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ছে। হাসি থামিয়ে বলল, আপনেরে কইলাম না বুড়া খুব বজ্জাত। বিশ্বাস হইল?

ঃ তোমার নাম কি খুকী?

ঃ ময়না।

ঃ স্কুলে পড় ?

ঃ না।

বুড়ো আবার থুথু দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আনিস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে এল। শুধু এতগুলি টাকা নষ্ট হল। ঢাকায় ফিরে গেলেও সমস্যা হবে। যে দু'টি বাচ্চাকে সে প্রাইভেটে পড়ায় তাদের মা কাটা কাটা স্বরে কথা শুনাবেন—কোথায় ছিলেন এই ক'দিন? বাচ্চাদের পরীক্ষার সময় আপনি যদি এ রকম ডুব মারেন তাহলে কি ভাবে হবে? একটা কাজ করছেন, দায়িত্ব নিয়ে করবেন না? আপনাকে তো রেগুলার বেতন দিচ্ছি। দিচ্ছি না?

এইসব কথা অবশ্যি সে গায়ে মাখে না। কোন কথাই আজকাল সে গায়ে মাখে না। কেউ যদি গায়ে থুথু ফেলে তাও সে অগ্রাহ্য করতে পারে। এসব সহ্য হয়ে গেছে। তবে ট্যুশনী দু'টি চলে গেলে তার কষ্ট হবে। রাস্তায় রাস্তায় ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতে হবে।

ঢাকায় ফিরবার পথে জাপানী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হল। ভদ্রলোকের নাম 'কাওয়ানা'। বাসে তিনি বসেছেন আনিসের পাশে। টেকনিক্যাল টিমের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিন বছর কাটিয়ে দেশে ফিরবেন। দেশে যাবার আগে বাংলাদেশ ঘুরতে বের হয়েছেন। হাসিখুশী ধরণের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ কিন্তু দেখায় ত্রিশের মত। ভাল বাংলা বলতে পারেন। শুধু ক্রিয়াপদগুলি একটু উলট-পালট হয়ে যায়। আনিস একজন ম্যাজিশিয়ান শুনে তিনি খুবই অবাক হলেন।

ঃ আপনি কি একজন পেশাদার ম্যাজিশিয়ান?

ঃ শখের ম্যাজিশিয়ান। পেশাদার ম্যাজিশিয়ান হবার মত সুযোগ নেই।

ঃ সুযোগ থাকলে হতেন?

ঃ হ্যাঁ হতাম।

ঃ ম্যাজিকের ব্যাপারে আমার নিজেরও আগ্রহ। আমি দেশের একটা ম্যাজিক ক্লাবের সদস্য।

ঃ আপনি নিজে ম্যাজিক জানেন?

ঃ না, আমি জানি না আমার দেখতে ভাল লাগে। আপনি কি ধরণের ম্যাজিক দেখান? যন্ত্রনির্ভর?

ঃ জ্বি না। যন্ত্রপাতি কোথায় পাব? বেশীর ভাগই পামিংয়ের কৌশল।

ঃ পামিং কেমন জানেন?

ঃ ভালই জানি।

ঃ এই সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে লুকাতে পারবেন?

ঃ হ্যাঁ পারব।

আনিস মুহূর্তের মধ্যেই সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেলল। প্রথম ডান হাতে, সেখান থেকে অতি দ্রুত বাঁ হাতে। বাঁ হাত থেকে আবার ডান হাতে। জাপানী ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। এতটা তিনি আশা করেন নি।

ঃ দয়া করে আরেকবার করুন।

আনিস দ্বিতীয়বাব কবল। বাসের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে দেখছে। দু'টি ছোট বাচ্চা উঠে এসেছে আনিসের কাছে। জাপানী ভদ্রলোক বললেন— অপূর্ব! আমি এত চমৎকাব পামিং এর আগে দেখিনি। পামিংয়েব কৌশলে সবচে ভাল খেলা আপনার কোনটি?

ঃ গোলাপ ফুলের একটি খেলা আমি দেখাই। শূন্য থেকে গোলাপ তৈরী করি। ঐটি চমৎকার খেলা।

ঃ ক'টি গোলাপ বেব করতে পারেন?

ঃ গোটা দশেক পারি।

ভদ্রলোক আনিসের ঠিকানা রাখলেন। বললেন, আমি দেশে যাবার আগে অবশ্যই আপনাব গোলাপের খেলা দেখে যাব।

ভদ্রলোক তাঁর কথা বাখলেন না, তবে কিছুদিন পর আনিস "জাপান ইয়াং ম্যাজিশিয়ান সোসাইটি"র সম্পাদকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। যার বক্তব্য হচ্ছে— তারা তাদেব প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আনিসকে নিমন্ত্রণ করছে তার গোলাপের খেলা দেখানোব জন্যে। আনিসের যাওয়া আসার খরচ এবং এক সপ্তাহ জাপানে থাকার খরচ সোসাইটি বহন কববে। আনিসের সম্মতি পেলেই তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আনিস দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল। কত আনন্দের খবর! কিন্তু এমন কষ্ট হচ্ছে কেন? সত্যি সত্যি তার চোখে পানি এসে গেছে।

পৃথিবী বড়ই বহস্যময়। সে যদি ইনাম শেখ বলে এক বুড়োর খোঁজে না যেত, তাহলে সহৃদয়বান ঐ জাপানী ভদ্রলোকের সাথে তার দেখা হত না। এই যোগাযোগের পেছনে কাবো অদৃশ্য হাত সত্যি কী আছে? কেউ কি আড়ালে বসে লক্ষ্য করছে আমাদেব? অসীম করুণাময় কেউ?

টুকটুক করে দরজায় টোকা পড়ছে। শাহানা যেমন করে টোকা দিত। আনিস বলল, কে?

বীণা বলল, আমি।

আনিস দরজা খুলল। বীণার মুখ গম্ভীব। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই সে কেঁদেছে, চোখ ফোলা ফোলা।

ঃ কি খবর বীণা?

ঃ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে আসতে দিন। আনিস সরে দাঁড়াল। বীণা ভেতরে ঢুকল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল। আনিস বলল, কি হয়েছে বল তো?

ঃ আপনাকে কি মা কিছু বলেছেন?

ঃ না, কিছু বলেন নি।

ঃ সত্যি করে বলুন।

ঃ সত্যি বলছি।

ঃ মা কিছুই বলেন নি?

ঃ না।

ঃ আনিস ভাই, আপনি এই বাসা ছেড়ে চলে যান।

ঃ আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাব?

ঃ জানি না কোথায় যাবেন। মোটকথা আপনি এখানে থাকবেন না। কাল ভোরে যেন আপনাকে আর না দেখি।

ঃ কি হয়েছে বল তো বীণা?

ঃ কিছু হয়নি। কাল ভোরে চলে যাবেন।

ঃ আমার যাবার তো কোন জায়গা নেই।

ঃ জায়গা না থাকলে রাস্তায় থাকবেন। ফুটপাতে ঘুমুবেন। এই শহরে হাজার হাজার লোক ফুটপাতে ঘুমায়। আপনিও ঘুমুবেন। যখন খাওয়া জুটবে না ভিক্ষা করবেন।

বীণা উঠে দাঁড়াল। আনিসকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আনিস বীণার অদ্ভুত কথাবার্তার কিছুই বুঝল না। বোঝার কথাও নয়। বীণা কখনো পরিষ্কার করে কিছু বলে না। অর্ধেক কথা বলে অর্ধেক নিজের মধ্যে রেখে দেয়।

গত রাতে মার সঙ্গে তার বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়ার শুরুটা এরকম— রাতে ঘুমুতে যাবার আগে লতিফা একটা ছবি আঁচলে লুকিয়ে বীণার ঘরে ঢুকে নানান কথা বার্তা বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বীণা বলল, কি বলতে এসেছ বলে ফেল, আমি ঘুমুব। আঁচলে ওটা কি ? কার ছবি?

লতিফা বললেন, ছেলেটার নাম ইমতিয়াজ। ইন্টার্নী ডাক্তার।

ঃ ইন্টার্নী ডাক্তারের ছবি আঁচলে নিয়ে ঘুরছ কেন?

ঃ কি জন্যে ঘুরছি তুই ভালই জানিস। এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন? আমি তোর মা না?

ঃ মা, তুমি ছবি নিয়ে বিদেয় হও, এই ঘোড়ামুখী ছেলে আমার পছন্দ না। ছবি দেখলেই ইচ্ছা করে ব্যাটার গালে একটা খামচি দেই।

লতিফা স্তম্ভিত। কি ধরণের কথাবার্তা বলছে মেয়ে? সামান্য ভদ্রতা, আদবকায়দাও কি সে জানে না? অশিক্ষিত মূর্খ মেয়েও তো নয়। লতিফা হিসহিস করে বললেন, তোর সমস্যাটা কি আমি জানি।

ঃ জানলে বল?

ঃ তোর গলায় দড়ি বাঁধা আছে দু'তলার ছাদে। ঐ দড়ি না কাটলে তোর মুক্তি হবে না।

ঃ দড়ি কেটে মুক্তি দিয়ে দাও। দেরী করছ কেন?

ঃ তাই করব। হারামজাদাকে লাথি দিয়ে বের করব।

ঃ গালাগালি করছ কেন?

ঃ গালাগালি করব না তো কি করব? কোলে নিয়ে বসে থাকব? হারামজাদা ছোটলোক। সকাল হোক কানে ধরে বের করে দেব। ফুটপাতের ছোকরা ফুটপাতে থাকবে। ভিক্ষা করবে।

ঃ সকাল হলে বের করে দেবে?

ঃ হ্যাঁ, দেবই তো।

ঃ বেশ দাও।

বীণা হাই তুললো। মশারী ফেলতে ফেলতে বলল, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কি ? এখনি বিদেয় করে দাও। অপ্রিয় কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভাল। তুমি মা দয়া করে এখন উঠ। আমি এখন ঘুমুব।

লতিফা উঠলেন। সেই রাতে তাঁর ঘুম হল না। অজানা আশংকায় বুক কাঁপতে লাগল। আনিস ছেলেটি শনিগ্রহের মত এ বাড়িতে ঢুকেছে। বড় কোন সর্বনাশ সে করবে এটা তিনি অনুভব করছেন। যে করেই হোক একে বিদেয় করতে হবে। হাতে শ'পাঁচেক টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলা যায়— এখানে আমার কিছু অসুবিধা আছে, তুমি অন্য কোথাও যাও। না, এ রকম বলা ঠিক হবে না। 'অসুবিধা আছে' বলার দরকার কি? কোনই অসুবিধা নেই। বলতে হবে ছাদের ঘরটা আমাদের দরকার, কাজেই তুমি কোন মেসে-টেসে গিয়ে উঠ।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গলায় বলতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে এবার তাকে আসর ভেঙ্গে উঠতে হবে।

লতিফা গভীর রাতে বাথরুমে গিয়ে মাথায় পানি ঢাললেন। কপালের দু'পাশের শিরা দপ দপ করছে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠাণ্ডা পানি ঢেলেও সে যন্ত্রণার আবাম হল না। বসার ঘরে একা জেগে বসে রইলেন। আনিসকে কি করে অতি ভদ্র ভাবে অথচ শক্ত ভাষায় বাড়ি ছাড়ার কথা বলা যায় তাই ভাবতে লাগলেন।

তাঁকে কিছু বলতে হল না। বীণাব কথাতেই কাজ হল। পবদিন সন্ধ্যাবেলা আনিস তার বিছানা ও সুটকেস গুছিয়ে বিদায় নিতে এল।

লতিফাকে বলল—বীণা কোথায় মামী?

ঃ পড়ছে।

ঃ ওকে একটু ডেকে দিন না।

ঃ পড়াশোনার মধ্যে ডাকাডাকি করলে ও খুব বিবক্ত হয়। যা বলবার আমাকে বল, ওকে আমি বলে দেব।

ঃ আমি চলে যাচ্ছি মামী। অনেক দিন আপনাদের বিরক্ত করলাম।

লতিফা বিব্রত স্বরে বলল, না না, বিরক্ত কিসের? নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছ খুব ভাল কথা।

ঃ যদি অজান্তে কোন অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন। কিছু মনে রাখবেন না।

লতিফা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। অতি দ্রুত চিন্তা কবেও এই ছেলেটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করাতে পারলেন না।

ঃ মামী, আপনি কি কোন কারণে আমাব উপর অসন্তুষ্ট?

ঃ না না, অসন্তুষ্ট হব কেন?

ঃ তাহলে যাই মামী। স্লামালিকুম।

লতিফা প্রায় জিজ্ঞেস কবে ফেলছিলেন—কোথায় যাচ্ছ? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালেন। বাড়তি খাতির দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। যাক যেখানে ইচ্ছা। আবার উদয় না হলেই হল।

আনিস চলে গিয়েছে এই খবর বীণা সহজ ভাবেই গ্রহণ করল। কখন গিয়েছে, যাবার সময় কি বলেছে এইসব নিয়ে কোন আগ্রহ দেখাল না। অবহেলার ভঙ্গি করে বলল—

গিয়েছে ভাল হয়েছে। আপদ বিদেয় হয়েছে। তুমি এখন এক কাজ কর তো মা, চিলেকোঠার ঘরটা আমাকে পরিষ্কার করে দাও।

লতিফা বিস্মিত হয়ে বললেন, এ ঘর দিয়ে তুই কি করবি?

ঃ ওখানে পড়াশোনা করব। ওটা হবে আমার রিডিংরুম। বেশ নিরিবিলি।

লতিফা আর কথা বাড়ালেন না। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করার কোন দরকার নেই। চাপা পড়ে থাকুক। চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল।

নীলু চিটাগাং গিয়েছিল দু'দিনের জন্যে। তাকে থাকতে হল ছ'দিন। অফিসের কাজকর্মে এমন এক জট তারা পাকিয়ে রেখেছে যা খোলার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ছত্রিশ লক্ষ টাকার হিসেবের গরমিল। একবার অডিট হওয়ার পর দ্বিতীয়বার অন্য একটা কোম্পানীকে দিয়ে অডিট করানো হল। তারা আবার সব ঠিকঠাক পেল। কোম্পানীর একটি মাইক্রবাস হরতালের দিন পুড়ে গেছে এমন রিপোর্ট আছে। আবার গোপন চিঠিও আছে যে বাসটি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। রং বদলে সেটা এখন চিটাগাং-নাজিরহাট লাইনে ট্রিপ দেয়। চিঠিতে চেসিস-এর নম্বর পর্যন্ত দেয়া।

অফিসে বিভিন্ন লোকদের ইন্টারভ্যু নেয়ার সময় মনে হয় কেউ সত্যি কথা বলছে না। এটাও বিশ্বাস্য নয়, এতগুলি লোকের সবাই মিথ্যা কথা বলবে কেন?

নীলু অস্থির হয়ে পড়ল। অফিসের এই ঝামেলা তার সহ্য হচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলা ডাকবাংলোয় ফিরে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে। চলে যাবে—সে উপায়ও নেই। তদন্তের দায়িত্ব অস্বীকার করার সাহস তার নেই।

রাতে তার ভাল ঘুম হয় না। একরাতে ভয়াবহ একটা স্বপ্ন দেখল— উলের কাঁটা নিয়ে টুনী খেলছে, হঠাৎ খোঁচা লাগল চোখে। রক্তারক্তি কাণ্ড। ডাক্তার এল এবং গম্ভীর মুখে বলল, একটা চোখে খোঁচা লাগলেও দুটি চোখই নষ্ট। তবে চিন্তার কিছু নেই, পাথরের চোখ লাগিয়ে দেব। আসল নকল কেউ বুঝতে পারবে না।

ঃ নীলু স্বপ্নের মধ্যেই চেঁচিয়ে বলল, এসব আপনি কি বলছেন?

ডাক্তার তার দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, পাথরের চোখ আপনার পছন্দ না হলে দু'টি মার্বেল বসিয়ে দিতে পারি। মার্বেলও খারাপ হবে না। অনেক রকমের রঙ আছে, আপনি নিজে পছন্দ করে নিতে পারেন।

ঘুম ভেঙ্গে গেল। নীলুর গা দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে, এ রকম কুৎসিত স্বপ্ন মানুষ দেখে? এরকম স্বপ্ন দেখার পরও কি কেউ বাসায় ফিরে না গিয়ে থাকতে পারে? নীলুকে থাকতে হল।

ঢাকায় যেদিন রওনা হল সেদিন তার মনে হল যেন কত দীর্ঘকাল বাইরে কাটিয়ে ফিরছে। ঢাকা পৌঁছেই দেখবে সব বদলে গেছে। সবাইকে অচেনা লাগবে। টুনী সম্ভবতঃ লজ্জা লজ্জা মুখে পর্দার আড়ালে থাকবে। লজ্জা ভাঙাতে সময় লাগবে। ইস, কতদিন যে সে মেয়েটাকে দেখে না!

কল্পনার সঙ্গে বাস্তব বোধ হয় কখনোই মিলে না। নীলু ঢাকায় পৌঁছল বিকেলে। কিছুই বদলায়নি। সব আগের মত আছে। টুনীর হাতে একটা চকবার আইসক্রীম। আইসক্রীমে তার

জামা মাখামাখি হয়ে গেছে। নীলু ভেবেছিল তাকে দেখেই টুনী ছুটে আসবে, তা হল না। ঠিক সেই মুহূর্তে টুনীব আইসক্রীমেব একটা বড় অংশ ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে. সে তাব ভাঙ্গা টুকরো সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ঃ কেমন আছ মা?

ঃ ভাল।

ঃ তুমি আজ আসবে আমরা জানতাম।

ঃ কি ভাবে জানতে?

ঃ আব্বু টেলিফোন কবেছিল।

ঃ তোমাদেব আর সব খবব কি ?

ঃ দাদীর একটা দাঁত পড়ে গেছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হুঁ, দাদীকে পেত্নীর মত লাগছে।

ঃ ছিঃ, এসব বলতে নেই।

ঃ বললে কি হয়?

ঃ আল্লাহ পাপ দেন। কাছে আস মা, আমাকে একটু আদর দাও।

ঃ উহুঁ, তোমাব গায়ে আইসক্রীমেব রস লেগে যাবে।

ঃ লাগুক। এসো আমাকে একটা চুমু দাও।

টুনী লজ্জিত মুখে মাকে চুমু খেয়ে ফিস ফিস করে বলল—-জান মা, বাবলু এখনো আসেনি।

ঃ সে কি? কেন?

ঃ কি জানি।

ঃ বাসার আর সব লোকজন কোথায়? মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া কেউ নেই।

ঃ বুয়া আছে। দাদা দাদীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে। আব্বু অফিসে। চাচাও অফিসে।

ঃ তোমাকে একা ফেলে গেছে?

ঃ একা কোথায়, বুয়া তো আছে।

নীলু গোসল করতে ঢুকলো। টুনীকে বলল, দবজার পাশে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে।

ঃ টুনী বলল, কেন মা?

ঃ নীলু হেসে বলল, অনেক দিন পর তোমাব সঙ্গে দেখা তো, তাই। তোমাব কথা শুনতে ভাল লাগছে।

ঃ আমি খুব সুন্দর করে কথা বলা শিখেছি, তাই না মা?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বাবলু কি আমার মত সুন্দর করে কথা বলতে পারে?

ঃ না। সে তো কথাই বলে না।

ঃ ছোট চাচী কি আর আসবে না মা?

ঃ নিশ্চয় আসবে।

ঃ বীণা খালার মা বলেছে, আর আসবে না।

ঃ তাই বলেছে বুঝি ?

ঃ হ্যাঁ।

গোসলের পানি কনকনে ঠাণ্ডা। তবু নীলু মাথায় মগের পর মগ ঠাণ্ডা পানি ঢালছে। বন্ধ দরজার ওপাশে টুনী দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষি সব কথা বলছে। বড় ভাল লাগছে শুনতে।

ঃ তুমি আমার কথা ভেবেছিলে টুনী?

ঃ হ্যাঁ ভেবেছি।

ঃ কেঁদেছিলে আমার জন্যে?

ঃ না।

ঃ কাঁদনি কেন?

ঃ আমি বড় হয়েছি যে তাই।

ঃ বড়রা বুঝি কাঁদে না?

ঃ না।

ঃ বড় বড় মেয়েরা যখন বিয়ে করে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন তো কাঁদে। কাঁদে না?

ঃ হ্যাঁ কাঁদে।

ঃ তুমি কাঁদবে না?

ঃ হ্যাঁ কাঁদব।

মনোয়ারা ফিরলেন সন্ধ্যা মিলাবার পর। নীলুকে দেখেও কিছু বললেন না। তাঁর মুখ গম্ভীর। রাগী রাগী চোখ। হোসেন সাহেবও কেমন যেন বিপর্যস্ত। নীলু বলল, ঝামেলায় এত দেরী হল মা। আপনারা ভাল ছিলেন তো?

তিনি জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। হোসেন সাহেব বললেন, আজ আর তোমার শাশুড়ীকে কিছু জিজ্ঞেস করো না মা, জবাব পাবে না।

নীলু বিস্মিত হয়ে তাকাল। হোসেন সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার শাশুড়ীর সামনের দুটা দাঁত ডাক্তার ফেলে দিয়েছেন। আগে পড়েছে একটা। বিশ্রী দেখাচ্ছে। তাকানো যাচ্ছে না।

হোসেন সাহেবের মুখ করুণ হয়ে গেল। যেন তাঁর নিজেরই সামনের দু'টি দাঁত নেই।

ঃ মেয়েদের সৌন্দর্যই হচ্ছে দাঁত, বুঝলে মা?

ঃ বাঁধিয়ে নিলেই হবে বাবা।

ঃ বাঁধানো দাঁত কি আগের মত হয়? তুমি ভাল ছিলে তো মা?

ঃ জ্বি ভালই ছিলাম।

ঃ তুমি দূরে থেকে বেঁচে গেছ, তোমার শাশুড়ী দাঁতের যন্ত্রণায় চিৎকার চেঁচামেচি করে সবার মাথা খারাপ করিয়ে দিয়েছে।

সফিক এবং রফিক দু'জন একই সঙ্গে এল। রাত এগারোটায়। নীলুর চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে, তবু সে জেগে আছে। মনোয়ারাও জেগে। ডেনটিস্ট যে তাঁকে কি পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে এটা তিনি চতুর্থবারের মত বলছেন।

ঃ ব্যাটা গর্দভ কিছুই জানে না। আমার মনে হয় নকল করে পাশ করেছে। অবশ না করেই

দাঁত তুলে ফেলেছে।

ঃ বলেন কি মা!

ঃ মহা হারামজাদা। উল্টা আমাকে ধমক দেয়।

ঃ সে কি।

ঃ হ্যাঁ। বলে কি, আপনি শুধু শুধু এত হৈচৈ করছেন কেন?

ঃ খুব অন্যায়।

ঃ ইচ্ছা করছিল ছোকরাব কানটা টেনে ছিঁড়ে দেই।

ঃ আপনি শুয়ে পড়ুন মা। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।

মনোযারা ঘুমুতে যেতে রাজি নন। তিনি আজকেব ভযাবহ অভিজ্ঞতাব কথা তাঁর দুই ছেলেকে না শুনিযে ঘুমুতে যেতে রাজি নন, সেই সুযোগ তাঁর হল না। রফিক ঘরে ঢুকেই বলল, বাহ মা, তোমাকে তো সুন্দর লাগছে। কেমন যেন ড্রাকুলাব মত দেখাচ্ছে।

মনোয়ারা কিছুক্ষণ অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিজেব ঘবে ঢুকে দবজা বন্ধ কবে দিলেন। বফিক বলল, ভাবী, তাড়াতাড়ি ভাত দাও। ক্ষিধে লেগেছে।

ঃ এত দিন পর এলাম, প্রথম কথাটাই এই? কেমন ছিলাম —কিন্তু জিজ্ঞেস কব! সাধারণ ভদ্রতাটা দেখাও।

ঃ কেমন ছিলে ভাবী?

প্রশ্ন করে রফিক উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। বাথরুমে ঢুকে গেল।

বাতে ঘুমুতে যাবার আগে সফিক তার অভ্যাসমত এককাপ চা খেতে চাইল, বলল, তোমার যাবার দরকার নেই, কাজেব মেয়েটাকে বল, ও দেবে।

ঃ আমিই বানিয়ে আনি!

নীলু রাতে শোবার আগে কখনো চা খায় না। আজ সে নিজের জন্যেও এক কাপ বানাল। সফিককে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

ঃ রাগ করব কেন?

ঃ দু'দিনের কথা বলে ছ'দিন কাটিয়ে এলাম এই জন্যে?

ঃ প্রয়োজন হয়েছে থেকেছ, এই নিয়ে রাগ কবব কেন? তোমাব কথা শুনে মনে হয়, আমার স্বভাব হচ্ছে অকারণে রাগ করা। আমি কি সে রকম?

ঃ না।

সফিক হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, একবার ভাবছিলাম তোমাকে কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ টুনীকে নিয়ে চিটাগাং উপস্থিত হব। দেখব তুমি কি কব?

ঃ এলে না কেন? তোমবা এলে আমার কতো ভাল লাগতো।

বলতে বলতে কি যে হল, নীলু ঝড় ঝড় করে কেঁদে ফেলল। সফিক অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার?

কি যে ব্যাপার তা কি নীলু নিজেও জানে? আমরা আমাদের কতটুকুই বা জানি?

সফিক আবার বলল, কি হয়েছে নীলু? তার গলার স্বর আশ্চর্য কোমল শোনাল। নীলু বলল, কিছু হয়নি, এসো ঘুমুতে যাই।

বিছানার মাঝামাঝি টুনী শুয়ে আছে। নীলু নিজেই তাকে একপাশে সরিয়ে দিল। সফিক

দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল টুনীর বাঁ চোখের নীচে ছোট একটা কালো বিন্দু উঁচু হয়ে আছে। নীলু বলল, ওর এখানে কি হয়েছে?

ঃ উলের কাঁটা দিয়ে খোঁচা লাগিয়েছে। আরেকটু হলে চোখে লাগত।

নীলুর গা দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। সে তার মেয়ের কপালে হাত রাখল। গা কেমন যেন গরম গরম লাগছে। নীলু বলল, দেখ তো, ওর শরীরটা কি গরম?

সফিক গা করল না। সহজ স্বরে বলল, এই ঠাণ্ডায় পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে ঘুরে জ্বরজারি হয়েছে আর কি। বাচ্চাদের মাঝে মাঝে অসুখ বিসুখ হওয়া ভাল, এতে শরীরে এন্টি বডি হয়।

ঃ কে বলেছে তোমাকে ?

ঃ কেউ বলেনি। কোথায় যেন পড়েছি।

ঃ এসো ঘুমুতে এসো।

নীলু আবার মেয়ের কপালে হাত রাখল। গা গরম। নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাচ্চাদের জ্বরজারি সব সময়ই হয়। কতবার এমন হয়েছে কিন্তু আজ নীলুর এ রকম লাগছে কেন?

শারমিন বিকেলে বাগানে হাঁটছিল।

তার গায়ে আকাশী রঙের একটা চাদর। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে বলে চোখ মুখ ফোলা ফোলা। তার দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস নেই। আজ কেন জানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠলে মন কেমন করে। অজানা এক ধরণের কষ্ট হয়। কেন হয় কে জানে।

সে হাঁটতে হাঁটতে কুল গাছের নীচে এসে দাঁড়াল। পেকে সব টস টস করছে। খাওয়ার মানুষ নেই।

ঃ আপা, বরই পেড়ে দেই খান।

ঃ না। তোমার নাম কি ?

ঃ আমার নাম কুদ্দুস।

এই ছেলেটিকে সে আগে দেখেনি। সতেরো আঠারো বছর বয়স। দেখলে মনে হয় কলেজ টলেজে পড়ে। ঝকঝকে পরিষ্কার দাঁত। টুথপেস্টের সুন্দর একটা বিজ্ঞাপন হয় একে দিয়ে।

ঃ কুদ্দুস, তুমি আমাকে চা খাওয়াতে পারবে?

ঃ এক্ষুণি আনছি আপা। বড় সাহেবের সঙ্গে চা খাবেন না?

ঃ বাবা কি বাসায় নাকি ?

ঃ জ্বি। দোতলার বারান্দায়।

ঃ না, আমি বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাব। তুমি এখানে নিয়ে এসো।

ঃ চেয়ার দেই আপা?

ঃ চেয়ার দিতে হবে না। হাঁটতে ভাল লাগছে।

ছেলেটি প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে গেল। নতুন যারা আসে প্রথম দিকে তাদেব কাজেব উৎসাহের কোন সীমা থাকে না। কিছুদিন পাব হলে উৎসাহে ভাটা পরে। তখন আব ডাকাডাকি করেও পাওয়া যায় না। অবশ্যি এবার সবাই তার দিকে একটু বেশী নজর দিচ্ছে, কেউ না কেউ পাশে আছেই। এত যত্ন না করলেই সে ভাল থাকতো। নিজের মত থাকতে ইচ্ছে করে, নিজের মত থাকা সম্ভব হয় না।

মালী খুনতি দিয়ে মাটি ঠিক কবছিল। খুনতি বেখে সে শারমিনের দিকে আসছে। সেও এখন দীর্ঘ সময় ধবে নানান কথা বলবে। অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কথা।

ঃ গোলাপের গাছের কি অবস্থা হইছে দেখছেন আপা?

ঃ না, দেখিনি। কি অবস্থা?

ঃ ছোট ফুল। একদিনের বেশী থাকে না।

ঃ এরকম হল কেন?

ঃ সেইটাই তো আফা বুঝি না। সাব দেই, পোকা-মারা অষুধ দেই।

শারমিন চুপ কবে বইল। মালী খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে বলল, মানুষজন বাগানে না আসলে ফুল হয় না আফা।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জ্বি আফা। মানুষেব মায়া মুহব্বত গাছ পছন্দ কবে। যে বাড়িতে দেখবেন মানুষজন নাই সেই বাড়িতে ফুলও নাই।

ঃ বেশ মজা তো।

ঃ অখন আপনি আইছেন, দেখেন কেমুন ফুল ফোটে।

ঃ ঠিক আছে, দেখব।

ঃ কয়দিন থাকবেন আফা?

শারমিন জবাব দিল না। সে ক'দিন থাকবে এটা নিয়ে সবাই বেশ উদ্বিগ্ন। সরাসবি কিংবা একটু বাঁকা পথে। এ বাড়ির সবাই কিছু একটা সন্দেহ করছে। সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। এ বাড়িতে সে একা এসেছে। রফিক তার সঙ্গে আসে নি। প্রায় ন'দিন হয়ে গেল, এর মধ্যে একবার দেখা করতেও আসে নি।

রহমান সাহেব ডাইনিং টেবিলে বফিকের প্রসঙ্গ একবাব তুলেছিলেন। শারমিন কোন আগ্রহ দেখায় নি। ঠাণ্ডাস্বরে বলেছে—কাজ টাজ নিয়ে থাকে, তাই আসে না।

রহমান সাহেব বললেন, এমন কোন কাজ তো থাকার কথা নয়।

শারমিন বলল, তাহলে হয়ত এ বাড়িতে আসতে লজ্জা পায়।

ঃ এ বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে লজ্জা নেই, এ বাড়িতে আসতে লজ্জা? অন্য কোন ব্যাপার কি আছে?

ঃ তা আমি কি করে জানব বাবা? আমি আমার নিজেব কথা বলতে পারি, ওর কথা কি করে বলব?

ঃ তোর কথাই না হয় শুনি।

শারমিন ছাড়া সবাই যাচ্ছে। শাহানা এবং তার বরও যাচ্ছে। শাহানার যাবার ইচ্ছা ছিল না, যাচ্ছে জহীরের কারণে। জহীর কেন জানি যাবার জন্যে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। অবশ্যি শেষ সময়ে এই দু'জনও বাদ পড়ল। ট্রেন রাত ন'টায়। জহীর সন্ধ্যাবেলা এসে বলল, একটা সমস্যা হয়েছে ভাবী। নীলু হেসে ফেলল। জহীর বলল, বানানো সমস্যা নয়, সত্যি সমস্যা।

ঃ তোমরা তাহলে যেতে পারছ না ?

ঃ না।

ঃ সমস্যাটা কি ?

জহীর ইতস্ততঃ করে বলল, চলুন ভাবী ছাদে যাই, সেখানে বলব।

ঃ বলতে না চাইলে বলার দরকার নেই।

ঃ ভাবী, আমি আপনাকে বলতে চাই। বলা দরকার।

নীলু চিন্তিত মুখে ছাদে উঠে গেল। নির্ঘাত শাহানা খুব ঝামেলা বাঁধিয়েছে। সেই ঝামেলার প্রকৃতিটি কি কে জানে। নিশ্চয়ই জটিল কিছু। নয়ত জহীর এতটা অস্থির হত না। সে সহজে অস্থির হবার ছেলে নয়।

ঃ কি ব্যাপার বল?

বুঝতেই পারছেন শাহানাকে নিয়ে একটা সমস্যা। আজ ভোরবেলায় নাস্তা খাবার সময় সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হল, তার পরপরই সে ছুটে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সেই বন্ধ দরজা এখানো খুলেনি। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা বলতে পারেন। মানে এই জাতীয় অবস্থায় পড়া আমার অভ্যাস নেই। খুব বিব্রত বোধ করছি।

ঃ কথাকাটাকাটি কি নিয়ে হচ্ছিল?

ঃ আনিস সাহেবকে নিয়ে। ও বলল, আনিস সাহেবকে একদিন দাওয়াত করে খাওয়াতে চায়। আমি বললাম— খুব ভাল কথা। উনাকে এবং উনার স্ত্রীকে বল। তাতেই ও রেগে আগুন।

ঃ আমি বুঝলাম না, তাতে রেগে আগুন হবার কি ?

ঃ আমিও বুঝিতে পারিনি। শাহানা বলেছিল—তুমি এখানে তার স্ত্রীর কথা কেন বললে? তোমার কি ধারণা আমি শুধু তাকে একা খেতে বলব? তা যদি চাইতাম, তাহলে তো অনেক আগেই বলতে পারতাম। তা তো বলিনি। বিশ্রী ব্যাপার ভাবী। কাজের লোকদের সামনে হৈ চৈ চিৎকার। প্রায় হিষ্টিরিয়ার মত অবস্থা।

ঃ শাহানার কথা শুনে তুমি কি বললে?

ঃ আমি কিছু বলিনি। যা বলার মনে মনে বলেছি। লোকজনের সামনে সীন ক্রিয়েট করতে চাইনি।

ঃ চল তোমার সঙ্গে যাই, ওকে নিয়ে আসি।

ঃ বাদ দিন ভাবী। আপনারা ঘুরে আসুন। নীলগঞ্জ গিয়ে আরো ঝামেলা করবে। আপনাদের আনন্দই মাটি করবে।

ঃ আমি সব ঠিক করে দেব।

ঃ কোন দরকার নেই ভাবী। এই ব্যাপারটা আমিই ঠিক করতে চাই। বিশ্বাস করুন আমি ভালমতই করব।

ঃ ও খুবই ছেলেমানুষ জহীর। ওর বয়সটা দেখ।

ঃ আমি জানি। চলুন নীচে যাই। আপনাদের অনেক গোছগাছ বাকি। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি, আপনাদের ট্রেনে তুলে দেবে।

শারমিন না যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মনোয়ারা নতুন করে কথা তুললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে গত ক'দিন ধরেই তিনি চেঁচামেচি করছেন। রফিকের সঙ্গে একদিন তুমুল ঝগড়া হল। শারমিন এ বাড়িতে আসছে না কেন এর জবাবে রফিক বিরক্ত হয়ে বলেছে— আমি কি করে বলব? সেটা শারমিনকে জিজ্ঞেস কর। ওটা তার ব্যাপার। হয়ত এ বাড়ি তার ভাল লাগছে না।

ঃ এ বাড়ি ভাল লাগবে না কেন?

ঃ খুব সম্ভব তোমার জন্যেই লাগে না। দিনরাত কঁ্যাচ কঁ্যাচ কর।

ঃ দিনরাত কঁ্যাচ কঁ্যাচ করি?

রফিক এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেটে পড়ল। মনোয়ারা সারাদিন হৈচৈ করে কাটালেন।

আজ আবার শুরু হল। নীলু টিফিন কেরিয়ারে খাবার দাবার ভর্তি করছিল, মনোয়ারা তাকে ধরলেন— বৌমা, হচ্ছেটা কি ? নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, কিসের কথা বলছেন?

ঃ ছোট বৌমা এ বাড়িতে আসে না কেন?

নীলু বলল, অনেকদিন পরে বাবার বাড়ি গিয়েছে, ক'টা দিন থাকছে থাকুক না। নীলগঞ্জ থেকে ফিরে এসে আমি ওকে এ বাড়িতে নিয়ে আসব। এখন নিজের বাড়িতেই থাকুক।

ঃ নিজের বাড়ি—তুমি কি বলছ? বিয়ের পর মেয়েদের বাড়ি থাকে একটাই। সেটা হচ্ছে স্বামীর বাড়ি।

ঃ আপনাদের সময় তাই ভাবা হত, এখন দিনকাল পাল্টেছে।

ঃ কি করম পাল্টেছে? এখন বুঝি আর স্ত্রীরা স্বামীদের বাড়িতে থাকে না? তাহলে তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?

নীলু কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, আপনার কি সব গোছগাছ হয়েছে মা?

ঃ গোছগাছ আর কি করব? আমার হল গিয়ে মাথার গায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। সংসারে কি শুরু হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না।

রাত আটটায় স্টেশনের দিকে রওনা হবার কথা। হোসেন সাহেবের দেখা নেই। শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে, দু'টি খুবই প্রয়োজনীয় অষুধ তাঁব সঙ্গে নেই— একটি হচ্ছে নাক্সভুমিকা অন্যটি পালসেটিলা। গ্রামে যাচ্ছেন, দরকারের সময় হাতের কাছে অষুধ পাওয়া যাবে না, বিপদে পড়তে হবে। তিনি কাউকে কিছু না বলে অষুধের খোঁজে গেলেন।

ফিরলেন রাত আটটায় যখন সবাই প্রায় নিশ্চিত, যাওয়া হবে না। স্টেশনে রওনা হবার সময়ও কেউ জানে না ট্রেন ধরা যাবে কি যাবে না। ট্রেন অবশ্যি ধরা গেল। এবং ট্রেন ছেড়ে দেবার পর জানা গেল তাড়াহুড়ায় মনোয়ারার স্যুটকেসটাই আনা হয়নি। তিনি মুখ হাঁড়ির মত করে নীলুকে বললেন, আমার জিনিসের দিকে কেউ কি আর লক্ষ্য রেখেছে? তা রাখবে কেন? আমি কি একটা মানুষ?

ট্রেনে উঠার উত্তেজনা, নতুন জায়গায় যাওয়ার আনন্দে টুনীর জ্বর এসে গেল। হোসেন সাহেব তাকে এক ফোঁটা পালসেটিলা টু হানড্রেড খাইয়ে হাসিমুখে সফিককে বললেন— অষুধটা সঙ্গে না থাকলে কি অবস্থা হত চিন্তা করেছিস? তোরা হৈ চৈ করিস, কিছু বুঝিস না।

টুনীর জ্বর এসে যাওয়ায় তাঁকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হল।

কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম। রজনী নিঝুম। ট্রেন ছুটে চলেছে। গফরগাঁয়ে অনেকক্ষণ লেট করেছে, সেটা বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে চায়। নীলু ছাড়া বাকি সবাই ঘুমিয়ে। নীলুর ঘুম আসছে না। শীতের দিন, জানালার কাঁচ উঠানো যাচ্ছে না। তার খুব ইচ্ছে করছে কাঁচ উঠিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে। অন্ধকার গ্রামের উপর হালকা জোছনা। কে জানে আজ হয়ত জোছনা হয়নি। গাঢ় আঁধারে চারদিক ঢাকা। মাঝে মাঝে দূরে বহু দূরে কুপী জ্বলছে। কোন জায়গায় লক্ষ লক্ষ জোনাকী একসঙ্গে জ্বলছে আর নিভছে। বন্ধ ট্রেনের কামরা থেকে এসব দৃশ্যের কিছুই দেখার উপায় নেই। নীলু মেয়ের কপালে হাত রাখল। জ্বর মনে হয় আরো বেড়েছে। সে তার উপর কম্বলটা ভালমত টেনে দিল। মাথা কাত হয়ে ছিল, সোজা করে দিল।

সফিক বলল, ফ্লাস্কে কি চা আছে নীলু?

ঃ আছে। তুমি ঘুমাও নি?

ঃ উহুঁ, চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিলাম। গাড়িতে ঘুম আসে না।

সফিক উঠে নীলুর পাশে বসল। নীলু কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, মেয়েটা দু'দিন পর পর জ্বরে ভোগে, ওকে একজন ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার।

ঃ ঢাকায় ফিরেই একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আমাকে মনে করিয়ে দিও।

নীলু বলল, জানালাটা একটু খুলে দেব? বাইরের দৃশ্য দেখব।

ঃ ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকবে।

ঃ অল্প একটু খোল।

সফিক পুরোটাই খুলে দিল। আকাশে চাঁদ নেই তবু নক্ষত্রের আলোয় আবছা ভাবে সব কিছু চোখে পড়ে। নদীর পানি ঝিকমিক করে জ্বলে। খোলা মাঠ থেকে চাপা আলো বিচ্ছুরিত হয়। কি অদ্ভুত লাগে দেখতে। এইসব দৃশ্য যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। এদের হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়।

তারা চারদিন কাটাল নীলগঞ্জে।

টুনীর আনন্দের সীমা নেই। এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে ঘরে পাওয়া যায় না। বাবলুর সঙ্গে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরছে। বাবলুও আগের মত নেই, তার মুখে কথা ফুটেছে। এই ক'দিনেই গ্রামের কথা বলার টান তার গলায় চলে এসেছে। টুনীকে এই ব্যাপারটি খুব অবাক করেছে। সেই টেনে টেনে কথা বলার চেষ্টা করছে, মনোয়ারা যা একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। তিনি টুনীকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেন, পারেন না। তাঁর সবচে বড় ভয় কখন এই মেয়ে হুট করে পানিতে নেমে যায়। চোখে চোখে রেখেও কোন লাভ হয় না। সুযোগ পেলেই পানিতে নেমে পড়ে। টুনী পানীতে নেমেছে এই খবর শুনলেই তিনি বিশ্রী রকমের হৈ চৈ শুরু করেন। নীলুকে বলেন, তুমি হচ্ছ মা, তোমার গায়ে লাগে না? চুপচাপ

আছ? মেয়েটাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ।

ঃ ওর কিছু হবে না মা। ওর সঙ্গে সব সময় একদল ছেলেপুলে থাকে, ওরা দেখবে। গ্রামের ছেলেমেয়ে—ওরা হল পানির পোকা।

কথা সত্যি, টুনীর সঙ্গে থাকে বিরাট এক বাহিনী।

শওকত একদিন এক মহিষ ধরে আনল। বিশাল মহিষ। টকটক রক্তবর্ণ চোখ, বাঁকানো শিং। মনোয়ারা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন— কি সর্বনাশ! এই আজরাইল উঠানে কেন?

শওকত হাসি মুখে বলল— বড় ঠাণ্ডা জানোয়ার, টুনীর জন্যেই আনলাম।

ঃ কি বলছ তুমি? টুনী এটা দিয়ে কি করবে?

ঃ উপরে বসবে।

ঃ পাগল নাকি ?

ঃ খুব ঠাণ্ডা জানোয়ার।

ঃ বের হও। এক্ষুণি! এটা নিয়ে বিদেয় হও। পাগলের কারবার! বলে কি ঠাণ্ডা জানোয়ার।

শওকত মহিষ নিয়ে বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই মনোয়ারা আতংকিত হয়ে লক্ষ্য করলেন টুনী সেই মহিষের পিঠে। মহিষ গদাই লস্করি চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পেছনে একদল ছেলেপুলে। নীলু মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছে। সে বলল, একটা ক্যামেরা থাকলে ভাল হত। ছবি তুলে রাখা যেত। সুন্দর লাগছে না মা?

মনোয়ারা চেঁচিয়ে উঠলেন, এর মধ্যে তুমি সুন্দর কি দেখলে? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? এক্ষুণি ঝাড়া গিয়ে গা থেকে ফেলে দিবে।

নীলুকে তেমন উদ্বিগ্ন মনে হল না। হোসেন সাহেব এই দৃশ্যে খুব মজা পেলেন। মহিষের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলেন।

সফিক খুব আগ্রহ নিয়ে সুখী নীলগঞ্জের কর্মকাণ্ড ঘুরে ঘুরে দেখল। এতটা সে আশাই করে নি। এতদিন সে এটাকে একজন বুড়ো মানুষের শখের ব্যাপার বলেই ধরে নিয়েছিল, এখন কাণ্ডকারখানা দেখে হকচকিয়ে গেছে। লাইব্রেরী ঘরে রাজ্যের বই। এত বই শহরের কোন লাইব্রেরীতেও নেই। দু'টো পত্রিকা আসে এই গণ্ডগ্রামে। সফিক অবাক হয়ে বলল, কে পড়ে এই পত্রিকা? আপনি পড়েন সেটা বুঝতে পারি, আর কে পড়ে ?

ঃ ডাক্তারবাবু পড়েন—হরিনারায়ণবাবু।

ঃ ডাক্তার আছে নাকি ?

ঃ ডাক্তার ঠিক না। সরকারী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার ছিলেন, এখন রিটায়ার করে এই গ্রামে আছেন।

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ গ্রামের লোকজনও কেউ কেউ পত্রিকা নাড়াচাড়া করে। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা একজন পত্রিকা পড়ে শুনায়। অনেকেই শুনতে আসে।

ঃ বলেন কি ?

ঃ কবির মামা যে কাজ শুরু করেছিলেন তার সুফল দিতে শুরু করেছে।

ঃ কি রকম সুফল?

সোবাহান হাসতে হাসতে বলল, নীলগঞ্জের মেয়েদের বিয়ের বাজারে খুব কাটতি।

আশেপাশের গ্রামের সবাই মনে করে নীলগঞ্জের মেয়ে মানে আদব কায়দার মেয়ে। এখানকার কোন মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেয়া হয় না।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ হ্যাঁ, কবির মামার নিষেধ ছিল। যৌতুক দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয়া হবে না। কবির মামার জীবদ্দশায় এটা মানা হত না, এখন মানা হয়।

ঃ আমার তো ভাই রূপকথার মত লাগছে।

ঃ আসলেই রূপকথা। বেশীর ভাগই হয়েছে উনার মৃত্যুর পরে। যেমন গ্রামের ভেতরের রাস্তাগুলি। কেউ নিজের জায়গা এক ইঞ্চি ছাড়তে রাজি নয়। মামা অনেক চেষ্টা করেছিলেন— লাভ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের দিন সবাই ঠিক করল, কবির মাষ্টার যে সব রাস্তা চেয়েছিলেন—সেগুলি করে দেয়া হবে। করাও হল তাই। লোকটি যখন বেঁচে ছিল তার মর্ম কেউ বোঝেনি।

ঃ আপনি কি উনার বাকী কাজ শেষ করতে নেমেছেন?

ঃ হ্যাঁ তাই।

ঃ কি মনে হয়, পারবেন?

ঃ হয়ত পারব। খুবই কঠিন কাজ। দীর্ঘদিনের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধকার চট করে এগুলি যায় না। সময় লাগে। আমিও হয়ত পারব না, অন্য একজন আসবে। এটা হচ্ছে একটা চেইন রিএকশন। শুরুটাই মুশকিল। একবার শুরু হলে চলতে থাকে।

ঃ ঠিক বলেছেন। শুরুটাই ডিফিকাল্ট।

ঃ গ্রামের লোকদের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে আমি খানিকটা প্রতারণাও করছি। তাও কাজে লাগছে।

ঃ আপনার কথা বুঝতে পরলাম না। কি ধরণের প্রতারণা?

ঃ নামাজ পড়ছি নিয়মিত। যদিও ধর্ম, বিধাতাপুরুষ এসব জিনিসে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু যেহেতু ধর্মপ্রাণ মানুষদের জন্যে গ্রামের লোকদের খুব মমতা, আমি তার সুযোগ নিচ্ছি।

সফিক হেসে ফেলে বলল, কে জানে একদিন হয়ত দেখা যাবে ভান করতে করতে আপনি ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। বেরুতে পারছেন না। বিরাট বুজুর্গ ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ঃ হতে পারে। পৃথিবী বড়ই রহস্যময়। রহস্যের কোন শেষ নেই।

ঢাকায় ফেরার আগের রাতে পিঠা বানানোর উৎসব হল। সেই উৎসবে গ্রামের মেয়েরা দলবেঁধে যোগ দিল। টুনী এক ফাঁকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে সবাইকে দাওয়াত করে এসেছে। উঠোনে খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনে তৈরী হচ্ছে পোড়া-পিঠা। বিশাল আকৃতির কদাকার পিঠা। আগুনে পোড়ার পর পাথরের মত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন তা কেটে দুধে জ্বাল দিয়ে খাওয়া। শওকত কোথা থেকে এক গায়ক ধরে এনেছে। সে একটু দূরে তার একতারা নিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে পুরুষদের একটা দল। গায়কের নাম কেরামত মিয়া। তার গলায় সুর তেমন নেই। সুরের অভাব সে পূরণ করেছে আবেগে। একটি চরণে টান দেবার পরই তার চোখ ছলছল করতে থাকে। তৃতীয় চরণে যাবার আগেই চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ে। গায়ক কেরামত মওলা গান ধরে—

"নিমের পাতা তিতা তিতা
জামের পাতা নীল,
কোথায় আমার প্রাণের মিতা
কোথায় বন কোকিল?"

সবাই স্তব্ধ হয়ে গান শুনে। পুরনো সব দুঃখ হৃদয়ের অতল গহ্বর থেকে ভেসে উঠে। বড়ই মন খারাপ করে সবাই। তবু ভাল লাগে। হৃদয়ের গহীনে চাপা পড়ে থাকা দুঃখগুলি মাঝে মাঝে দেখতে আমরা ভালবাসি। সেই সুযোগ বড় একটা হয় না। কেরামত মওলার মত গ্রাম্য গায়করা কখনো কখনো তা পারেন। তাঁদের সাহায্য করে প্রকৃতি।

উঠোনে আগুন জ্বলছে। তাকে ঘিরে বসে আছে বৌ-ঝিরা। আকাশে ছোট্ট একটা চাঁদ। তার হিম হিম আলো পড়েছে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে। শীতল কনকনে হাওয়া বইছে। দুঃখ জাগানীয়া পরিবেশ তো একেই বলে।

নীলুরা ঢাকায় পৌঁছাল সোমবার ভোরে। নীলুর ইচ্ছা ছিল সোমবারে অফিস ধরা। তা করা গেল না। ন'টা বাজতেই জহীর এসে উপস্থিত। জহীর বলল, আমার সঙ্গে একটু আসতে হবে ভাবী। দশ মিনিটের জন্য। আমি আপনাকে অফিসে পৌঁছে দেব।

ঃ ব্যাপার কি বল তো?

ঃ তেমন কিছু না। আবার কিছুটা আছেও। ভাবী একটু চলুন আমার সঙ্গে।

ঃ বেশ চল। আমি কাপড় বদলে নেই। তোমরা ভাল ছিলে তো?

জহীর শুকনো গলায় বলল, ভালই ছিলাম। টুনী কোথায় ভাবী?

ঃ ওর বাবার সঙ্গে গিয়েছে। ওর শরীরটা ভাল না— জ্বর। যাবার সময়ও জ্বর নিয়ে গিয়েছে। ফেরার পথেও জ্বর নিয়ে ফিরল।

জামাইয়ের খোঁজ পেয়ে হোসেন সাহেব বেরিয়ে এলেন। নীলগঞ্জের বিস্তারিত গল্প জুড়ে দিলেন।

ঃ রাস্তাঘাট চেনা যায় না। বড় একটা রাস্তা করে ইট বিছিয়ে দিয়েছে। রিকশা চলে। ইচ্ছা করলে তুমি গাড়ি নিয়েও যেতে পারবে। এইটুকু গ্রামে চারটা টিউবওয়েল। দাতব্য চিকিৎসালয় একটা করেছে, অষুধপত্র অবশ্যি তেমন নেই। আসলে দরকার ছিল একটা হোমিও হাসপাতাল। অষুধ সস্তা, ইচ্ছা করলে বিনামূল্যে দেয়া যায়। তাই না?

জহীর বিরস মুখে হ্যাঁ হুঁ দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে সে কিছুই শুনছে না। তার মন অন্য কোথাও। হোসেন সাহেব অবশ্যি বুঝতে পারছেন না। তিনি উৎসাহের সঙ্গে একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছেন। নীলু কাপড় বদলে তৈরী হয়ে এসেছে, তখনো তাঁর গল্প থামেনি। নীলুকে বললেন, পাঁচটা মিনিট দেরী কর না। জহীরের সঙ্গে একটা দরকারী কথা বলছি। তুমি বরং এরমধ্যে আমাদের জন্যে চট করে চা বানিয়ে আন। আমারটায়

চিনি কম।

নীলু চা আনতে গেল। হোসেন সাহেব শুরু করলেন মহিষের গল্প।

ঃ মহিষ দেখেছ নাকি জহীর?

ঃ দেখব না কেন?

ঃ আরে না, ঐ দেখার কথা বলছি না। কাছ থেকে দেখা। প্রাণী হিসেবে মহিষ অসাধারণ। বড় ঠাণ্ডা প্রাণী। দেখতেই বিশাল কিন্তু এর মনটা শিশুদের মত।

ঃ তাই বুঝি ?

ঃ আমি অবাক হয়েছি। এই টুনী পর্বতের মত এক মহিষের পিঠে বসে থাকত। সে দিব্যি বসে আছে আর মহিষ নিজের মনে হেলে দুলে ঘাস খাচ্ছে।

ঃ বাহ্ চমৎকার তো।

ঃ জিনিসটা নিয়ে আমি ট্রেনে আসতে আসতে অনেক চিন্তা করলাম। আমার ধারণা মহিষকে যদি ঠিকমত ট্রেনিং দেয়া যেত তাহলে ঘোড়ার মত একে ব্যবহার করা যেত। এই জিনিসটা কারোর মাথায় খেলেনি। তুমি কি বল?

ঃ হতে পারে।

ঃ মহিষের পিঠে বসাও খুব আরামের। পিঠ অনেক চওড়া। জীন ব্যবহার করার দরকার হত না।

শেষ পর্যন্ত জহীর বলতে বাধ্য হল, আমি পরে এসে বাকিটা শুনব। আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

ঃ সন্ধ্যাবেলা চলে এসো। শাহানাকে নিয়ে এসো, অনেক গল্প বাকী রয়ে গেছে।

ঃ আচ্ছা দেখি।

ঃ দেখাদেখির কিছু না— নিয়ে আসবে। রাতে আমাদেব সঙ্গে খাবে। মনে থাকে যেন।

ঃ জ্বি মনে থাকবে।

ঃ আসল গল্পগুলিও বলা হয়নি।

জহীরের কথা শুনে নীলু আকাশ থেকে পড়ল। তার মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না। সে বহু কষ্টে বলল, এসব তুমি কি বলছ?

ঃ যা ঘটেছে তাই বললাম।

ঃ আমাদের খবর দিলে না কেন?

ঃ আপনারা আনন্দ করতে গিয়েছেন, এর মধ্যে হঠাৎ ... তবু খবর নিশ্চয়ই দিতাম, দেখলাম খবর না দিয়ে যদি পারা যায়।

ঃ শাহানা এখন আছে কেমন?

ঃ এখন ভাল।

ঃ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে?

ঃ হ্যাঁ। গতকাল সন্ধ্যায় বাসায় এনেছি।

কথা হচ্ছিল জহীরদের বাড়ির একতলায়। নীলু বলল, তুমি আবার গোড়া থেকে বল কি হয়েছে।

ঃ আপনারা যেদিন নীলগঞ্জ গেলেন ঐদিনই ঘটনা ঘটল। সারাদিন দরজা বন্ধ করে ছিল। রাত দশটার সময় কাজের মেয়েটা বলল— সে নাকি ধপ করে কি পড়ার শব্দ শুনেছে। আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম। তখনো বুঝতে পারিনি ঘুমের অষুধ খেয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন। যমে-মানুষে টানাটানি কাকে বলে এই প্রথম দেখলাম। ডাক্তারদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে ভাবী। ওরা অসাধ্য সাধন করেছে।

নীলু উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, আমি শাহানার কাছে যাচ্ছি।

জহীর বলল, আমিও কি আসব?

ঃ না, তোমাব আসার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাক।

ঃ কড়া কথা কিছু বলবেন না ভাবী, মনের যা অবস্থা।

ঃ আমি সেটা দেখব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

শাহানা নীলুকে দেখে হাসিমুখে বলল, কবে ফিরলে ভাবী?

ঃ আজই ফিরলাম। তুমি আছ কেমন?

ঃ এই আছি। আমার কাছে থাকা না থাকা সমান।

ঃ তোমার কোন লজ্জা লাগছে না?

ঃ লজ্জা লাগবে কেন?

ঃ ভবিষ্যতে যদি মরার চেষ্টা কর, এমনভাবে করবে যেন বেঁচে ফিরে আসতে না হয়।

ঃ কি বলছ তুমি ভাবী?

খবরদার, আমাকে ভাবী বলবে না। ফাজিল মেয়ে।

শাহানা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। নীলুর এই উগ্রমূর্তি সে কখনো দেখেনি। নীলু রুদ্ধ গলায় বলতে লাগল, এতটুকু মেয়ে ছিলে। চোখের সামনে বড় হয়েছ। কত আদর কত মমতা। আর এই মেয়ে এমন করে? তোমার মরাই উচিত। তুমি উঠে আস—দোতলা থেকে আমার সামনে নীচে লাফিয়ে পড়। এসো বলছি।

এই বলেই সে সত্যি সত্যি শাহানার হাত ধরে খাট থেকে নামাল।

শাহানা কিছু বোঝার আগেই নীলু গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। শাহানা কাত হয়ে খাটে পড়ে গেল। সে চোখ বড় বড় করে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। তার ফর্সা গালে আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে। যেন রক্ত জমে গিয়েছে। নীলু কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো তার দিকে, তারপর একটি কথা না বলে নীচে নেমে গেল। জহীরকে বলল, তুমি এখন শাহানার কাছে যাও। আমি চলে যাচ্ছি।

ঃ আসুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

ঃ তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না। তোমাকে যা করতে বললাম কর।

জহীর দোতলায় উঠে এল। শাহানা চুপচাপ খাটে বসে আছে। মাথায় ঘোমটা। শাড়ির আঁচল এমনভাবে টানা যে মুখ দেখা যাচ্ছে না। জহীরকে দেখে সে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। হাসিমুখেই বলল, ভাবী আমাকে মেরেছে....

জহীর বিস্মিত হয়ে বলল, সেকি !

ঃ দেখ-না,গালে দাগ বসে গেছে। গালের দাগ দেখাতে গিয়ে শাহানা আবার হাসল। মৃদু

স্বরে বলল, ভাবী এর আগে আরো একবার আমাকে চড় দিয়েছিল। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। আমার এক বান্ধবী খুব খারাপ একটা বই দিয়েছিল আমাকে। কুৎসিত সব ছবি ছিল সেই বইটাতে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছিলাম। আমার হাতে ঐ বই দেখে ভাবী কি যে অবাক হল। কেমন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর আমি কিছু বোঝার আগেই একটা চড় মারল আমাকে। হাত থেকে বই কেড়ে নিল না বা কিচ্ছু বলল না। এই ঘটনার কথা কাউকে বললও না। আমি যে কি লজ্জা পেয়েছিলাম। আজ আবার সেদিনের মত লজ্জা পেলাম।

জহীর লক্ষ্য করল শাহানা কাঁদছে। খুব সহজেই সেই কান্নাও তার থেমে গেল। চোখ মুছে বলল, আমাকে ভাবীর কাছে নিয়ে চল।

ঃ এখনি যাবে?

ঃ হ্যাঁ। আমার এই ব্যাপারে ভাবী খুব কষ্ট পেয়েছে। আরেকটা কথা তোমাকে বলি— আমি আর কোনদিন এরকম করব না।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ মাঝে মাঝে আমার এ রকম হয়। মনে হয় কেউ আমাকে ভালবাসে না। তখন অদ্ভুত সব কাণ্ড করি। ক্লাস নাইনে যখন পড়ি তখন একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। স্কুলে যাবার নাম করে বের হয়ে সোজা হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে যাত্রাবাড়ি বলে একটা জায়গা— সেখান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।

ঃ তারপর?

ঃ সেখান থেকে ফিরে এসেছি। কেউ জানে না। কাউকে বলিনি। আমি বোধ হয় একটু পাগল।

ঃ একটু না— অনেকখানি। তোমাকে আমি খুব ভাল একজন ডাক্তার দেখাব।

ঃ দেখিও। তুমি আমার উপর রাগ করনি তো?

ঃ না!

ঃ সত্যি না?

ঃ হ্যাঁ, সত্যি।

ঃ আমার গা ছুঁয়ে বল।

জহীর হেসে ফেলল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসল শাহানা। জহীর মুগ্ধ চোখে শাহানার দিকে তাকিয়ে আছে। কি অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী—কুঁচ বরণ কন্যারে তার মেঘ বরণ চুল।

ঃ শাহানা!

ঃ বল।

ঃ তোমার গান কেমন এগুচ্ছে?

ঃ মোটেই এগুচ্ছে না। সকাল বেলা উঠে ভ্যা ভ্যা করতে আমার ভালও লাগে না। আমি আর গান শিখব না। আমি পড়াশোনা শুরু করব।

ঃ খুব ভাল কথা।

ঃ মাষ্টার টাষ্টার রাখতে পারবে না। আমি নিজে নিজে পড়ব।

ঃ সে তো আরো ভাল।

ঃ কিন্তু একটা শর্ত আছে।

ঃ কি শর্ত ?

ঃ আমি যতক্ষণ পড়ব, তুমি আমার পাশে বসে থাকবে। চুপচাপ বসে থাকবে।

ঃ শর্ত খুব কঠিন বলে তো মনে হচ্ছে না।

জহীর কিছু বোঝার আগেই শাহানা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। জহীর কিছু বলল না, শাহানার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ডাক্তার সাহেবের চেহারা রাশভারী। মাথাভর্তি নজরুল ইসলামের মত বাবরি চুল। কথাও বলেন খুব কম। ঘন ঘন নিজের মাথার চুল টানেন। দেখে মনে হয় কোন কারণে খুব রেগে আছেন। কণ্ঠস্বরটি খুব সুন্দর। শুনতে ভাল লাগে। এই জন্যেই বোধ হয় নিজের গলাব স্বর বেশী শুনাতে চান না।

তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে টুনীকে দেখলেন। আজকালকার ব্যস্ত ডাক্তাররা এত সময় রুগীদের দেন না। ইনিও ব্যস্ত। ইনার ওয়েটিং রুমে রুগী গিজ গিজ করছে তবু প্রতিটি রুগীকে অনেকখানি সময় দিচ্ছেন।

ঃ ওর এই জ্বরজ্বর ভাব, এটা প্রায়ই হয় বলছেন?

ঃ জ্বি।

ঃ এর আগে কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন?

ঃ না । বাবা হোমিওপ্যাথি করেন। টুকটাক ওষুধ দেন— সেরে যায়।

ঃ ও আচ্ছা। আপনার মেয়ে তো খুব রূপবতী। পুতুল পুতুল দেখাচ্ছে। কি খুকী, তুমি কি পুতুল?

টুনী হেসে ফেলল। ডাক্তার সাহেব কাগজে অতি মনোযোগের সঙ্গে কি যেন লিখতে লাগলেন। আগের মত সুরেলো মিষ্টি স্বরে বললেন, আমি এখানে কিছু স্পেসিফিক টেস্টের কথা লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলি করাতে হবে। সব জায়গায় টেস্ট ভালো হয় না— কোথায় করাবেন তাও লিখে দিচ্ছি।

ঃ আপনার সঙ্গে তাহলে কখন দেখা করব?

ঃ আপনি আজই দেখা করবেন। রাত আটটা পর্যন্ত আমি বাসায় থাকব। আপনি রিপোর্ট নিয়ে বাসায় চলে আসবেন।

সফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার সাহেব বললেন, বাসার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলি জরুরী ভিত্তিতে করানোর জন্যে যা প্রয়োজন আপনি অবশ্যই করবেন।

ঃ আপনি কি আশংকা করছেন?

ঃ কিছুই আশংকা করছি না। যা বলার রিপোর্টগুলো দেখে তারপর বলব।

ঃ ওর তো তেমন কিছু না, সামান্য জ্বরজ্বারি সর্দি।

ঃ আমি খুবই আশা করছি ওর কিছু না, সামান্য ব্যাপার। তবু আপনাকে যা করতে বললাম করবেন। মেয়েকে সন্ধ্যাবেলা আনার দরকার নেই।

ঃ আপনার কথায় কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে।

ঃ সরি। আপনাকে যা করতে বললাম করবেন।

ডাক্তার সাহেবের বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন, সফিককে দেখে বললেন, আমি ভাবছিলাম আসবেন না বুঝি।

ঃ ব্লাড রিপোর্টটা পেতে একটু দেরী হয়ে গেল।

ঃ বসুন আপনি।

ডাক্তারের স্ত্রী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, কতক্ষণ লাগাবে তুমি?

ঃ অল্প কিছুক্ষণ। পাঁচ মিনিট। তুমি গাড়িতে অপেক্ষা কর।

ভদ্রমহিলা তিক্ত গলায় বললেন, বাসাতেও যদি তুমি এসব ঝামেলা কর, তাহলে আমি যাব কোথায়?

ঃ বললাম তো পাঁচ মিনিট।

ডাক্তার সাহেব সব ক'য়টি রিপোর্ট টেবিলে বিছিয়ে দিলেন। তিনি কিছু দেখছেন বলে মনে হল না। রিপোর্টগুলি আবার একটির উপর একটি সাজিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথার চুল টানলেন। সফিক বলল, কি দেখলেন? ডাক্তার কিছু বললেন না। সফিক আবার বলল, কি দেখলেন?

ঃ আপনার মেয়ের একটা খুব খারাপ অসুখ হয়েছে। হজকিনস ডিজিজ। এক ধরনের লিকোমিয়া। লোহিত রক্ত কণিকা গঠিত সমস্যা। অসুখটা খুবই খারাপ। এর বিরুদ্ধে আমাদের হাতে এখনো তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। তবে বিদেশে প্রচুর কাজ হচ্ছে। ইফেকটিভ কেমিথেরাপী ডেভেলপ করেছে। এতে লাইফ এক্সপেকটেনসি অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়া গেছে। এই ফিল্ডে প্রচুর গবেষণাও হচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে মোক্ষম অষুধ বেরিয়ে আসবে। সেই মুহূর্তটি আগামীকালও হতে পারে।

বাইরে ভদ্রমহিলা ক্রমাগত গাড়ির হর্ণ দিচ্ছেন। পাঁচ মিনিট সম্ভবত হয়ে গেছে। তিনি আর দেরী সহ্য করতে পারছেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দেই ?

ঃ দিন।

তিনি পানি এনে দিলেন। শান্ত স্বরে বললেন, আপনার যদি টাকাপয়সা থাকে মেয়েকে জার্মানী পাঠিয়ে দিন। জার্মানীর এক হাসপাতালে আমি দীর্ঘদিন পোষ্টডক করেছি, আমি সব ব্যবস্থা করব।

ঃ আমার মেয়ে ভাল হবে ?

ঃ হতে পারে। তবে এটা কালান্তক ব্যাধি, এটা আপনাকে মনে রেখেই এগুতে হবে। মেডিক্যাল সায়েন্স প্রাণপণ করছে, আমার মন বলছে খুব শিগগীরই কিছু একটা হবে—

আগামী কাল, আগামী পরশু, আগামী মাস কিংবা বৎসর। আশা হারাবার মত কিছু নয়।

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী এসে ঢুকলেন। তীব্র গলায় বললেন— তুমি কি যাবে, না যাবে না?

ঃ যাব। চল— আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে।

সফিক উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। ডাক্তার সাহেব গভীব মমতায় সফিকের হাত ধরলেন। বললেন—আসুন আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

ঃ দরকার নেই। আপনাদেব দেরী হয়ে যাবে।

ঃ হোক দেরী।

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী বিড় বিড় করে কি বললেন। সফিক তা শুনল না, শুধু শুনল ডাক্তার সাহেব বলছেন— আমি প্রথম ইনাকে বাসায় পৌঁছে দেব। তোমার পছন্দ হোক না হোক আমার কিচ্ছু বলবার নেই।

কিছু কিছু গল্প আছে যা কখনো শেষ হয় না। এইসব দিনরাত্রির গল্প তেমনি এক শেষ না হওয়া গল্প। এই গল্প দিনের পর দিন বৎসরেব পর বৎসর চলতেই থাকে। ঘরের চার দেয়ালে সুখ দুঃখের কত কাব্যই না রচিত হয়। কত গোপন আনন্দ কত লুকানো অশ্রু। শিশুরা বড় হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যাত্রা করে অনির্দৃষ্টের পথে। আবার নতুন সব শিশুরা জন্মায়।

আজ এই বাড়িতে নতুন একটি শিশু জন্মাবে। সে রহস্যময় এই পৃথিবীতে পা রাখার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাতৃগর্ভের অন্ধকার তার অসহ্য বোধ হয়েছে।

শিশুটি শাহানার। শাহানা এই বিরাট খবরটা এখনো টের পায়নি। তার বোধ হয় ধাবণা এমনিতেই তার খারাপ লাগছে। তবু সে নীলুকে এসে বলল, ভাবী, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

নীলু আঁতকে উঠে বলল, ভাল লাগছে না মানে? কেমন লাগছে?

ঃবুঝতে পারছি না ভাবী। কেমন যেন পিপাসা লাগছে, আর...

ঃ আর কি ?

ঃ জানি না ভাবী, বড় ভয় লাগছে।

নীলু পাশের বাড়ি থেকে জহীরকে টেলিফোন করল। সে তার চেম্বারে নেই বাসায়ও নেই, বাসায় ফিরবে সন্ধ্যার পর। কিংবা কে জানে হয়ত সরাসরি চলে আসবে এ বাড়িতেই। কি সর্বনাশা কাণ্ড! নীলু অস্থির হয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব এবং মানায়ারা দু'জনেব কেউই বাসায় নেই। যাত্রাবাড়ি গিয়েছেন। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা।

শাহানা বলল, ভাবী, আমার কি সময় হয়ে গেছে?

ঃ বুঝতে পারছি না। শুয়ে থাক। এখনো কি আগের মত খারাপ লাগছে?

ঃ না, এখন আর আগের মত খাবাপ লাগছে না। তুমি আমার পাশে বসে থাক।

নীলু বসল তার পাশে। শাহানা লাজুক স্বরে বলল, আমি জানি আজই সেই দিন।

ঃ কি করে জানলে ?

ঃ দেখছ না বাসায় একটা মানুষ নেই— শুধু তুমি আমি। টুনীর জন্মের সময়ও তো এরকম হল। তোমার মনে নেই ভাবী?

নীলু জবাব দিল না। বিকেলের ম্লান আলোয় তার চেহারাটা দ্রুত অন্যরকম হয়ে গেল। টুনীর কোন কথা সে মনে করতে চায় না। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে না। কারণে অকারণে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আসে।

টুনী দু'বছর আগে জার্মানীর এক হাসপাতালে মারা গেছে। নিঃসঙ্গ মৃত্যু অবশ্যি হয় নি। রুইনবার্গ শহরের সব ক'টি বাঙ্গালী পরিবার সেদিন হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিলেন। আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছোট্ট বালিকাটিকে ঘিরে বসে ছিলেন। টুনী যতবার বলেছে 'আমার আম্মি, আমার আম্মি', ততবারই তাঁদের চোখে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। এই সব প্রবাসী বাঙালীরা চাঁদা তুলে নীলুর জার্মানী আসার টিকিট পাঠিয়েছিলেন, যাতে নীলু তার মেয়েটির পাশে থাকতে পারে, অহংকারী নীলু তাতে রাজি হয়নি। বার বার বলেছে ভিক্ষার টাকায় আমি যাব না। নীলু এবং সফিক এই দু'জনের জার্মানী যাওয়া আসা এবং থাকার যাবতীয় খরচ শারমিনের বাবা দিতে চেয়েছিলেন। তাতেও কেউ রাজি হয় নি। উনার টাকা কেন নেবে ? শারমিন এবং রফিকের ডিভোর্স হয়ে গেছে। এই পরিবারটির সঙ্গে তাদের এখন আর কি সম্পর্ক ? কিন্তু একেবারেই কি সম্পর্ক নেই ?

শারমিন থাকে আমেরিকাব। টুনীর মৃত্যুর আগেব দিন আমেরিকা থেকে সে জার্মানী চলে এল। টুনী মারা গেল শারমিনের কোলে মাথা রেখে। তার ছোট ছোট হাতে সে সারাক্ষণই তার ছোট চাচীকে জড়িয়ে ধরে ছিল। যেন হাত ছাড়লেই চাচী কোথাও চলে যাবে। সেই সব হৃদয় ভেঙে দেয়া কাহিনী গুছিয়ে শারমিন লিখেছিল। নীলু প্রায়ই ঐ চিঠি বের করে পড়ে। পড়তে পড়তে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কান্না আসে না। টুনীর মৃত্যুর পর কি যে হয়েছে সে কাঁদতে পারে না। যদিও প্রায়ই তার কাঁদতে ইচ্ছা করে।

কতদিন হয়ে গেল টুনী নেই। তবু তার ছোট্ট ফুল আঁকা বালিশ প্রতি রাতেই বিছানায় পাতা হয়। বালিশটা মাঝখানে রেখে একপাশে শোয় সফিক অন্য পাশে নীলু। তারা দুজনই কল্পনা করে মেয়েটি দু'জনের মাঝখানে শুয়ে আছে। সফিক মেয়ের গায়ে হাত রাখতে যায়। নীলুও হাত বাড়িয়ে দেয়। টুনীকে তাঁরা খুঁজে পায় না। একজন হাত রাখে অন্যজনের হাতে। শব্দহীন ভাষায় দু'জন দু'জনকে সান্ত্বনাব কথা বলে।

কত বদলে গেছে সব কিছু। সবচে বেশী বদলেছে রফিক। প্রায় রাতেই মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। কারো চোখের দিকে তাকায় না। মাথা নীচু করে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। সারা রাত তার ঘরে বাতি জ্বলে। বাতি নিভালেই সে নাকি কি সব দেখে। কবির মামা নাকি তাঁর ঘরে হাঁটাহাঁটি করেন। একদিন নাকি টুনীকেও দেখেছে। টুনী তাকে বলেছে—তুমি এমন হয়ে গেছ কেন? সবাই তোমাকে খারাপ বলে।

ঃ কি করব রে মা, আমি মানুষটাই খারাপ।

ঃ তোমাকে খারাপ বললে আমার খুব খারাপ লাগে।

ঃ না, আর খারাপ হব না। তোকে কথা দিলাম। মদ ছেড়ে দিলাম। নো লিকার।

কিন্তু পরদিন আরো বেশী করে খায়। ঘোর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে ফিস ফিস করে

বললো, সব বাতি জ্বেলে রাখবে ভাবী। বাতি নেভালেই ওরা আসে। বড় বিরক্ত করে। সবচেয়ে বেশী করে টুনী। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান অসহ্য ।

টুনীর কথা নীলু মনে করতে চায় না। তবু বার বার সবাই তাকে টুনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। হোসেন সাহেব প্রায় রাতেই ঘুমের ঘোরে চেঁচান— টুনী, টুনী। নিজের চীৎকাবে তাঁর নিজেরই ঘুম ভেঙে যায়। বাকি রাতটা তিনি ছেলেমানুষেব মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদেন। নীলু ও সফিক সেই কান্না শুনে। আহ্ কি কষ্ট ! বেঁচে থাকা বড় কষ্টের।

শাহানা বলল, ও ভাবী, আমার যেন কেমন লাগছে। ওরা তো কেউ এল না। আমার বড় ভয় লাগছে। আমাকে তুমি হাসপাতালে নিয়ে যাও।

নীলু উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরুল। আনিস কোত্থেকে যেন ফিরছে। নীলু বলল, আনিস, একটা এম্বুলেন্স নিয়ে আস তো, মনে হচ্ছে শাহানাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

ঃ আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। আপনি ওর কাছে গিয়ে বসুন।

শাহানার কাছে বসতে ইচ্ছা করছে না। নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রফিকেব ঘর হাট করে খোলা। এই সময় সে কখনো ঘরে থাকে না। থাকলে ভাল হত। প্রয়োজনের সময় কাউকেই পাওয়া যায় না।

ঃ ভাবী !

নীলু চমকে তাকাল। রফিক দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে।

ঃ হচ্ছে কি ভাবী?

ঃ শাহানার পেইন উঠেছে। তুমি সবাইকে খবব দাও।

ঃ এম্বুলেন্স নিয়ে আসব?

ঃ এম্বুলেন্স লাগবে না। আনিস আনতে গেছে। তুমি জহীরকে খবর দেবার ব্যবস্থা করে যাত্রাবাড়িতে চলে যাও। বাবা-মাকে নিয়ে এসো।

রফিক চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে লাজুক গলায় বলল, শারমিন এগারো তাবিখে দেশে ফিরছে ভাবী। আমাকে চিঠি লিখেছে।

ঃ হঠাৎ তোমাকে চিঠি !

ঃ আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। চিঠিতে তাই লেখা। আবার সব আগের মত হয়ে যাবে।

ঃ ভাল—খুব ভাল।

রফিক হাসছে। কত দীর্ঘদিন পর নীলু ওর মুখে হাসি দেখল। নীলু ভুলেই গিয়েছিল বফিক হাসতে পারে। ভেতর থেকে শাহানা ভয়ার্ত গলায় ডাকছে— ভাবী, ভাবী!

নীলু নড়ছে না। অবাক হয়ে দেখছে—অনেক দিন পর তাদের পাশের জলা জায়গাটায় ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস নামছে। পাখীরা শহর পছন্দ করে না। এবার কি হল তাদের ? ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী নামছে কেন? বিদ্যুৎচমকের মত নীলুর মনে হল— টুনীর জন্মের সময়ও ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস নেমেছিল।

নীলু ঘরে ঢুকল। নতুন শিশু আসছে। কত দীর্ঘদিন সে এই পৃথিবীতে থাকবে– হাসবে, খেলবে, গাইবে। তার আগমনের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আয়োজনের কোন

ত্রুটি থাকা চলবে না।

শাহানা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি বার বার কোথায় চলে যাচ্ছ ভাবী?

ঃ আর যাবো না। এই বসলাম তোমার পাশে।

ঃ বড় ভয় লাগছে ভাবী।

নীলু কোমল স্বরে বলল, কোন ভয় নেই।

ঘরের জানালা খোলা। ঘন হয়ে সন্ধ্যা নামছে। বালিহাঁসের পাখার আওয়াজ পাওয় যাচ্ছে। অনেকদিন পরে ওরা আবার এল।

নীলু লক্ষ্য করল তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। ভুলে যাওয়া কান্না সে আবার ফিরে পেয়েছে।

ব্যথায় ছটফট করছে শাহানা। মাতৃগর্ভে বন্দী শিশু মুক্তির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কত না বিস্ময় অপেক্ষা করছে শিশুটির জন্যে!